শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীমার

আশ্রিতা

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

সন : ইং ২০১৭

প্রকাশক
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম
বি ২/৯৪, ভদৈনী; বারাণসী।

ISBN No. : 81 - 89558 - 36 - 6

তৃতীয় সংস্করণ : শ্রীশ্রী মাতৃ জন্মোৎসব
১৯শে বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

মূল্য : ১৫০ টাকা $ 3

মুদ্রক :
অনুপ প্রিন্টার্স
বারাণসী

প্রথম সংস্করণের
নিবেদন

শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণাশীর্বাদে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগে ছয় অধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগে আঠাইশ অধ্যায় ও তৃতীয় ভাগে একত্রিশ অধ্যায়, মোট পঁয়ষট্টি অধ্যায় প্রকাশিত হইল। যদি শ্রীশ্রীমার কৃপা হয় তবে চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ প্রকাশিত হইবে।

চৈত্র, ১৩৪৬
মার্চ, ১৯৪০

নিবেদিকা
শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব
ঁনরসিংহ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
পরমারাধ্যা মাতৃদেবী
ঁশান্তি বালা দেবীর
পুণ্য স্মৃতি-তর্পণে
শ্রীশ্রী মাতৃসেবায় ভক্তিপূর্ণ সমর্পণ

শ্রীশ্রীমাতৃকৃপাভিলাষিণী :
কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাণসী

তৃতীয় ভাগ

সূচীপত্র

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

অষ্টাত্রিংশৎ অধ্যায়

একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

দ্বাচত্বারিংশৎ অধ্যায়

বিষয় | পত্রাঙ্ক

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়

ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়

অষ্টাচত্বারিংশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

বিষয় | পত্রাঙ্ক

দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

অষ্টাপঞ্চাশৎ অধ্যায়

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

ষষ্টিতম অধ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

একষষ্টিতম অধ্যায়

দ্বাষষ্টিতম অধ্যায়

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

বিষয়	পত্রাঙ্ক

শিমলার কালী বাড়ী

শিমলার কালী বাড়ী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

তৃতীয় ভাগ

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

১৯শে আষাঢ়, ১৩৪৩ (৩রা জুলাই, ১৯৩৬) শুক্রবার। আমরা মার সঙ্গে সোলন হইতে দেরাদুনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কথা হইয়াছে, আগামী কল্য ২০শে আষাঢ় পুনরায় সিমলা রওনা হইতে হইবে। মার আদেশে জ্যোতিষ দাদা এতদিন এখানেই আছেন। এত দিন পর মার চরণ দর্শন করিলেন। দেরাদুনবাসী ভক্তেরা ধীরে ধীরে আসিয়া মার চরণ দর্শন করিতেছেন। প্রায় ১॥ মাস পর মা ফিরিয়াছেন। উৎসবের পর মা হঠাৎ চলিয়া গিয়াছিলেন, কেহ খবরও জানেন নাই।

দেরাদুনে ভক্ত সমাগম এবং তাঁহাদের যুগপৎ হর্ষ বিষাদ।

আজ মা আসিয়াছেন, শুনিয়া সকলেই আসিতেছেন। মার আজ খাওয়ার দিন। মা খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। সর্দি জ্বর জ্বর ভাবও খুব আছে। সকলেই যখন শুনিল, মা আগামীকল্যই আবার চলিয়া যাইতেছেন, তখন সকলেরই হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু মা যাহা স্থির করেন, তাহা কেহ বড় বাধা দিতে পারে না। এক ভোলানাথের আদেশ রক্ষার জন্য কখনও কখনও অবশ্য অন্য রকম হইয়া যাইত। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সকলে আশ্রমে থাকিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন।

২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, শনিবার। আজও ভোরে উঠিয়া মা একটু হাঁটিয়া আসিয়াছেন। ছাতে হাঁটিতেছেন। আজ সন্ধ্যা ৬টার গাড়ীতে মার সিমলা রওনা হইবার কথা। দলে দলে ভক্তেরা আসিয়া দর্শন করিয়া যাইতেছেন। মাও সকলকেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নানা মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিতেছেন। সাধারণ কথাচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যাওয়ার সময় হইল। এবার জ্যোতিষদাদাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সারদা, লছমী, হবিরাম, হংস প্রভৃতি অনেকেই স্টেশনে আসিয়াছেন। আবার মাকে কবে দেখিবে, কে জানে, ভাবিয়া সকলেই বিষণ্ণ। আমরা ৬ টার গাড়ীতে দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া ভোরে কালকা পৌঁছিয়া মোটরে সিমলা রওনা হইলাম।

দেরাদুন ত্যাগ ও সিমলা যাত্রা

২১শে আষাঢ়, রবিবার। পথেই সোলনে ডাক্তার যোশীর সহিত দেখা হইল। শুনিলাম, মার সিমলা যাইবার খবর পাইয়া, রাজাও সিমলা যাইতেছেন। ডাক্তার ও উজীর সপরিবারে যাইতেছেন। মা ও আমরা চলিয়া গেলাম। পরে সোলন হইতে সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রায় ১০ টায় আমরা সিমলা পৌঁছিলাম। রাস্তার ধারেই পঞ্চুবাবু, জিতেন বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাকে দেখিয়া মহা আনন্দে তাঁহারা মাকে মোটর হইতে উঠাইয়া রিক্সাতে নিয়া গেলেন। আমরাও রিক্সায় গেলাম। রাস্তা হইতেই নামের ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। মা কালী বাড়ী পৌঁছিলেন। ভক্তেরা মহা আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া মা ও ভোলানাথের চরণ ধূলা লইলেন। মা গিয়া কীর্তনের কাছে মন্দিরের বারান্দায় বসিলেন। খুব সুন্দর নাম হইতে লাগিল। মা নিজের ভাব সামলাইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। দেখিলাম,

সিমলা আগমন ও নাম-কীর্তনে যোগদান। মধুর নাম-কীর্তন।

প্রতি বছর যেরূপ ভাবে নাম যজ্ঞের বন্দোবস্ত হয়, মার উপলক্ষে এই নাম যজ্ঞেও কোন অঙ্গই ত্রুটি হয় নাই। মা কিছুক্ষণ পর উঠিয়া, মেয়েদের নিয়া ঁকালীমাতার মন্দির ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করাইতেছেন। সন্ধ্যা বেলায় নাম শেষ হইল। সকলে মার সহিত কথা বলিবার জন্য মার ঘরে আসিয়া বসিলেন। মা বলিতেছেন, "বেশ নাম করিয়াছ; বড় আনন্দ দিয়াছ।" কথা হইয়াছে আগামী কল্য মেয়েরা মার কাছে কীর্তন করিবেন।

২২শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, সোমবার। আজ সকালে মা বাহির হন নাই। আজ ১২টা হইতে মেয়েদের কীর্তন হইবার কথা। খুব বৃষ্টি হইতেছে। আজ ১২ টায় কেহই আসিয়া পৌছিতে পারেন নাই। কিন্তু কথা ঠিক রাখিবার দিকে মার খুব দৃষ্টি। মা আমি ও আরও ২টি ছোট মেয়ে উপস্থিত ছিলাম। এই তিনজনকে নিয়াই মা ১২টা বাজিতেই কীর্তনের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং মেয়ে দুইটিকে নিয়া আমাকে কীর্তন আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। কীর্তন আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে মেয়েরা আসিয়া কীর্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। মহা আনন্দ, আজ ও সকলের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া মা নাম করিতেছেন। মার ভাবের একটু পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতেছেন। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন, মার হাত পা ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে, চক্ষু স্থির। হঠাৎ মা মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি ধরিয়া ফেলিলাম। চোট পাইলেন না। পড়িয়াই আবার টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন শরীর দুলিতেছে। শরীরের ওজন আছে বলিয়াই মনে হয় না। আজও যেন বাতাসের ভিতর শরীরটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাতাসে উড়ান কাগজ বা কাপড়ের মতই একবার এদিকে, একবার ওদিকে যেন উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছেন। আজ খুব সামান্যই

শ্রীশ্রীমায়ের নেতৃত্বে মহিলা-কীর্তন।
শ্রীশ্রীমায়ের অদ্ভুত অবস্থা।

হইল; দাঁড়াইয়া যেন নিজকে সামলাইয়া নিলেন। আবার নাম করাইতে লাগিলেন। নিজে নাম করিয়া নাম করাইতেছেন। কখনও হাত তালি দিয়া, কখনও হাত উঠাইয়া, কখনও কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া মা কীর্তনে নাচিতেছেন। ভাবে গদ গদ অবস্থা। চক্ষু দুটি লাল, জলে ভরা। সে অবস্থা না দেখিলে বোঝান যায় না। কেহ কেহ শ্রীচৈতন্য দেবের মত দেখিতেছেন। প্রায় ৫ টায় নাম শেষ হইল। মিষ্টি ও বাতাসা বিতরণ করা হইল।

মা ঘরে আসিয়া নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন। বাবুরা সব আসিয়া মার কাছে মিলিতেছেন। কথা উঠিল মা আগামী কল্য সোলন চলিয়া যাইবেন। অনেকেই আপত্তি তুলিতেছেন। একজন বলিতেছেন, "মা তুমি কিছুদিন এখানে থাকিয়া মেয়েদের মধ্যে যে কীর্তনটা আরম্ভ করিলে তাহা স্থায়ী করিয়া যাও।" কেহ বলিতেছেন, "কাল কি করিয়া যাওয়া হয়? গত কাল ত আমরা সারাদিন নামই করিলাম; আজও মেয়েদের নিয়াই কীর্তন করিলে, আমরা একটু তোমার কাছে বসিয়া কথাই বলিতে পারি নাই। তুমি যদি কালই চলিয়া যাইবে মনে করিয়াছিলে, তবে সারাদিন আমাদের নামে কেন আটকাইয়া রাখিলে, তোমার সহিত একটু কথা বলিতে পারিলাম না।" এই প্রকার নানা আপত্তি উঠিতে লাগিল। মা বলিতেছেন, "নামই প্রধান কাজ; দেখত, নাম করিবার সময় তোমরা বিশেষ আর কোন দিকে মন দিতে পার না"। একজন বলিতেছেন, "মা আজ তুমি খাও নাই, খুব শুক্‌না দেখা যাইতেছে।" মা বলিতেছেন, "না খাওয়ার জন্য যে শুক্‌না দেখ, তা নয়, ওদের (ভোলানাথ ও আমাকে দেখাইয়া বলিতেছেন) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি যখন খাইতাম না, তখন শরীর খুব ভালই ছিল।" একজন বলিতেছেন, "মা, দুই বৎসর হইয়া গেল, এই রকম খাওয়া আরম্ভ করিয়াছ। এখন হইতে রোজ খাওয়া

সিমলায় মার সহিত ভক্তগণের বিবিধ মধুর কথাবার্তা।

শুরু কর। মা বলিতেছেন, "এই যে না খাওয়া, ইহা ত কোন তপস্যা নয়। বোধ হয়, দরকার ছিল, তাই হইয়া যাইতেছে। আর আমি ত না খাইয়া থাকি না; তোমরা যেমন দুপুরে ও রাত্রিতে খাও, এই কয় ঘন্টা বাদ যায়, আমারও তেমনি এই ৪৮ ঘন্টা বাদ যায়। আমার পক্ষে তাই এ বেলা ও বেলার মত। তবেই দেখ, আমি ত না খাইয়া থাকি না। আমি কোন তপস্যার জন্য করি না।" একজন বলিতেছেন, "মা তোমার আবার তপস্যা কি? আর এই সব নিয়মেরই বা কি দরকার? আমাদের জন্যই এসব দরকার।" মা অমনি বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ; আমি ত বাবা, সব কথা গুছাইয়াও বলিতে পারি না। তোমাদের জন্যই এই সব, তোমরাই করাইয়া লইতেছ।" সেই ভদ্র লোকটিই উত্তর দিতেছেন, "মা, এত খুব সত্যি কথা, যে তুমি যা কিছু কর, আমাদের জন্যই কর; তবে আমাদের মোটে চাড় নেই; তুমি আর আমাদের জন্য শুকিয়ে কি করবে?" মা বলিতেছেন, "তোমাদের যখন চাড় নেই তখন আমিই না হয় একটু শুকাইলাম, তাতে দোষ কি? আচ্ছা, তোমাদের কথাও শুনিয়া রাখিলাম। শীঘ্রই এ নিয়ম ভাঙ্গিতেও পারে।" এই সব কথা বার্তা হইতেছে সকলেই আরও কয়েকটা দিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু মা থাকিবার কিছু আভাসই দিতেছেন না। যখন যা বলেন, প্রায় তাহাই সব সময়ই করেন।

চুটীকাণ্ডীতে পঙ্কজবাবুর বাসায় কীর্তনের সময় কিছুক্ষণ 'মা মা' নাম কীর্তন হইবার সূত্রপাত। ১৩৪৩। ২২শে আষাঢ়। (৬ই জুলাই, ১৯৩৬)

প্রায় সন্ধ্যা ৭ টায় চুটীকাণ্ডীতে পঙ্কজবাবু তাঁর বাসায় কীর্তনের উপলক্ষে মাকে নিয়া গেলেন। এবার ঢাকা হইতে সরকারী কার্যোপলক্ষে মার পুরাতন এক জন ভক্ত (শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) সিমলা আসিয়াছেন। কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও আমাদের সঙ্গে এবার দেরাদুন

হইতে আসিয়াছে। জ্যোতিষদাদার কথায় এবার তাঁহারা কীর্তনে গিয়া "মা মা" নামে কীর্তন করিলেন। কথা হইল, এখন হইতে "মা মা" নামে কীর্তন কিছুক্ষণ হইবেই। মাকে উঠাইয়া নিয়া যাওয়ায় উপস্থিত সকলেই দুঃখিত। রাত্রি প্রায় ১০৷৷ টায় মা ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রতি সোমবারই পঙ্কজবাবুর বাসায় কীর্তন হইবে, স্থির হইয়াছে। মার সঙ্গে সঙ্গে কালী বাড়ী পর্যন্ত অনেকেই আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১ টায় তাঁহারা মাকে প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায়

২৩শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, মঙ্গলবার। আজ মার রওনা হইবার কথা ছিল। ঘটনাচক্রে তাহা বন্ধ হইয়াছে। আজ যাইবেন না স্থির হইয়াছে। ইহাতেই ভক্তদের কত আনন্দ। আজ মার খাওয়ার দিন ছিল। সকালবেলা হইতেই লোক আসিতেছে, ও মাকে খাওয়াইবার জন্য নানা খাদ্যদ্রব্য নিয়া আসিতেছে। মা সকলের হাতেই একটু একটু খাইয়া সকলকে তৃপ্ত করিতেছেন। যে যেই ভাব নিয়া আসিতেছেন তাঁর সহিত সেই ভাবেই আলাপ করিতেছেন। তাই সকলেই মনে করিতেছেন, "মা আমাকেই বুঝি বেশী ভালবাসেন।" অনেকে মুখেও এই কথাই বলিয়াছে। মহাত্মাদের এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা। দুপুরবেলা মেয়েরা সব আসিয়াছেন। মাও খাওয়া দাওয়া করিয়া কালী বাড়ীর উপরের ঘরটায় গিয়া বসিয়াছেন। এই ঘরটায় থিয়েটার ইত্যাদি হয়। খুব বড় ঘর।

শ্রীশ্রীমায়ের লোকোত্তর শক্তি, প্রত্যেকেই মনে করেন, আমায় বেশী ভালবাসেন।

সেই ঘরে বসিয়া মা মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ২।১টি ভদ্র মহিলা মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মা, মন স্থির হয় কিসে? তাই একটু ভাল করিয়া বলিয়া যান কিছুতেই ত মন স্থির হয় না।" মা বলিতেছেন, "তোমরা এক কাজ করিও, নাম করিবার সময় শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিও। মন যতই এদিক ওদিক ছুটিয়া যাইবে আবার টানিয়া আনিয়া, শ্বাসের চলাচলের গতির সঙ্গে মনটাকে বাঁধিয়া নিও। দেখিবে ধীরে ধীরে কাজ হইবে, মনটা স্থির হইবে।"

মনঃস্থির করিবার সত্য উপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ।

আবার নানা কথা হইতেছে। মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমাদের কাছে একটা গল্প বলি, শোন। একজন ব্রাহ্মণ কুমাব, সে খুব ধর্মপরায়ণ ছিল। তাহার অর্থেরও অভাব ছিল না, কিন্তু সে বিবাহ করিবে না। সে শুনিয়াছিল, অতিথি নারায়ণ। তাই সে প্রত্যহ অতিথি সেবা না করিয়া খাইত না। বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য খুব পীড়া-পীড়ি আরম্ভ করিল। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। অগত্যা তাহাদের পীড়াপীড়িতে সে বলিল, তোমাদের পীড়াপীড়িতে আমি বিবাহ করিব, স্বীকার করিলাম। কিন্তু স্ত্রীর সহিত এই কথা থাকিবে যে, যেদিন সে আমার কথার অবাধ্য হইবে, সে দিন আমি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিব। সকলে তাহাতেই রাজি হইল। তাহারা মনে করিল এ আবার একটা কথা? বিবাহ করিলে, কি আর কেউ তাহাকে কাটিতে পারে? এই সব ভাবিয়া, সকলে মিলিয়া তাহাকে বিবাহ করাইল। ব্রাহ্মণ কুমার স্ত্রীকে প্রথমেই এই কথা বলিয়া দিল, "দেখ প্রত্যহ একটি অতিথি সেবা করিবে। অতিথির সেবা হইয়া গেলে আমাকে আহার করিতে ডাকিবে, তারপর

শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখের সুন্দর নীতিগর্ভ একটি গল্প। (প্রথম গল্প)

তুমি আহার করিবে। আর অতিথি যাহাই আদেশ করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রতিপালন করিবে। এই আমার আদেশ রহিল। ইহা অমান্য করিলে তখনই তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।" বধূটী কি করে? ছেলে মানুষ, প্রত্যহ পাক করিয়া বসিয়া থাকে। অতিথি এক একদিন বড় দেরীতে আসেন তাহার বড় ক্ষুধা পায়, কান্না আসে। কিন্তু উপায় নাই। স্বামীর আদেশ পালন করিতেই হইবে। নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। একদিন অতিথি আর আসেনা। বধূটি বসিয়া আছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন দেখে, একটি ভীষণ দর্শন মানুষ একটা মোটা লাঠীর মাথায় একটা গরুর মাথা বাঁধিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া আসিয়া উপস্থিত। সেই মাথা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। এই অতিথি দেখিয়া ভয়ে সে অস্থির হইল। কিন্তু উপায় নাই। স্বামীর আদেশ মনে করিয়া সে ভয়ে ভয়ে আসিয়া অতিথির চরণ ধোয়াইয়া দিল ও আহারের জন্য আসন করিয়া দিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিল। অতিথি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'আগে এই গরুর মাথাটা কাটিয়া পাক করিয়া নিয়া আয়।' বধূটি কখনও এ কাজ করে নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কন্যা, গরুর মাথা কাটিবার নামে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই ভাবিয়া সে অতিথির সাহায্যে কোন প্রকারে মাথাটা কাটিয়া পাক করিয়া অতিথিকে খাইতে দিল। অতিথি বলিলেন, 'আগে তোর এ মাংস খাইতে হইবে, নতুবা আমি খাইব না।' কি করে। অতিথির আদেশ। সে তাহাই করিবে। যেই মাংস তুলিয়া মুখে দিতে যাইবে, অমনি অতিথি বাধা দিয়া বলিলেন 'এখন রাখ, আগে তোর স্বামীকে ডাকিয়া নিয়া আয়।' বধূটি স্বামীকে ডাকিতে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিতেছে, এত করিলাম, তবুও না জানি কি ত্রুটি হইয়াছে। তাই স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ত্রুটির জন্য নিশ্চয়ই স্বামী আসিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন। যাক্ আমিত আদেশ পালন করিয়া

যাই। এই ভাবিয়া সে স্বামীর কাছে গিয়া অতিথির আদেশ জানাইল। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অতিথির আহার হইয়াছে?' বধূটী বলিলেন, 'না। তিনি তোমায় আগে ডাকিয়া নিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।' স্বামীও ভাবিল, আজ নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি হইয়াছে।

স্বামী স্ত্রী দুই জনে অতিথির আহারের স্থানে আসিয়া দেখেন অতিথি সেখানে নাই। অতিথি যে আসনে বসিয়াছিলেন, সেই আসনে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। এই মূর্তিই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। এই দর্শনে তখনই তাঁহাদের মুক্তিলাভ হইল।"

মা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "কোন একটা বিষয়ে ও যদি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকে, তবেই কাজ হয়। আর অবিচারে আদেশ পালন করা দরকার।"

"আরও একটি গল্প বলিতেছি। একটা লোক চুরি করিয়াই খাইত; চুরিই তাহার ব্যবসা। সে একবার একজন সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে গিয়াছে। সাধু তাহাকে দীক্ষা দিয়া বলিয়া দিল, 'তুই মিথ্যা কথা বলিতে পারিবি না, আর চুরিও করিস্ না'। সে লোকটা গুরুর আদেশে চুরি বন্ধ করিয়া দিল; মিথ্যাকথা পর্যন্ত বলে না। তাহার খাওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। কয়েক দিন পর সাধুটি দেখেন, না খাইয়া চোরের সমস্ত পরিবার মারা যায়। তখন সাধুটি বলিলেন, 'আচ্ছা, তুই চুরি করিয়া পরিবার প্রতিপালন কর। কিন্তু মিথ্যা কথা বলিস্ না।' লোকটি আবার চুরি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গুরুর আদেশ মিথ্যা বলিবে না।

মায়ের শ্রীমুখে দ্বিতীয় একটি ঐ প্রকার গল্প।

একদিন এক রাজার বাড়ী চুরি করিতে গিয়াছে। রাজা টের পাইয়াছেন। তিনিও কি মনে করিয়া, গোপনে সাধারণ বেশ পরিয়া ঐ চোরের কাছে গিয়া বলিতেছেন, 'দেখ, ভাই, আমিও চুরি করিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার এই কাজ আজই প্রথম আরম্ভ। কাজেই আমাকে তুমি শিখাইয়া

লও। যাহা পাইবে, তিন ভাগের দুই ভাগ তুমি লইবে। এক ভাগ আমাকে দিও।' সেও রাজি হইল। রাজা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। আর ঐ লোকটি ভিতরে গিয়া রাজার সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া মোহরের থলি বাহির করিয়াছে। এমন হিসাব করিয়াই মোহর নিয়াছে যাহাতে ঠিক এক ভাগ রাজাকে দিয়া যাইতে পারে। ভোর হইয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া হিসাব মত এক ভাগ রাজার কাছে ফেলিয়া দিয়া বাকি দুই ভাগ সে নিয়া চলিয়া গেল। রাজা সবই দেখিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই রাজার লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পর দিন রাজসভায় রাজা ঐ লোকটিকে বিচারের জন্য আনাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি চুরি করিয়াছ?' সে বলিতেছে, 'হ্যাঁ, মহারাজ, আমি চুরি করিয়াছি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি পাইয়াছ?' সে যাহা পাইয়াছিল, মোহরের সংখ্যা ঠিক ঠিক বলিয়া দিল। রাজা দেখিলেন, লোকটা সত্য কথাই বলিতেছে; যাহা চুরি করিয়াছে, সে ঠিকই বলিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কাছে এত মোহর আছে, বাকী মোহর কি করিয়াছ?' সে সব কথা বলিয়া বলিল, 'সেই লোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি এক ভাগ তাহার কাছে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।' রাজা সেই মোহরগুলিও আনিয়া দেখেন চোর একটি কথাও মিথ্যা বলিতেছে না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তুমি ইচ্ছা করিলে ত, নিজে যাহা পাইয়াছ তাহার এক ভাগ সঙ্গীকে না দিলেও পারিতে। তুমি চোর। চুরিই তোমার ব্যবসা। নিজে আরও বেশি নিলেনা কেন?' তখন সেই লোকটি বলিল, 'মহারাজা, আমি চোর সত্য। কিন্তু আমার গুরু মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। চুরি না করিলে আমার জীবিকানির্বাহ হয় না দেখিয়া, চুরি করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই আমি মিথ্যা বলি না। সেই জন্যই সঙ্গীয় লোকটির কাছে যে কথা বলিয়া গিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে

পারি নাই। আর আপনার কাছেও এক বর্ণও মিথ্যা বলিতেছি না।'

রাজা তখন এই লোকটির সত্যবাদিতায় ও গুরুর প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া বলিলেন, 'আজ হইতে তোমার পরিবারের সব ভার আমি নিলাম। তুমি চুরিও ত্যাগ কর।' ঐ লোকটি তখনই রাজাকে প্রণাম করিয়া গুরু-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া মুক্তিলাভ করিল।"

মা এই গল্পটি বলিয়া বলিতেছেন, "দেখ, একমাত্র সত্যের আশ্রয় নিলে সত্যই তাহাকে সব দিকে রক্ষা করে। একটা ধরিয়া থাকিলেই ধীরে ধীরে সব হয়।"

মা আরও একটি গল্প বলিলেন। গল্পটি এই ঃ— এক রাজা ছিল, তাহার ধন দৌলতের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না। তিনি লোকমুখে শুনিলেন, গুরুর নিকট মন্ত্র নিয়া কার্য করিলে, শান্তি পাওয়া যায়। তখন তিনি কুল- গুরুর খোঁজ করিতে লাগিলেন। এত দিন গুরুর কোনই খোঁজ ছিল না। গুরু অতি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে ছিলেন। রাজা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তাঁহার খুব আনন্দ হইল। গুরু আসিয়া রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁহার নিকট মন্ত্র নিয়া জপতপ করিলেই শান্তি পাওয়া যাইবে। গুরু শুভদিন দেখিয়া রাজাকে মন্ত্র দিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে গুরুরও আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া গেল। এদিকে গুরুর নিকট মন্ত্র নিয়া যথারীতি জপতপ করিয়াও রাজা শান্তি পাইতেছেন না।

মায়ের শ্রীমুখের তৃতীয় একটি ঐরূপ গল্প।

তখন তিনি গুরুকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, দেখুন, আপনার কথা মত আমি মন্ত্র লইয়াছি, আপনি বলিয়াছিলেন, মন্ত্র নিয়া জপতপ করিলেই আমি শান্তি পাইব। কিন্তু আপনার কথা মত যথারীতি জপাদিও করিতেছি, অথচ শান্তি পাইতেছি না। আপনাকে ৭ দিন সময় দিলাম। যদি এর মধ্যে

আপনি আমার শান্তির পথ বলিয়া দিতে না পারেন, তবে আপনাকে এবং আপনার পরিবারস্থ সকলকেই বধ করিব।" এই কথা শুনিয়া ত গুরুদেবের মহাচিন্তা হইল। তাঁহার আহারে অরুচি হইল; নিদ্রা তাঁহার লোপ পাইল; তিনি আসন্ন মৃত্যু চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন।

গুরুর সন্তানের মধ্যে মাত্র একটি ছেলে। কিন্তু সে মূর্খ ছিল। লেখাপড়া সে কিছুই জানিত না। লেখা পড়া করিতেই সে ভালবাসিত না। সে সারাদিন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া জীবন কাটাইত। শুধু আহার করিতে বাড়ী আসিত; অন্য সময় সে বাহিরে বাহিরেই কাটাইত। এদিকে এক এক দিন করিয়া ৬ দিন কাটিয়া গেল। ৭ দিনের দিন গুরুর বাড়ীতে আর রান্না খাওয়ার লক্ষণই দেখা গেল না। দুশ্চিন্তায় গুরু ও তাঁহার স্ত্রী অর্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় ছেলে বাড়ী আসিয়া দেখে, খাওয়ার কোন যোগাড়ই নাই। সে মহা রাগারাগি করিতে লাগিল। এদিকে তাহার বাপ মাও তাহাকে খুব তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া সে বাপকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? কেন খাওয়া দাওয়া না করিয়া তাঁহারা শুইয়া আছেন, আর তাহাকেই বা তিরস্কার করিতেছেন কেন? তখন তাহার বাবা তাহার নিকট সব ঘটনা বলিলেন। এবং বলিলেন, আগামী কল্যই রাজাকে শান্তির পথ বলিতে না পারিলে সকলেরই প্রাণ যাইবে।

ইহা শুনিয়া ছেলে বলিল, "তাহার জন্য চিন্তা কি? আমি রাজাকে শান্তির পথ বলিয়া দিব। আপনারা আহারের যোগাড় করুন। রাজা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনি আমাকে দেখাইয়া দিবেন। যাহা হয় আমিই বলিব।" ছেলের কথায় গুরুদেব কিছু শান্ত হইয়া উঠিয়া, আহারাদি করিলেন।

পরদিন পিতা পুত্র একত্র হইয়াই রাজবাড়ী গেলেন। রাজা বলিলেন,

'গুরুদেব আজ আপনার শেষ দিন। আমি আপনার নির্দেশ মত গত ৭ দিনও কাজ করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু কোনই শান্তি পাইলাম না। আজও যদি আপনি শান্তির পথ দেখাইতে না পারেন, তবে আপনাদের সকলেরই শিরচ্ছেদ হইবে।' গুরু নিজ পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার কথার উত্তর আমার ছেলে দিবে।' রাজা ছেলেকে বলিলেন, 'তুমি ইহার উত্তর দিতে পারিবে?' ছেলে বলিল, 'হ্যাঁ, মহারাজ, আমিই উত্তর দিব। তবে আপনাকে আমার কথামত কাজ করিতে হইবে, তাহা হইলেই আপনি শান্তির পথ দেখিতে পাইবেন।' রাজা সম্মত হইলেন।

তখন ঐ ছেলের কথামত রাজা ও গুরু দুই গাছি দড়ি লইয়া ছেলের সহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। কতদূর যাইয়া দেখা গেল, ৩টি বড় বড় গাছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। ছেলেটি তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, দুই গাছা দড়ি দিয়া রাজা ও গুরুকে দুইটি গাছের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিল এবং মধ্যের গাছটির উপর উঠিয়া, নিজে মহানন্দে গান ধরিল ও লাফালাফি করিতে লাগিল। এদিকে বন্ধনের যন্ত্রণায় রাজা অস্থির হইয়া ছেলেকে ডাকিয়া বন্ধন মুক্ত করিতে বলিলেন। কিন্তু ছেলের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। সে নিজের মনে নাচিতেছে, গাহিতেছে, যেন আনন্দের সীমা নাই। তখন রাজা গুরুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিন।' তখন গুরু বলিলেন, 'আমি যে নিজেই আবদ্ধ, আপনাকে কিরূপে মুক্ত করিব?'

যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে হঠাৎ রাজার দিব্য জ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন তাইত, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া আমি শান্তির আশা করি কি প্রকারে? আর যে নিজেই বদ্ধ, সেই বা আমাকে মুক্ত করিবে কি প্রকারে? আমি রাজত্ব করিয়া বিষয়জালে আবদ্ধ থাকিয়া, শান্তির আশা করিতেছি, মুক্তির আশা করিতেছি, আমার মত মূর্খ কে? তখন রাজা

গুরুপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এখন আমার বন্ধন মোচন কর। আমি শান্তির পথ পাইয়াছি।' তখন গুরুপুত্র তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। রাজা আর সংসারে ফিরিলেন না। সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মা এই গল্পটি বলিয়া বলিলেন, "বন্ধন জ্বালা অসহ্য হইলেই মুক্তির পথ পাওয়া যায়। আর বিষয়-বদ্ধ থাকিলে শান্তি পাইবে কি প্রকারে?

'সংসার' এবং 'তপস্যা' পদদ্বয়ের অর্থ।

আমি বলিতেছি না, সকলেই জঙ্গলে চলিয়া যাও। সংসারে থাকিয়াও শান্তি লাভ করা যায়। সংসার তাহাদের কাছেই তাপময়, যাহারা 'সং'কে 'সার' করিয়াছে। আর যাহারা জানে, আমরা 'সং' সাজিয়া আছি মাত্র, আমাদের প্রকৃত রূপ ইহা নয়, সংসার তাহাদিগকে তাপ দিতে পারে না। ত্রিতাপ জ্বালা এড়াইবার জন্যই তপস্যা করিতে হয়। তপস্যা মানে আমি ত বলি তাপ+সহা। এক তাপ দিয়াই আরেক তাপ নষ্ট করা যায়। শুদ্ধ বন্ধন নিলেই অশুদ্ধ বন্ধন কাটিয়া যায়। পরে সবই চলিয়া যায়।"

সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায়

এই সব কথা হইতে হইতে বেলা প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। সোলনের রাজা মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ভোলানাথ তাঁকে উপরে

শ্রীশ্রীমায়ের সোলন গমনের সিদ্ধান্ত এবং বিনয়বাবুর সহিত একান্তে আলাপ।

মার কাছে নিয়া আসিয়াছেন। মা তাঁকে বলিয়া দিলেন, আগামী কল্য প্রাতে ৯টা কি ১০টার সময় সোলন রওনা হইবেন। রাজা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেলেন, প্রাতেই তিনি মাকে নিয়া যাইবার জন্য মোটর পাঠাইয়া দিবেন। মেয়েদের সঙ্গে

আলাপ করিয়া বৈকাল প্রায় ৪টার সময় মা নীচে নামিয়া আসিলেন। একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তেরা আসিয়া মিলিতেছেন। কাল সোলন যাওয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, এই সব কথাবার্তা হইতেছে। অনেকেই মা সোলন কিছুদিন থাকিলে ছুটি উপলক্ষ্যে সোলন যাইবেন, বলিতেছেন। নানা কথাবার্তার পর, বিনয়বাবুকে সেই দিনই ঢাকায় ফিরিতে হইবে বলিয়া তিনি মার সহিত একটু একান্তে কথা বলিতে চাহিলেন। মা তাঁকে নিয়া একটী কোণের ঘরে বসিলেন। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পর, মা উঠিয়া নিজের বিছানায় আসিয়া বসিলেন। রাত্রি প্রায় ১টায় সকলে বিদায় নিলেন। হরিদাস বাবু সেদিন মার পায়ের কাছেই স্থান নিলেন; বাড়ী গেলেন না।

সোলন আগমন ও সকলের সহিত আলাপ।

২৪শে আষাঢ়, বুধবার, ৮ই জুলাই। আজ ভোর বেলা হইতেই সকলে আসিতেছেন। কেননা, আজ মা সোলন রওনা হইবেন। সকলেই মার চরণধূলা লইতেছেন ও পুনরায় দর্শনের প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভোলানাথ সকলকে ভরসা দিতেছেন ও আশীর্বাদ করিতেছেন। প্রায় ৯॥টায় আমরা ঁকালীবাড়ী হইতে রওনা হইলাম। অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মোটরের কাছে মেয়ে পুরুষ বহু একত্র হইয়াছেন। মাকে বিদায় দিতে সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। মেয়েরা শাঁখ বাজাইতেছেন; হুলুধ্বনি দিতেছেন; মাকে মালা পরাইতেছেন, বার বার চরণ ধূলা লইতেছেন। তবুও যেন আশা মিটিতেছে না। সকলকে হাসি মুখে বিদায় দিয়া মা মোটরে উঠিলেন। প্রায় ১১ টায় আমরা সোলন পৌঁছিলাম।

সোলনের রাজা, ডাক্তার সব আসিয়াছেন। মা বিছানায় বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। সকলে উঠিয়া গেলে, মা শুইয়া পড়িলেন। বৈকালে রানী, রাজা, রাজমাতা আসিয়াছেন। মা প্রায়

৮টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত কথা বলিলেন। প্রায় রাত্রি ১০ টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার। আজও প্রাতে জ্যোতিষ-দাদার সহিত মা একটু বেড়াইয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিলে মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। আজ মার খাওয়ার দিন। একটু দুধ ফল খাওয়াইয়া দিলাম। মা আপন মনে ঘরের ভিতরই হাঁটিতেছেন। কিছুক্ষণ পর উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিলেন। পরে ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। প্রায় ৫ টায় রানী আসিলেন। সকলে মার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ৮টায় রানী চলিয়া গেলেন। মা নিজের বিছানায় বসিয়া রহিলেন।

মিরজাপুরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয় এবার দেরাদুন হইতে আসিবার সময় মার সঙ্গেই আসিয়াছেন। সংসার হইতে দূরে সরিয়া তিনি সাধনার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক বার সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন কিন্তু ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন। মধ্যে মধ্যে কেমন চঞ্চল হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। খুব ভাল লোক; চেহারা দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। বয়স প্রায় ৬০।৬৫ হইবে। এবারও তিনি কিছু দিন যাবৎ (উৎসবের পূর্বেই) মিরজাপুর হইতে আসিয়া মার আদেশে একটী নির্জন স্থানে ছিলেন, এখন সোলন থাকিবেন ভাবিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মনটা আবার চঞ্চল হইয়াছে। রানীরা চলিয়া যাওয়ার পর উপেনবাবু, জ্যোতিষদাদা প্রভৃতি মার কাছে গিয়া বসিয়াছেন। মা উপেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তুমি কোথায় থাকিতে চাও? এ জায়গাটা কেমন লাগিতেছে?" উপেনবাবুর স্ত্রী বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁকে অনুরোধ

মিরজাপুরের ডাক্তার উপেন্দ্রবাবুর কথা।

করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। মা বলিতেছেন, "এখনই বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দাও যে, মাও তোমার সঙ্গে আসিয়া সাধন ভজন করিতে রাজি কি না? নতুবা এইরূপ বার বার যাওয়া আসায় লাভ কি? ইহাতে কোন কাজও হয় না। সময় ত চলিয়া গেল। একটা কিছু ঠিক করা দরকার। ছোট ছেলে মেয়ের একটা বন্দোবস্ত করা যাইবে। এখনই চিঠি লিখিয়া দাও। দেরী করিও না।"

মার এক এক সময় দেখিয়াছি, যেই কিছু একটা বলেন তখনই তাহা করাইয়া লন। আবার বলিতেছেন, "তোমাদের সকলেরই দেখি, গা-ছাড়া ভাব। এও করিতেছে, ওদিকেও যাইতেছে। একটা জোর করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া কাজ আরম্ভ করত দেখি? কোন দিকের কাজেই যেন তোমরা লাগিয়া থাকিতে পার না। কয়েক জন অন্ততঃ দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া এদিকের কাজে লাগিয়া যাও ত দেখি? ফলের দিকে চাহিও না। শুধু নিত্য নিয়মিত কাজ করিয়া যাও।" এইরূপ নানা কথার পর রাত্রি প্রায় ১১ টায় মা শুইয়া পড়িলেন। আমরাও পায়ের কাছে, গায়ের কাছে, নিজেদের কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

উপেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ।

২৬শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, শুক্রবার। আজও প্রাতে একটু বেড়াইয়া আসিলেন। শুনিলাম, রাস্তায় মাকে দেখিয়া রাজমাতা মাকে ডাকিয়া নিয়া কথাবার্তা বলিয়াছেন। মা ফিরিয়া আসিয়া মুখ ধুইলেন না। বলিলেন, "খাওয়া নাই। কাপড় ছাড়া বা মুখ ধোয়ারও কোন দরকার নাই।" অনেক সময় এ সবগুলি আমাদের কথায় করেন; সব সময় করেনও না। বিছানার উপর বসিয়া আছেন। নিকটে জ্যোতিষদাদা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, উপেনবাবু বসিয়া আছেন। ভোলানাথও

সোলন পরিত্যাগের ও জ্যোতিষদাদাকে সোলনে রাখিয়া আসিবার সঙ্কল্পের পূর্বাভাস।

পাশের ঘরে চৌকীর উপর বসিয়া আছেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথা বার্তা বলিয়া বেলা প্রায় ১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। ৪টায় উঠিয়াছেন। ভাবটা খুব চট্‌পটে। উঠিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন, "কবে এখান হইতে যাইবে বল?" তিনি ইসারায় বলিতেছেন, "আমি জানি না।" অমনি বলিতেছেন, "তবে আমি যা বলিব, তাই হইবে।" জ্যোতিষদাদাকে বলিতেছেন, "তুই কোথায় থাক্‌বি বল।" তিনি বলিলেন, "আমি সঙ্গে যাইব না?" মা বলিলেন, "না, সব সময় কি সকলে সঙ্গে থাকিতে পারে? আমি কোথায় থাকি, কোথায় যাই, ঠিক কি?" জ্যোতিষদাদাকে সোলন রাখিয়া যাওয়ারই কথা হইতেছে।

কিছুক্ষণ পর, জ্যোতিষদাদার সহিত খাওয়া দাওয়ার কথা উঠিয়াছে। জ্যোতিষদাদা বলিতেছেন, "আমার মনে হয়, ভোগ করিয়া করিয়া শেষ করাই ভাল। নতুবা ধামা চাপা দিয়া রাখা ঠিক নয়।" মা বলিতেছেন, "তবে ত সারা জীবনেও ভোগ শেষ হইবে না।" জ্যোতিষদাদা বলিতেছেন, "না হউক; আগামী জন্মে হইবে।" মা বলিতেছেন, "ও কথা আমি মানিনা; ভোগ শেষ করিবার জন্য শুধু ভোগই করিতে হয় না। তাতে প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়াই যায়। ভোগে-ত্যাগে ভাল। যেমন পেটের অসুখ যাহাদের আছে তাহারা শুধু খাই খাই করে, তা' বলিয়া যদি তাহাদের শুধু খাইতেই দেওয়া হয়, তবে ব্যারাম কখন ভাল হইবে না, খাই খাইও যাইবে না। সম্ভব মত সব করিতে হয়, তবেই মন ও শরীর সুস্থ থাকে। ধীরে ধীরে আসল ভোগের প্রবৃত্তি বাড়াইবার কর্মাদি নেও। দেখিবে, যে ত্যাগ হওয়া ভোগগুলি আপনা হইতেই ছাড়িয়া দিবে। এ সব ভোগ কিন্তু ত্যাগ হওয়ারই। যেমন দেখনা, গাছের যত্ন করিলে ধীরে ধীরে গাছের নূতন পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িয়া যায়, টানিয়া ফেলিতে হয় না, টানিয়া ফেলিলেই গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সোলনে জ্যোতিষ-দাদার সহিত 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের কথা।

তেমনই জোর করিয়া কোনটা করিতে নাই। আবার গা-ছাড়া দিয়াও বসিয়া থাকিতে নাই। কর্ম-জগৎ। বিধিমত কর্মাদিতে নিজেকে বাঁধিয়া নেওয়া দরকার।"

এই সব কথাবার্ত্তার পর রাজা, রানী, রাজমাতা প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন। রাজমাতা মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মা বৃত্তি নিরোধ করিবার উপায় কি?" মা বলিলেন, "শুধু সেই এক বৃত্তিতে লাগিয়া থাকা। সেই এক বৃত্তি না ধরিলে, বাহিরের প্রবৃত্তি যাইবে না। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়, বেশী করিয়া, তাঁর জন্য দাও। যেমন দুই বেলা খাওয়ার সময় স্থির ভাবে না খাইলে খাওয়া ভাল হয় না; তারপর সারাদিন পান, সুপারী, জল, ফল, যা খাও, তা কথাবার্তা বলিয়া বলিয়াও খাওয়া চলে, তেমনই নাম বা যার যে ভাবে উপাসনা, সব কাজের মধ্যে সেইটিই ধরিয়া থাক ক্ষতি নাই। কিন্তু অন্ততঃ ২।৩ ঘন্টা সব দূরে সরাইয়া, এক মনে নির্জনে বসিয়া তাঁর উপাসনায় মন পুষ্ট হয়। তোমার মধ্যেই সব আছে। ব্যক্ত, অব্যক্ত, অনন্ত, সব তোমারই মধ্যে আছে। যেমন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ফুলটি কেমন? তুমি যতটুকু প্রকাশ করিতে পারিলে ততটুকুই ব্যক্ত। আবার বাস্তবিক ফুলটি দেখিয়া তোমার কি ভাব হইয়াছে বা ফুলটির প্রকৃত রূপ তুমি ভাষায় কিছুতেই ব্যক্ত করিতে পারিবেনা; এই হইল অব্যক্ত। আবার অনন্ত- যেমন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, গত ১০ মিনিট তোমার মনটা কি কি চিন্তা করিয়াছিল? কোথায় কোথায় গিয়াছিল? তুমি বলিতে পারিবে না। এই ১০ মিনিটেই সে কত কি চিন্তা করিয়াছে, কত দূর গিয়াছে অন্ত নেই। এই দেখ, তোমারই মধ্যে অনন্তত্বও রহিয়াছে। আবার দেখ, তোমার শরীরের যে অংশটা ধরিব, একমাত্র তোমাকেই ধরা হইবে। তোমার হাত ধরি, তোমাকেই ধরা

সোলনের রাজমাতার প্রশ্নে শ্রীশ্রীমায়ের জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী

হইল, তোমার চুল ধরি, তোমাকেই ধরিলাম। তোমার পা ধরি, তোমাকেই ধরিলাম। সব নিয়াই তুমি। তেমন আর একটু বুঝিলেই দেখিবে, সমস্ত নিয়াই তুমি, একমাত্র স্থূলের ভিতরই দেখ, তোমা ছাড়া কিছুই নাই। ব্যক্ত, অব্যক্ত, অনন্তত্ব, একত্ব, একটু চিন্তা করিলেই ধরা যায়। আর একটা কথা, মহাত্মারা জীব জগৎ কি, তাহা বিশেষ ভাবে জানিয়া, একেবারে তত্ত্বাবাপন্ন হইয়া যান। একটা গাছ দেখিয়া একেবারে গাছের ভাবটা গ্রহণ করিতে পারেন; একটা জন্তু দেখিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সেই জন্তু ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারেন। তেমন একটা লোক দেখিয়া, সম্পূর্ণভাবে তাহার ভাবটা নিজের মধ্যে নিতে পারেন। তাই কিছুই তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকে না।" এইরূপ নানা কথার পর রাত্রি ৮৷৷ টায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সিমলা হইতে চারি জন ভদ্রলোক মার দর্শনে আজ আসিয়াছেন। আজ শুক্রবার, সুতরাং শনি, রবিবার মার কাছে থাকিতে পারিবেন। ২।১ দিনের ছুটি পাইলেই সিমলা হইতে ভদ্রলোকেরা মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, "মাকে ছাড়িয়া থাকাই মুস্কিল হইয়াছে। মহাত্মাদের এই আকর্ষণে পড়িয়া সাধারণ লোক ছট্‌ফট্‌ করে। তাহারা না পারে ছাড়িতে, না পারে ধরিতে।" রানী উঠিয়া গেলে, সকলে গিয়া মার কাছে বসিলেন। ডাক্তার মদন ও তাঁহার ভাই এবং অন্যান্য কয়েক জন ভক্ত আসিয়াছেন। সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ মার কাছে কীর্তন করিলেন। মা কিছুক্ষণ পর উঠিয়া হাঁটীতে লাগিলেন। অনেক সময় মা এইভাবে আপন মনে পায়চারি করেন। মনে হয়, কত কি চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু মা নিজ মুখেই বলিয়াছেন, "কোনরূপ সঙ্কল্প বিকল্প তোমরা মনে করিও না। যাহা যখন হইবার, আপনা হইতেই

শ্রীশ্রীমায়ের অসাধারণী আকর্ষণী শক্তি। সোলনে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য।

হইয়া যাইতেছে।" রাত্রি প্রায় ১১ টায় সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন।

ঘুম যাওয়ার সম্বন্ধে মা নিজ মুখেই বলিয়াছেন, আমরা সাধারণ ভাবে যে ঘুমাই, এ ঘুম তাঁর আসে না। কখনও পড়িয়া থাকেন; কখনও দেখিয়াছি, রাত্রিতে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া দুলিতেছেন। কখনও বা সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়াই কাটাইয়া দিলেন; ভোরবেলা যখন আমরা উঠিলাম, মা মুড়ি দিয়া তখনই শুইয়া পড়িলেন। শুইবার কোন সময় অসময় তাঁহার নাই। মার এখনকার ভাবটা কেমন যেন চাপা ভাব। অবশ্য বাহিরে হাসি খুসির কিছু মাত্র অভাব নাই।

সাধারণ নিদ্রা শ্রীশ্রীমায়ের নাই

অষ্টাত্রিংশৎ অধ্যায়

২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, শনিবার। আজও প্রাতে মা বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে জ্যোতিষদাদা ও সিমলার ২।১ জন ভদ্রলোক আছেন। প্রায় ৭॥ টায় ফিরিয়া আসিলেন। আজ খাওয়ার দিন। তাই মুখ ধোয়াইয়া কিছু জল খাওয়াইয়া দিলাম। সিমলার ভদ্রলোকদের সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। বেলা প্রায় ১১ টায় উজির সাহেবের বাসা হইতে মার ভোগ আসিল, বিরাট ভোগ। নানা রকমের খাদ্য দ্রব্য। উজির সাহেবও সপরিবারে আসিয়াছেন। আজ মার ভোগ বিশেষ ভাবে হইবে। তাই আজ শিশুরাও কেহ কিছু খায় নাই। উজির সাহেবের স্ত্রী নিজ হাতে মাকে

সোলনের উজির সাহেবের বাটী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের বিরাট ভোগ। (১৩৪৩, ২৭শে আষাঢ়) (১১ই জুলাই, ১৯৩৬)

খাওয়াইয়া দিলেন। পরে উজির সাহেব প্রভৃতি সকলেই মার প্রসাদ পাইতে বসিলেন। সকলের প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। মা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। উজির সাহেবের বাড়ীর সকলে চলিয়া গিয়াছেন।

বেলা প্রায় দুইটায় মা উঠিয়া বসিলেন। আমাকে বলিতেছেন, "বেদ পড়িয়া শুনাও।" তাই পড়িলাম। সামবেদ সঙ্গেই ছিল। কারণ, তাই রোজ আমাকে একটু একটু পড়িতে মা আদেশ করিয়াছেন। রোজই একটু একটু পড়ি। মার পূর্ব লীলার কথা সিমলার ভদ্রলোকেরা শুনিতে চাহিলেন। তাহাই তাঁহাদের কাছে একটু বলিতে আরম্ভ করায়, মা উঠিয়া অপর ঘরে চলিয়া গেলেন। উপেনবাবু, জ্যোতিষদাদা প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তথায় গিয়া বসিলেন।

আজ কয়েক দিন যাবৎ মা সাপ সাপ করিতেছেন। আমাদের জানা আছে, যে যখনই মা সাপ সাপ করেন, তখনই, যেখানেই হউক, সাপ দেখা দেয়। মার সঙ্গে সাপের যেন দেখা হওয়াই চাই। আজও যেই মা বিছানা ছাড়িয়া অপর ঘরে গিয়াছেন, অমনি বাঁশি বাজাইয়া একটা সাপুড়ে মাকে সাপের খেলা দেখাইতে আসিয়া হাজির। মা হাসিয়া বলিলেন, "আমার এখনই মনে হইতেছিল ওরা (সাপুড়ে ও সাপ) আসিবে।"

সর্প-দর্শনের পূর্বাভাব। সর্পসহ সাপুড়ের আকস্মিক আগমন এবং ঐ সর্পের শ্রীশ্রীমাকে প্রদক্ষিণ।

সাপুড়ে সাপ বাহির করিল। সাপটি একবার খেলিতে খেলিতে মার দিকে মুখ করিয়া চারিদিক ঘুরিল। মা আপন মনেই যেন (খুব আস্তে আস্তে) বলিতেছেন, "প্রদক্ষিণ করিল।" আমি মার গায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাই আমিই শুধু এ কথা শুনিলাম। সাপুড়ে চলিয়া গেল।

মা আবার আসিয়া নিজের বিছানায় বসিয়াছেন। উপস্থিত সকলেই মার কাছে বসিয়া আছেন। কাল যে 'ভোগ' ও 'ত্যাগে'র কথা উঠিয়াছিল,

সেই কথা উঠাইয়াই, মা আজ আবার বলিতেছেন "দেখ, ভোগে ত্যাগে দরকার। ছেলে যখন কিছু লেখা পড়া শিখিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার নম্বর কাটা যায়। একে বারে যে কিছুই জানে না, সে যেমন করিয়াই লেখে, মাস্টার বলেন, 'বেশ হইয়াছে।' কিন্তু একটু শিখিয়া উঠিলেই, একটু ভুল হইলেই, তার নম্বর কাটিয়া দেন। ইহাই শিক্ষার নিয়ম। আর একটা কথা দেখ। কিছু শিখিয়া উঠিলেই, একটু একটু ভুল থাকিলেও, সেই ছাত্রকে নূতন পড়া দেন। এই নূতন পড়া শিখিতে শিখিতে পুরানো পড়ায় যে একটু একটু ভুল ছিল, তাহাও শিক্ষা হইয়া যায়। একটু ভুল আছে বলিয়াই উহা নিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। তেমনই একেবারে কামনা শেষ হইলেই, এই ভোগটি ছাড়িব, ইহা ভাবিয়া বসিয়া থাকিতে নাই। একবার ভোগ, একবার ত্যাগ, এই ভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ কামনা শেষ হইয়া যায়। যতটুকু শুদ্ধ ভাব ভিতরে যায়, তাতেই কাজ হয়। এই ভাবে চেষ্টা না করিলে, বৃদ্ধ কালে এই দুঃখ থাকে, যে কিছুই চেষ্টা করি নাই। এ সংস্কার থাকাও ঠিক নয়। ভোগ না করিতে করিতেও ক্রমশঃ বাসনা শেষ হইয়া যায়। কাজেই বসিয়া থাকা ঠিক নয়।"

পূর্বদিনের 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের পুনশ্চ অবতারণা, এবং সাধারণ উপমা দ্বারা বিশদীকরণ।

একটি স্ত্রীলোক একটি শিশু নিয়া মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শিশুটি মাকে বসিতে দিতেছে না। বড়ই বিরক্ত করিতেছে। স্ত্রীলোকটি মাকে বলিতেছেন, "মনে করিয়াছিলাম, আপনার কাছে একটু বসিব। কিন্তু শিশুটি বড়ই বিরক্ত করিতেছে। বসিতে দিতেছে না।" এই বলিয়া, তিনি মাকে প্রণাম করিয়া

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ—আনন্দ প্রাপ্তি প্রার্থনায় অশান্ত শিশুর মত শ্রীশ্রীভগবান্‌কে সর্বদা বিরক্ত করিতে হয়।

বিদায় নিলেন। মা অমনি হাসিয়া বলিতেছেন, "এই রকমই ত হওয়া চাই। তোমরাও ত শিশু। তোমরা কেন তেমাদের মাকে (ভগবান্‌কে) এইরূপ বিরক্ত করিতে পার না? তোমরা কেন বলিতে পার না, 'হে ভগবান্, যতক্ষণ তুমি আমাদের সেই আনন্দ না দিবে, ততক্ষণ আমরা তোমাকে দিনরাত বিরক্ত করিব; তোমাকে ছাড়িব না।' আমরাও ত শিশু। আমরা সেবার কি জানি? আমরা শুধু আনন্দের জন্য তাঁকে বিরক্ত করিব।" মা এই রকমই সাধারণ কথার মধ্যেই কত অমূল্য উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা শুনিও না; বুঝিতেও চেষ্টা করি না।

বৈকালে রাজা আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁর প্রধান পণ্ডিত আসিয়াছেন। কয়েক দিন বৃষ্টির পর আজ বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "আজ বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে।" পণ্ডিতটি বলিতেছেন, "এই রকম রৌদ্র থাকিলে, ২।৩ দিনেই ক্ষেতের সব জমি তৈয়ার হইয়া যাইবে।" মা হাসিয়া বলিতেছেন, "জমি তৈয়ারই ত চাই, সেইজন্যই ত যত চেষ্টা। এমন তৈয়ার করা চাই, যেন বীজ পড়িলেই গাছ উঠিয়া, ফল ও ফুলে শোভা পায়।" কিছুক্ষণ কথা বার্তার পর রানী আসিলেন। সকলে উঠিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় ৮টায় রানী চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা বলেন, "জমি তৈয়ারই ত চাই।"

মা সাধারণতঃ রাত্রিতে বিশেষ কিছুই খান না। আজ সিমলার ভক্তেরা আছেন। তাই রান্না হওয়ায়, সকলে খাইতে বসিয়াছেন। ভোলানাথও বসিয়াছেন। মা হাঁটিয়া বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ আসিয়া ভোলানাথের কাছে বসিয়া বলিতেছেন, "আমাকে একটু ভাত খাওয়াইয়া দাও।" তিনি ২।১ গ্রাস খাওয়াইয়া দেওয়ার পরই, মা উঠিয়া বলিলেন, "আমি উঠিলাম, আর খাইব না।"

সিমলার ভক্তগণের ভোলানাথ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ একত্রে গ্রহণের পরম সৌভাগ্য।

ভদ্রলোকেরা আজ বাবা ও মার প্রসাদ অভাবনীয় ভাবে একত্রে পাইয়া মহা আনন্দে উৎফুল্ল। সকলেই চাহিয়া চাহিয়া প্রসাদ নিতেছেন। পূর্বে ভোলানাথের সহিত মা অনেক সময়ই একত্র আহার করিতেন। কখনও এক পাতেই বসিতেন, ভোলানাথই খাওয়াইয়া দিতেন। কখনও বা এক পাতে বসিয়াছেন, আমরা খাওয়াইয়া দিয়াছি। এখন আর বড় বসেন না। তাই ভক্তেরা নূতন এই দৃশ্য দেখিয়া বড়ই আনন্দ করিতেছেন। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

"ঘরের খবর নেও, সময় ত চলিয়া যাইতেছে তাঁকে ডাক।"

২৮শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই, রবিবার। প্রতিদিনের মত আজও মা প্রাতে একটু বেড়াইতে আসিয়াছেন। খাওয়া নাই, মুখও ধুইলেন না। বিছানায় বসিয়া উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। আজকাল প্রায় সর্বদা বলেন, **"নিজেদের ঘরের খবর নেও, সময় ত চলিয়া যাইতেছে। তাঁকে ডাক।"** দুপুরেও মা একটু শুইয়া ছিলেন। বৈকালে সিমলার ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলেন।

রানী, রাজা, রাজমাতা আসিয়াছেন। মা আজ কথায় কথায় তাঁহাদের নিকট ঁনবদ্বীপের এক মৌনী সাধুর গল্প করিলেন। মা একবার ঁনবদ্বীপ গিয়াছিলেন। সঙ্গে ভোলানাথ ও অপর অনেকে ছিলেন। তাঁহারা এক মৌনী সাধু দেখিয়া আসেন। সাধুর ঘরের ভিতর কেহ যাইতে পারে না। দূর হইতে সকলে দেখিল, সাধু এক আসনে বসিয়া আছেন। কিন্তু এত

ঁনবদ্বীপের মৌনী সাধুবাবার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের গল্প

স্থির মূর্তি, যে অনেকেই প্রায় স্থির করিয়া আসিল, উহা মাটির মূর্তি; কৃষ্ণনগরের তৈয়ারী, কেননা, চক্ষে পলক পর্যন্ত দেখিল না কিন্তু মার মনে তাহা ঠিক লাগে নাই। কিছুদিন পর মা ঘুরিতে ঘুরিতে আবার ঁনবদ্বীপ যান। তখন সঙ্গে গিরীনদাদা ও জিতেনদাদা এবং গিরীনদাদার বিধবা ভ্রাতৃবধূ

ছিলেন। এই গিরীনদাদা একজন বিলাত-ফেরত এম, বি, ডাক্তার। মার অনেক দিনের পুরান ভক্ত। জিতেন দাদা এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল। ইনিও মার বহুদিনের পরিচিত। মার আদেশে তাঁরা দুই জনেই মাকে ও গিরীনবাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ঁনবদ্বীপ রাখিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

মা ঐ মৌনী সাধুবাবার আশ্রমেই বাসা নিলেন। একটি ঘরে থাকিতেন। ২।১ খানা রুটি ও একটু শাক সিদ্ধ দিনান্তে খাইতেন। মার কাছে কোন রহস্যই গোপন থাকে না। মৌনী বাবার শিষ্যা এক বৃদ্ধা প্রথমে মাকে জানাইয়াছিল, "বাবা কিছুই খান না। অতি সামান্য একটু দুধ মুখের কাছে ধরিলে, কখনও কখনও গ্রহণ করেন।" মাকে ওখানে থাকিতে দিতেই রাজি ছিল না। মা বারান্দায় বসিয়া থাকিবেন বলায়, একটু দূরে এক খানি ঘরে থাকিতে দিল। কয়েক দিন থাকিতে না থাকিতেই সাধুটি দুই বেলা খান, একটু কথাও বলেন, সবই প্রকাশ পাইল। বৃদ্ধাটি একদিন আসিয়া মাকে সাধুটির সঙ্গে কথা বলিবার জন্য ডাকিয়া নিয়া গেল। শেষে মার সঙ্গে সাধুটির অনেক আলাপ হইল। সকলেই আশ্চর্য হইল যে, সাধু এত কথা আর কাহারও সঙ্গে এযাবৎ বলেন নাই। ক্রমে তিনি মার কাছে নিজের সমস্ত জীবনীও বলিলেন। মাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষে ইহাও বলিলেন, "তাঁর এখানে আর ভাল লাগিতেছে না। এই ভাবে ফাঁকির কারবার তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু ঐ বৃদ্ধাটি তাঁকে কিছুতেই যাইতে দিতেছে না। বৃদ্ধাটির অনেক স্বার্থ আছে।" মাও বলিলেন, "গতবার তোমাকে দেখিয়া অনেকে পুতুল মনে করিয়া গিয়াছিল তখন হইতেই আমার মনে হইয়াছিল, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিতে হইবে। তাই আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি। এখন আমি চলিয়া যাইব।" সাধুটিকে যাহা বলিবার বলিয়া আসিলেন। ইহার পরে একবার আমরা মার সঙ্গে ঁনবদ্বীপ গিয়া দেখিলাম, সাধুটি অন্যত্র চলিয়া

গিয়াছেন। মা এই সব গল্প রাজমাতার কাছে করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ৮টায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। প্রায় ১০টায় মা শুইয়া পড়িলেন।

একোনচত্বারিংশৎ অধ্যায়

২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার। আজও প্রাতে মা বেড়াইয়া আসিয়াছেন। মুখ হাত ধুইয়া সামান্য একটু কিছু খাইলেন। খাওয়াও যেন কমিয়া যাইতেছে। খাইতে বসিয়া, ছেলেমানুষের মত অন্যমনস্ক হইয়া কখনও ঢুলিতেছেন, কখনও একটা কিছু নিয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিতেছেন। সেই দিকেই যেন মহা মনোযোগ। খাওয়ার দিকে লক্ষ্যই নাই। কাজেই খাওয়াও হয় না। জল খাইয়া আবার জ্যোতিষদাদাকে নিয়া বাহির হইলেন। প্রায় ৯টায় ফিরিলেন। শুনিলাম, আজও রাজমাতার বাড়ীতে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল, মা কাহারও ঘরের ভিতর যান না। বাহিরে গিয়া বসেন। ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। প্রায় ১২ টায় ভোগ তৈয়ার হইল। মাকে ভোগে বসান হইল। বসিয়াই বলিতেছেন, "খাওয়ার খেয়াল হইতেছে না।" যেন জোর করিয়াই সামান্য একটু খাওয়াইয়া দিলাম। প্রায় ১॥ টায় আবার শুইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ভাবান্তর নিবন্ধন আহারে অপ্রবৃত্তি।

বৈকালে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। উপেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কাজে লাগিয়া যাওয়া দরকার। মরি বাঁচি লক্ষ্য ছাড়িব না। নিত্য নিয়মিত ভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় লাগিয়া যাও দেখি? শোন দেখি, গান করি।" এই বলিয়া আমাকে গানের

খাতাটা নিয়া আসিতে বলিলেন। মার মনে থাকে না বলিয়া কয়েকটি গান একটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, মা অনেক সময় সেই গানগুলি করিতেন। খাতা নিয়া আসিলাম। মা কয়েকটি অতি সুন্দর সুন্দর গান করিলেন। আমাকে মৌন থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।* কাজেই উপেন্দ্রবাবুই খাতা দেখিয়া মাকে গান বলিয়া দিতেছেন। আর মা ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছেন। উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখের সঙ্গীত অতি মধুর।

গান আরম্ভ করিলেই মার চোখ জলে ভরিয়া লাল হইয়া যাইত। চোখ বুজিয়া দুলিয়া দুলিয়া গান করিতেন। মার মুখে ঐ ভাবের গানগুলি শুনিয়া সেই সময়ের জন্য সকলেরই মন উদাস হইয়া গিয়াছিল। মাও বলিতেছিলেন, "দেখ এই যে গান হইতেছে, এই আমরা সাধনা করিতেছি। এই যে সাময়িকের জন্যও গান শুনিয়া মনটা উদাস হইয়া যাইতেছে, এও 'মহা সাধনা'।" অনেকক্ষণ গান করিলেন। সাধারণতঃ এতক্ষণ গান বড় করেন না। একটী পাহাড়ী অতি বৃদ্ধা সধবা স্ত্রীলোক, মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখাইয়া মা বলিতেছেন, "এই মাতাজীর জন্যই এত গান হইল। এই মাতাজী বড় ভাগ্যবতী।" এই বলিয়া স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।

গান করিবার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বাহ্যিক অবস্থা।

---

*পৈতার পর হইতেই আমাকে ধীরে ধীরে মৌন অভ্যাস করাইতেছেন। প্রথমে ৩ ঘন্টা মৌন রাখিতেন। শেষে সমস্ত দিন মৌন থাকিয়া সন্ধ্যা হইতে কথা বলার আদেশ হইল। শেষে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দিনে ১২টা হইতে ৪টা, এই ৪ ঘন্টা, কথা বলার আদেশ হইল। পরে যখন বিন্ধ্যাচলে একা ফেলিয়া গেলেন, তখন ১২টা হইতে ২টা, এই ২ ঘন্টা মাত্র কথা বলা বা চিঠিপত্র লিখার জন্য আদেশ দিয়া গেলেন। মার সমস্ত বিষয়ই এমন ভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস করার নিয়ম।

বৈকালে প্রতিদিনের মত রাজারানী আসিয়া মার চরণ দর্শন করিয়া সন্ধ্যার পরই তাঁরা চলিয়া গেলেন। আজও উপস্থিত সকলে মিলিয়া মার কাছে একটু কীর্তন করিলেন। মা, মা, নামে কীর্তন হইতেছিল। ভক্তদের মুখের মা, মা, ধ্বনিতে বায়ুমণ্ডলও পবিত্র করিল। মাও নীরবে বসিয়া সে ডাক শুনিলেন। সোলন খুবই নিরিবিলি স্থান। চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের গায়েই এই মন্দির। সন্ধ্যার পর ত একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। তার মধ্যে মার কাছে বসিয়া কয়েকটি ভক্ত মাত্র "মা, মা" কীর্তন করিতেছেন। কাজেই বেশ মিষ্টি শুনাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে চলিয়া গেলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু আজ যেন চুপ করিতেছেন না।

মাতৃ সমীপে সন্ধ্যায় 'মা' 'মা' নামে মধুর কীর্তন।

মধ্যে মধ্যে মার এই রকম হয়। কোন দিন একেবারে চুপ করিয়া পড়িয়া আছেন। কোন দিন বার বার শুইতেছেন, কিন্তু চুপ করিতেছেন না। কখনও শুইয়া গান ধরিলেন। কখনও যেন কোন অদৃশ্য ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছেন, এই ভাব। আমরা এই কথা বলা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছেন, "যেমন তোমরা আমার চোখের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য, উহারাও তাই। যদিও তোমরা দেখিতেছ না, কিন্তু আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য।" আবার একদিন এই বিষয়েই কথা হওয়ায় বলিতেছিলেন, "তোমাদের চেয়ে ওরা অনেক ভাল, ওরা তোমাদের মত সব কথায় প্রতিবাদ করে না।" আজ অনেক রাত্রিতে একটু চুপ করিয়া শুইলেন।

শ্রীশ্রীমা মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য ব্যক্তির সহ কথা কহিতেছেন, এই ভাব এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি।

৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার। আজও প্রতিদিনের মতই একটু বেড়াইয়া আসিয়াছেন। আজ উপবাসের দিন। মা বিছানায় বসিয়া

আছেন। একটু পরেই শুইয়া পড়িলেন। দুপুরে উঠিয়া বসিয়াছেন। আমাকে বলিতেছেন। "দেখ একটা ঘরে যদি জিনিস পত্র ভরা থাকে তবে সেই ঘরে জোরে আওয়াজ করিলেও প্রতিধ্বনি হয় না। আর একটা শূন্য ঘরে একটু শব্দ করিলেই প্রতিধ্বনি হয়। সেই রূপ তোমরা যদি মনটা পরিষ্কার রাখিতে পার, তবে তোমাদের স্বরূপটা আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। প্রতিধ্বনিতে নিজের আওয়াজটাইত শুনতে পাও? তেমনই নিজেরই স্বরূপটা শুদ্ধচিত্তে ফুটিয়া ওঠে। তাই বলি, মনটাকে শুদ্ধ পবিত্র করতে চেষ্টা কর। নিয়মিত উপাসনাদ্বারাই চিত্তশুদ্ধ হয়। যার যে ভাবে ভাল লাগে, উপাসনা কর। নাম জপ, কি কীর্তনাদি, কি সদ্গ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা; যার যে ভাবে ইচ্ছা, চিত্ত শুদ্ধ করতে চেষ্টা কর। আর রোজ শুইবার সময় মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়, আজ কি কি অন্যায় কাজ করিয়াছি। এই ভাবে বিচার করিয়া করিয়া ধীরে ধীরে দোষগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিলে মনটা ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া আসে।"

শুদ্ধচিত্তে স্বরূপ প্রকাশ স্বতঃই হয়। (সাধারণ উপমা)।

প্রাণায়ামের কথায় বলিতেছেন, "প্রাণায়াম মানে প্রাণের আরাম। নাম জপ যদি ঠিক ঠিক মত করিতে পার, দেখিবে, তাতেও আপনিই প্রাণায়াম হইয়া যায়। শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিলে খুব উপকার হয়।" এইসব কথাবার্তা হইল।

প্রাণায়াম।

মা আজ কাল অনেক ইংরাজী ভাষা বলিয়া নিজেই হাসিতে থাকেন। কিন্তু বলেন' ঠিক ঠিক। অনেকে বলিয়াছেন, "মা, তুমি যে ইংরাজী জান না, তোমার এই ২।৪টি ইংরাজী ভাষা শুনিয়া তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। তোমার উচ্চারণ খুব সুন্দর হয়। আর, বল এমন ঠিক ঠিক জায়গায়' যেন খুব ইংরাজী জান।" মা হাসিয়া বলেন, "আমি ত কিছু জানি না। যেমন হিন্দী

শ্রীশ্রীমায়ের বিনা শিক্ষায় ইংরাজী জ্ঞান।

বলিয়া যাই, এও তেমনিই—যেমন বাহির হইয়া যায়।" অখণ্ডানন্দ স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মা তুমি সব ভাষাই ইচ্ছা করিলে বলিতে পার, বোধ হয়।" মা উত্তরে বলিলেন, "আমি পারি না পারি, বলিতেছিনা; কিন্তু এমন একটা স্তর আছে যেখানে পৌঁছিলে ইচ্ছামত সে সব ভাষারই কথা বলিতে পারে। যেমন দেখনা, এই যে এই শরীরটার ভিতর দিয়া স্তোত্রাদি বাহির হইয়া যায়। ইংরাজী, হিন্দী সবই সেইরকম আর কি।" প্রতিদিনকার মত আজও মা প্রায় ১১টায় শুইয়া পড়িলেন।

চত্বারিংশৎ অধ্যায়

৩১শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বুধবার। আজও প্রতিদিনের মতই মা প্রাতে একটু বেড়াইয়া আসিয়াছেন। আজ জ্যোতিষ দাদা তাঁহার রক্ত পরীক্ষার জন্য কসৌলি যাইবেন। রাজার দুই মোটর যাইতেছে। মাও ভোলানাথ তথায় বেড়াইতে যাইতেছেন। হরিরাম কাল দেরাদুন হইতে আসিয়াছে। সিমলা হইতে হরিরামের ভাই বদ্রি আসিয়াছে। সকলেই কসৌলি মার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেছে। উজিরসাহেবই নিয়া গেলেন। আমরা প্রায় ৮।৯ জন সঙ্গে গেলাম। খাওয়া দাওয়া করিয়া প্রায় ১২টায় আমরা রওনা হইলাম। প্রায় ৬টায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে হরিরামদের সমস্ত পরিবার ও উজিরসাহেব তাঁর ছেলে সব এখানে মার প্রসাদ পাইলেন। হরিরামদের বাড়ী হইতেই (ডাক্তার মদনের বাসা) অনেক তরকারী পাক হইয়া আসিল। সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে প্রসাদ পাইলেন। খাওয়া দাওয়ার

শ্রীশ্রীমায়ের কসৌলি দর্শনান্তে সোলনে প্রত্যাবর্ত্তন।

পর মার কাছে গিয়া সকলে কিছুক্ষণ বসিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে দেখিয়া মাকে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন।

৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার। আজও প্রাতে মা বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। খুব বৃষ্টি হইল। প্রায় ৮টায় মা ফিরিলেন। কোথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, বেশী ভিজেন নাই। মা আসিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। হরিরাম ও অন্যান্য সকলে বসিয়া আছেন। মা ২।১টি কথা তাহাদের সহিত বলিতেছেন। মার শুইবার কোন ঠিক নাই। যখন হয়—সকাল বেলাই—শুইয়া আছেন। আবার হয়ত দিন রাত্রি বসিয়াই আছেন; শুইবার ভাবই নাই। বহু বৎসর যাবৎ সাধারণের মত ঘুম হয় না। নিজের মুখেই বলিয়াছেন, "বোধ হয়, ঘুমাই না। কারণ ঘুম হইলে চোখের পাতা যেমন ভারি হইয়া আসে, আমার তা হয় না। বহু পূর্বে হইত, তাই জানি ও তোমাদের বুঝাইতে পারিতেছি।" আর এটাও লক্ষ্য করিতাম, পড়িয়া আছেন; যদি কোন কারণে হঠাৎ জাগাইতাম, দেখিতাম, কথা জড়াইয়া গিয়াছে। কীর্তনাদি হইলে যখন খুব ভাব হইত, তখন যেমন জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইত, কথা বাহির হইত না, অস্পষ্ট ভাবে আওয়াজ বাহির হইত, এও ঠিক তেমনই।

শ্রীশ্রীমা নিয়মিত শয়ন, নিদ্রা প্রভৃতির উপরে।

মাও অনেক সময় কথায় কথায় বলিয়াছেন, "সর্বদা একই অবস্থায় যেন আছি। বাহিরে শরীরের নানা রকম ক্রিয়া হইতে দেখিতেছি, কিন্তু ভিতরে কোনই পরিবর্তন নাই।" ঢাকা থাকিতে অনেকসময় পাক করিতে গিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, খুব চট্ পট্ করিয়া পাক করিয়া আসিলেন। মুখে হয়ত ঘাম দেখিতেছি, মুখ লালও হইয়াছে। মনে হইতেছে, মার বুঝি খুব পরিশ্রম হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিতেন, "কি করিয়া

শ্রীশ্রীমায়ের ভিতরে সর্বদাই একই অবস্থা।

তোমাদের বুঝাইব, এই যে পাক করিয়া আসিলাম, কি, কি করিয়া আসিলাম, কিছুই বুঝিতেছি না। শুইয়া পড়িয়া থাকিলেও যে অবস্থায় থাকি, এও ঠিক ঠিক সেই অবস্থাই; কিছুই পরিবর্তন নাই।”

আমরা ইহা ধারণাও করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনেক সময়ই মা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মা শুইয়া ২।১টি কথা বলিতেছেন। আজ খাওয়া নাই। মা পড়িয়াই আছেন। ২।১টি লোক দর্শন করিয়া যাইতেছে। মা আজ একটু চুপচাপ, বেশী কথা বলিতেছেন না। কাজেই উপস্থিত সকলেও চুপ করিয়াই বসিয়া আছেন। বৈকালে রাজা, রানী ও রাজমাতা আসিয়াছেন। আজ কৃষ্ণা-চতুর্দশী তিথি। রাজা আজ সমস্ত দিন উপবাসী আছেন। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে শিবপূজা করিয়া জলগ্রহণ করিবেন। সন্ধ্যাবেলা রাজা মন্দিরে গিয়া শিবের পূজা করিলেন। আজ আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি [দুই বৎসর পূর্বে আষাঢ় মাস হইতেই মা একদিন পর পর খাওয়া আরম্ভ করিয়াছেন]। আজ রাজার জন্য আমাদের এখানে একটু জল খাবার তৈয়ার করা হইয়াছে। মাকে জলখাবার তৈয়ার করিয়া দেখিবার জন্য ডাকিলাম। মা বলিলেন, “এইখানেই নিয়া আস।” রাজা, রানী, রাজমাতা, ভোলানাথ সকলেই সেখানে বসিয়াছিলেন। যেই আমি খাবারের থালা মার কাছে নিয়া নামাইয়াছি, মা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আমার জন্যত কোনদিন এই রকম তৈয়ার করে না?” এই বলিয়া রাজার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “আজ আমিও খাইব।” ভোলানাথকে শিশুর মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “খাইব?” তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন। রাজার দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, “বাচ্চা আগে খায়, তারপর বাপ মা খায়।” এই বলিয়া ভোলানাথকে বলিলেন, “তুমি আমাকে

সোলনের রাজার প্রতি অসাধারণী কৃপা এবং একদিন অন্তর আহারের সাময়িক নিয়মভঙ্গ।

একটু মুখে দিয়া দাও।” তিনি সামান্য একটু মুখে দিয়া দিলেন। রাজাকেও মা বলিতেছেন, “তুমিও খাওয়াইয়া দিবে নাকি?” রাজা মহা আনন্দের সহিত মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। মা অতি সামান্যই মুখে নিতেছেন। শেষে রানী মাকে একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন। রাজমাতা একটু এলাচি খাওয়াইয়া দিলেন। রাজা হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন, “মা, আজ যখন অনুগ্রহ করিয়া এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তখন আজ হইতে এই নিয়ম আর করিও না। এখন হইতে রোজই আহার করিতে আরম্ভ কর, এই আমার প্রার্থনা।” মা হাসিয়া বলিলেন, “দেখা যাইবে।” রাজা-রানী চলিয়া গেলেন।

সকলে আসিয়া মার কাছে বসিয়াছেন। জ্যোতিষদাদা বলিতেছেন, “তবে অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর হাতেও আজ একটু খান।” স্বামীজীও মহা আনন্দের সহিত মাকে একটু খাওয়াইয়া দিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। শুইবার পূর্বে ভোলানাথকে বলিতেছেন, “হরিরাম কাল দেরাদুন যাইবে। আমরাও কাল এখান হইতে রওনা হই, কি বল?” ভোলানাথ রাজি হইলেন না। কথাবার্তায় ঠিক হইল আগামী সোমবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই এখান হইতে রওনা হওয়া হইবে। রাত্রিতে চোখ বুজিয়াই বলিতেছেন, “এক মূর্তি দেখিতেছি।” কখনও রোগের মূর্তি কি মৃতের মূর্তি দেখিয়া মা এইরূপ বলেন, তাই চিন্তা হইল, মা কি দেখিতেছেন।

কাহারও অসুখের পূর্বাভাস।

১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই, শুক্রবার। আজও মা প্রাতে বেড়াইয়া আসিয়া একটু জল খাইয়া শুইয়া আছেন। আজ সকালে উঠিয়াই ভোলানাথ বলিতেছেন, তাঁর সারারাত পেটের বেদনায় ঘুম হয় নাই। সকালেও ব্যথা আছে। চেহারা খুব কাতর দেখাইতেছে। মা দুপুরে

পরদিন বাবা ভোলানাথের অসুখ।

বলিতেছেন, "কাল রাত্রেই না বলিয়াছিলাম, এক মূর্তি দেখিতেছি? দেখ আজ প্রাতেই ভোলানাথের কাতর চেহারা।"

মা খাওয়া দাওয়া করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই, লোক আসিয়া পড়িতেছে। মা সকলের সহিত কথা বলিতেছেন। বৈকালে রাজা, রানী ও রাজপরিবারস্থ আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন, রাজমাতাও আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত মা কথা বলিতেছেন। নানা কথা হইতেছে, মা নিজ হাতে খান না, কি প্রকারে হাতে খাওয়া বন্ধ হইল, এই সব কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন,

শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে আহার করেন না কেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি।

"আমিত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। একদিন খাইতে বসিয়াছি; দেখি, ভাত মুখে দিতে পারি না। হাত মুখে উঠিতেছে না; নীচে নামিয়া যাইতেছে। নিজের ইচ্ছাশক্তি এর মধ্যে একটুও নাই। যেমন রোগী মাথা ঘুরিয়া হঠাৎ পড়িয়া যায়, নিজের ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে কিছুই থাকে না, এও প্রায় তাই। তবে বিশেষ এই যে, এজন্য কোন দুঃখ হয় না বা, অন্য কোনরূপ ইচ্ছাও জাগে না। যা হইয়া যায়, দেখিয়া যাইতেছি। তখন হইতেই বুঝিলাম, হাতে খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল।"

পরে লঙ্কা খাওয়ার গল্প করিতেছেন। মা বলিতেছেন, "ঢাকাতে যখন কাজকর্ম আর বেশী করিতে পারিতাম না, শরীর সব সময় উঠিত না, এই

লঙ্কার গুঁড়া খাইতে দিয়া ভোলানাথের শ্রীশ্রীমাকে পরীক্ষার প্রচেষ্টা।

অবস্থা, তখন একটি ভদ্রলোক (এখানে আসা যাওয়া করিত) আমার মসলা বাটা ইত্যাদিতে কষ্ট হইবে বলিয়া, নিজে বাড়ী হইতে মসলা সব ধুইয়া, গুঁড়া করিয়া আনিয়া দিত। একদিন সেই ভদ্রলোক মসলা গুঁড়া করিয়া শাহবাগে নিয়া আসিয়াছে। লঙ্কারও গুঁড়া আনিয়াছে।

ভোলানাথ কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন, 'আচ্ছা, তোমার ত কিছুই লাগে না। লঙ্কার গুঁড়া খাইলেও লাগিবে না?' আমি অমনি বলিলাম, বেশত তোমার যখন মনে হইয়াছে, তখন খাওয়াইয়া দেখ না, কি হয়? আমিও দেখি, তোমরাও দেখ। ভোলানাথ বলিলেন, 'চোখে জল আসিতে পারিবে না, বা শিশাইতে পারিবে না।' আমি মুঠার ভিতর যতটা ধরে, উঠাইয়া মুখে দিলাম। আমার মনে হইল, যেন ছাতু খাইতেছি। কাজেই আমি খাইয়া বেশ বসিয়া আছি। কোনই পরিবর্তন হইল না। ঘন্টা খানেক পরে উঠিয়া কাজ কর্ম করিতে চলিয়া গেলাম।"

"তারপর হইল কি, ভোলানাথের যেমন জ্বর, তেমনই পেটজ্বালা। আবার আমিই সেবা করি। বড় ডাক্তারেরা দেখিতেছেন কিছুই হইতেছে না। ১৮।১৯ দিন ধরিয়া দিনরাত্রি এমন ভাবে বসিয়া সেবা হইয়া যাইতেছিল, যে এক মুহূর্তের জন্যও শরীরটা ঝিমাইত না। যেমন খাওয়া বন্ধ, তেমনই ঘুম ও শোওয়া বন্ধ। একদিন রাত্রিতে যখন ভোলানাথের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল, তখন মটরী, আশু ও বাউল ত কাঁদিতে লাগিল। বিকার অবস্থায় ভোলানাথ উঠিয়া বসিয়াছেন, তখন মুখ হইতে বাহির হইল, 'তোমাকে কতবার বলিয়াছি, এ শরীরটাকে পরীক্ষা করিওনা।' তখন ভোলানাথও বলিলেন, 'আর করিব না।'

ফলে, ভোলানাথের উৎকট পীড়া।

তখন একটু ভিজা চিঁড়া জলে গুলিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ভোলানাথের খাওয়া একেবারেই ছিল না, অনবরত বমি হইতেছিল। চিঁড়া খাওয়াইবার পরই শুইয়া পড়িলেন। এই চিঁড়া কিন্তু পূর্বদিনই আনিয়া ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সারাদিন কিছুই করা হয় নাই। এই সময়তেই বাহির করিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। পর দিন হইতেই ভোলানাথের বমি

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ভোলানাথের আরোগ্যলাভ।

বন্ধ হইয়া গেল। খুব জ্বর হইল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।* নানা কথার পর, আজও রাত্রি প্রায় ৮৷৷ টায় রানী প্রভৃতি চলিয়া গেলেন। মা রাত্রি প্রায় ১১ টায় শুইয়া পড়িলেন।

২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, শনিবার। মা আজ প্রায় বেলা ৯৷৷ টায় উঠিয়াছেন। আজ উপবাসের দিন। কিন্তু সংক্রান্তির দিনে ঐ নিয়ম একটু ভাঙ্গিয়াছেন। তাই, আজও কি করেন ভাবিয়া খাওয়ার যোগাড় করিয়া, মাকে খাইতে ডাকিলাম। কিন্তু মা বলিলেন, "এখন খাইব না। যদি খাওয়ার ভাব হয়, তখন খাইব।" কিন্তু সারাদিন কিছুই খাইলেন না; বৈকালে রাজা মাকে নিজের বাড়ীতে নিয়া গেলেন। আমি, জ্যোতিষ দাদা ও ভোলানাথ সঙ্গে গেলাম। তথায় যাইয়া, রানীর হাতে সামান্য ফল খাইলেন। এবং পরে প্রায় ৭ টার সময় মন্দিরে ফিরিয়া আমার হাতে সামান্য একটু ফল ও দুধ খাইলেন।

একদিন অন্তর আহারের নিয়ম আজও আংশিক ভঙ্গ।(১৩৪৩।২রাশ্রাবণ) (১৮ই জুলাই, ১৯৩৬)

আজ সিমলা হইতে হারাণবাবু, চারুবাবু প্রভৃতি সপরিবারে আসিয়াছেন। আরও ২।৩ জন ভদ্রলোকও আসিয়াছেন। এই হারাণবাবুর সহিতই সিমলাতে খাওয়ার নিয়ম ভঙ্গ করিবার কথা হইয়াছিল। হারাণবাবুকে দেখাইয়া, মা বলিতেছেন, "আমি আজ একটু খাইয়াছি। তোমাদের কথা রাখিলাম। আমার কথাও রাখিতে হইবে।" এইরূপে নানা কথায় আনন্দ চলিতেছে। সিমলার ভদ্রলোকদের

উপবাসের দিনে খাওয়ার ভাব বা চিবাইবার শক্তির অভাব।

---

* এই সব কথা বাউলবাবুর কাছে জানিয়া, প্রাণগোপালবাবু লিখিয়া ছিলেন, 'মা, তুমি গুরুমারা বিদ্যা কোথায় শিখিয়াছিলে?' মা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "গুরুর কাছেই গুরুমারা বিদ্যা শিখিয়াছি।"

জন্য রান্না করা হইল। তাঁহারা ও ভোলানাথ খাইতে বসিয়াছেন। ভোলানাথের ও তাঁহাদের কথায়, মাও সামান্য একটু খাইলেন। বলিতেছেন, "মুখে দিলেও চিবাইতে যেন পারি না। আজ খাওয়ার দিন নয়। তাই সব যেন বন্ধ বন্ধ লাগিতেছে।" রাত্রি প্রায় ১০ টায় খাওয়া দাওয়া হইয়া গেল।

মা সকলকে নিয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। আজ শনিবার বলিয়া সিমলা হইতে ভক্তেরা সব আসিয়াছেন। আগামীকল্যই আবার সকলে চলিয়া যাইবেন। মাও সোলন হইতে চলিয়া যাইতেছেন। আবার কবে দেখা হয়, তাই ভক্তেরা মাকে শুইতে যাইতে দিতে পারিতেছে না। নিজেরাও শুইতে যাইতেছেন না। প্রাণ ভরিয়া মাকে দেখিতেছেন ও মার কথা শুনিতেছেন, নানা কথা হইতেছে। কথায় কথায় হারাণবাবু বলিতেছেন, "মা ভগবানের খবরটা একটু দিয়া যাও ত, তিনি কি রকম?" মা উত্তর দিতেছেন, "যে যেই ভাবে তাঁকে চায়, তিনি তার কাছে সেই রকমই।" আরও অনেক কথা হইল। রাত্রি প্রায় ২ টা বাজে, কিন্তু মার কোনই ক্লান্তি নাই; যেন দিনে বসিয়া কথা বলিতেছেন। ২ টায় সকলে শুইতে গেলেন, মাও বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

"শ্রীভগবান্ কি রকম" হারান বাবুর এই প্রশ্নে শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর।

৩রা শ্রাবণ, ১৯শে জুলাই, রবিবার। আজও প্রতি দিনের মত প্রাতে মা, জ্যোতিষদাদা, হারাণবাবু প্রভৃতির সহিত একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলেন। বেড়াইয়া আসিলে, হাত মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ ফল খাওয়াইয়া দিলাম। ভক্তেরা ও সকলে প্রসাদ পাইলেন। সকলকে নিয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। এদিকে রান্না তৈয়ার হইতেছে। দুপুরে মা খাইতে বসিবেন, এমন সময় হারাণবাবু ও তাঁর স্ত্রী এবং চারুবাবুর স্ত্রী কোথা হইতে দুইটা কুমড়ার ডাঁটা নিয়া আসিয়াছেন। মা খাইতে বসিয়া

গেলেন। চারুবাবুর স্ত্রী মাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন। তখনই কুমড়ার ডাঁটা দিয়া মাকে একটু ঝোল করিয়া দেওয়া হইল। মাকে না খাওয়াইলে, যাঁহারা নিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা দুঃখিত হন। ভোলানাথ ও মার ভোগ হইয়া যাওয়ার পর, সকলে মিলিয়া প্রসাদ পাইলেন। খাওয়ার পর সকলে মার কাছে গিয়া বসিয়াছেন, আজই বৈকালে সকলের সিমলা ফিরিতে হইবে। নানা কথা হইতেছে, ভক্তেরা আবার শীঘ্র দর্শন পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতেছেন। যাওয়ার সময় হইয়া আসিল। সকলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বিদায় নিতেছেন; তবুও যেন তৃপ্তি হইতেছে না। মা ও ভোলানাথ সকলকে হাসিমুখে বিদায় দিতেছেন। মা বলিতেছেন, "আমার এই কথা মনে রাখিতে চেষ্টা করিও, যত বেশী সময় পার, তাঁর নামে দিও, সকলে মনে রাখিও, দিন কিন্তু চলিয়া গেল; যে দিন যায়, সে দিন আর আসে না।" সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "মা শক্তি দিও, নাম যেন করিতে পারি।" সকলে বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা রানী আসিয়াছেন; মা তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেছেন। রাত্রি প্রায় ৯ টায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মা উপস্থিত সকলের সহিত কথা বলিয়া রাত্রি প্রায় ১১টায় শুইয়া পড়িলেন।

সিমলার ভক্তগণের বিদায় গ্রহণকালে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ "যত বেশী সময় পার, তাঁর নামে দিও, যে দিন যায় সে দিন আর আসে না।"

একচত্বারিংশৎ অধ্যায়

৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, সোমবার। আজ মা আমাদের নিয়া ‘বিন্ধ্যাচল রওনা হইবেন, স্থির হইয়াছে। জ্যোতিষদাদাকে মা রাজার কাছে রাখিয়া আসিলেন। এই গরমের মধ্যে, ঠাণ্ডা দেশ ছাড়িয়া, কেন নীচে চলিলেন, কে জানে? রাত্রি ৯ টায় রওনা হওয়ার কথা। বৃষ্টি হইতেছে। মা ও ভোলানাথ রাজার মোটরে করিয়াই জ্যোতিষদাদা যেখানে থাকিবেন, তাঁকে সঙ্গে করিয়া নিয়া, সেখানে রাখিয়া আসিলেন। পরে, আমরা কালকা রওনা হইলাম। সঙ্গে ভোলানাথ, ডাক্তার উপেনবাবু, অখণ্ডানন্দ স্বামীজী, কমলাকান্ত ও আমি আছি। মদনমোহন যোশী ডাক্তার ও তাঁর ভাই জানকী যোশী, মাকে উঠাইয়া দিতে কালকা পর্যন্ত আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১১ টায় আমরা কালকা পৌঁছিলাম। ১২ টায় আমাদের ট্রেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই মার কাছে বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা ১২ টার গাড়ীতে কালকা হইতে রওনা হইলাম।

সোলন হইতে ‘বিন্ধ্যাচল যাত্রা। (১৩৪৩, ৪ঠা শ্রাবণ সোমবার) (২০শে জুলাই, ১৯৩৬)

৫ই শ্রাবণ, ২১শে জুলাই, মঙ্গলবার। আজ ভোরে আমরা দিল্লী পৌঁছিয়াছি। যে কাশ্মিরী বৃদ্ধাটি মার সঙ্গে কিছু দিন ছিলেন, তিনি ছেলের বাসায় দিল্লীতেই বর্তমানে আছেন। আমরা সকলে তাঁকে “নানী” বলিয়াই ডাকি। মা তাঁহার নাম দিয়াছেন “রাধারাণী”। বৃদ্ধা পূর্বেই খবর পাইয়া, মার ও ভক্তদের জন্য নানা রকম খাবার নিয়া আসিয়াছেন। মাকে পাইয়া কাঁদিয়াই আকুল। সোলনে মা চলিয়া যাওয়ার পর, এই বৃদ্ধার সহিত আর দেখা

পথে দিল্লী স্টেশনে “নানীর” শ্রীশ্রীমাকে সম্বর্দ্ধনা, এবং বাষ্পাকুলিত লোচনে বিদায় গ্রহণ।

হয় নাই। মা চলিয়া যাওয়ার পর, ইনিও দেরাদুন হইতে দিল্লী চলিয়া আসিয়াছেন। মার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন, মাকে একটু খাওয়াইয়াও দিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে ও নাতিনী আসিয়াছেন। গতবার দিল্লীতে এই নাতিনীর সহিত সমবয়সী বলিয়া (কি অন্য কোন কারণ আছে, জানি না) আমার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে "নানী" বিদায় নিলেন।

রাত্রি প্রায় ৮টায় মিরজাপুর নামিয়া, আমরা প্রায় ৯টায় ঁবিন্ধ্যাচলে মার আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। উপেনবাবু (ডাক্তার) মিরজাপুর হইতেই নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। নিজ বাড়ীর একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া বাহির হইবার ইচ্ছা। মা বলিলেন, "তাই উচিত। নতুবা পুনঃ পুনঃ মন চঞ্চল হয়; ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে কোন কাজই ভাল মত হইতেছে না।" আশ্রমে যজ্ঞাগ্নি রক্ষার জন্য দুইটি ব্রহ্মচারী ছিলেন। পূর্বেই তাঁহাদিগকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। উপবাসের দিন এখনও মা কিছুই খাইতে পারেন না। রাত্রেই পাক করিয়া খাওয়া দাওয়া করিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। ভয়ানক গরম। সকলেই গরমে অস্থির। মা বলিতেছেন, "সব অবস্থাই সহ্য করিতে হয়। খালি আরাম পাওয়া ঠিক নয়।" আমি মাকে বলিলাম, "যে গরম! কালই তোমাকে স্নান করাইয়া দিব।" মা স্নান প্রায় করেনই না। মধ্যে মধ্যে খেয়াল হইলে করেন। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "কাল স্নান করিব না। কিছুদিন গরম খাইয়া নেই; তবে ত স্নান।" আবার বলিতেছেন, "যখন যে রকম থাকা হয়, তাহাতেই আনন্দ পাওয়া দরকার।" রাত্রি প্রায় ১ টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন। মাও শুইয়া পড়িলেন।

ঁবিন্ধ্যাচল আশ্রমে আগমন। (১৩৪৩, ৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার) (২১শে জুলাই, ১৯৩৬)

মা বলেন, সর্ব অবস্থাতেই আনন্দ পাওয়া দরকার।

৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই, বুধবার। মা আজ ভোরে উঠিলেন না; শুইয়াই আছেন। প্রায় ৮টায় উঠিয়া ছাদের কোঠা হইতে নীচে নামিলেন। নীচে গিয়াই ভোলানাথকে বলিলেন, "পঞ্জিকা, পেনসিল ও কাগজটা নিয়া উপরে চল। একটু কাজ আছে।" অনেকক্ষণ দুইজনে কথা হইল।

ঁবিন্ধ্যাচল হইতে শীঘ্র কলিকাতায় রওনা হইবার ইচ্ছা।

শুনিলাম, মা ২।৪ দিনের মধ্যেই ঁবিন্ধ্যাচল হইতে কলিকাতা রওনা হইতেছেন। কিজন্য এইরূপ অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, মা-ই জানেন। আজ মার খাওয়ার দিন ছিল না। এখনও উপবাসের দিন কিছুই খাইতে পারিতেছেন না। শুধু নিয়ম রক্ষার মত সন্ধ্যাবেলায় সামান্য একটু ফল কি দুধ খান। আজ দুপুরে ভোলানাথ খাইতে বসিয়াছেন। হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়া বসিলেন, বলিলেন, "একটু কিছু মুখে দিয়া দাও।" ভোলানাথও সামান্য একটু মুখে দিতেই "আর না।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া, মুখ ধুইয়া উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। দেখিলাম, ভোলানাথের মনটা ভাল নয়। এখানে আর বিশেষ কেহ নাই। সন্ধ্যার পরেই মাও শুইয়া পড়িলেন। যিনি অগ্নি রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত আছেন, তাঁর সঙ্গে মার কি কথা হইল। স্থির হইল, আগামী কল্য তিনি একবার তাঁর গুরুদেবের সহিত ঁকাশী গিয়া দেখা করিবেন।

৭ই শ্রাবণ, ২৩শে জুলাই, বৃহস্পতিবার। মা আজ প্রাতে একটু বেড়াইয়া আসিয়াছেন। হাত মুখ ধুইয়া একটু জল খাইলেন। খুবই চঞ্চল

ঁবিন্ধ্যাচলে শ্রীশ্রীমার দৃশ্যতঃ চঞ্চল ভাব।

ভাব, কি করিবেন, জানি না। ভোলানাথেরও মনটা খারাপ। পেটের বেদনাটাও একটু একটু টের পাইতেছেন। মা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া নীচের ঘরেই শুইলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিলেন। উপস্থিত সকলের সহিত কথাবার্তা বলিলেন।

বৈকালে মিরজাপুর হইতে অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহাদের

সহিত মা কথা বলিতেছেন। মিরজাপুরের মহেন্দ্রবাবুর নাতিনী আসিয়াছে। মেয়েটির বয়স প্রায় ২০ বৎসর। মেট্রিক পাশ। মেয়েটিকে দেখিয়াই, মা নাকি কি বলিয়াছেন। সে কিন্তু মাকে আর দেখে নাই। কিছুক্ষণ পর, সে মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিতেছে। অনেকক্ষণ পর, আমি সেখানে যাইতেই মা বলিতেছেন, "খুকুনি এই মেয়েটিকে তোমার সঙ্গী করিয়া নেও।" মেয়েটিও আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা আপনার ঠিকানা আমাকে নিতে বলিয়াছেন, ও আমার ঠিকানা আপনাকে দিতে বলিয়াছেন।" মেয়েটির দিদিমা (মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী) সঙ্গে আসিয়াছেন। মা বলিতেছেন, "বেশ ত, মেয়েটিকে নিজের ভাবে থাকতে দাও না?" তিনিও বলিলেন, "এতদিন ত বিয়ের চেষ্টা হইয়াছে। এখন কুড়ি বছর বয়স হল। বেশ ত থাকতে পারে ভালই।" মেয়েটি তার দিদিমাকে বলিতেছে, "আমি ত মাকে আগে কিছু বলি নাই। মা-ই ত আমাকে দেখে, ওকথা বললেন।" মা মেয়েটিকে বলিতেছেন, "দেখ, যাহাই কর, একটা ঠিক করিয়া ধরিতে হয়। যদি বিবাহ কর, বেশ, তাই কর। আর যদি তা না কর, এই পথেই আসিতে চাও, সেজন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। আর তুমি এখন বড় হইয়াছ। ইচ্ছা না থাকলে, কেউ কি কোন কাজ করাইতে পারে? নিজের মনের দৃঢ় সঙ্কল্প চাই।" এই সব কথার পর রাত্রি প্রায় ১০টায় তাঁহারা চলিয়া গেলেন। মাও একটু জল খাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

মিরজাপুরের মহেন্দ্র বাবুর নাতিনীর কথা।

৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, শুক্রবার। আজও প্রাতে বেড়াইয়া আসিয়া, মা সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন। আজও কথা এই যে, মা আমাদের নিয়া আগামী সোমবার কলিকাতা রওনা হইবেন। রাজসাহী যাওয়ার কথা মা

বিন্ধ্যাচল হইতে কলিকাতা হইয়া রাজসাহী গমন করতঃ পুনশ্চ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ।

নিজেই উঠাইলেন। ভোলানাথকে বলিতেছেন, "সকালে কলিকাতা পৌঁছিয়াই যদি গাড়ী থাকে, তখনই রাজসাহী চলিয়া গেলাম। ২।১ দিন তথায় থাকিয়া, কলিকাতায় আসিয়া, যে কয়দিন হয়, থাকিলাম। গতবার অটল রাজসাহী না যাওয়ায়, খুব দুঃখ করিয়াছে। কি বল? রাজসাহী যাইবে নাকি?" ভোলানাথের মনটা ভাল নয়। তিনি উদাস ভাবে জবাব দিতেছেন, তিনি কিছুই জানেন না।

আজ দুপুরে মা উপরেই আসিয়া শুইলেন। ১২টার পর আমার মৌন ভঙ্গের আদেশ। বৈকাল ৪টা পর্যন্ত আমি কথা বলিতে পারিব। মার কাছে উপরে আসিতেই, মা বলিলেন, "তুমি কি পড়িয়া শুনাইবে, বলিয়াছিলে? এখনই নিয়া আস"। মার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা আনিয়া মাকে পড়িয়া শুনাইলাম। মা চুপ করিয়া শুনিলেন। আরও অনেক কথাবার্তা হইল। তখনও জানিনা মা আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভোলানাথের পেটে ব্যথা ব্যথা আছেই। মা বলিতেছেন, "তবে দেরী করার কি দরকার? আমরা কলিকাতা চলিয়া গেলেই পারি। সেখানে গিয়া চিকিৎসা হইবে।" ভোলানাথ বলিতেছেন, "থাক, অনঙ্গ (যিনি যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করেন) কাশী গিয়াছে। ফিরিয়া আসুক। সব ঠিক করিয়া যাওয়া যাইবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমার লেখা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রবণ।

বৈকালে মিরজাপুর হইতে অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন তাহাদের সহিত মা উপরে বসিয়াই কথাবার্তা বলিতেছেন। এর মধ্যে কাশী হইতে স্বামী শঙ্করানন্দ আসিয়া উপস্থিত। অনঙ্গ ব্রহ্মচারীও আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমুদবাবুও আসিয়াছেন। ইনিই কাশীতে মহেশবাবুর সমস্ত বিষয়ের ভার নিয়া আছেন। ধর্মশালা প্রভৃতি সবই ইনি দেখেন। ইনি সাধু ভাবেই জীবন যাপন করেন। সকলে ইহাকে "সাধু বাবা" বলিয়াই

কাশীর কুমুদ-বাবুর কথা।

সম্বোধন করে।

গতবার যে মা শ্রীযুত মহেশবাবুকে তাঁর ঁবিন্ধ্যাচলের বাড়ীতে পঞ্চবটী তৈয়ার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তখন ইহাও বলিয়াছিলেন, "কুমুদ বাবাকে বলিলে, সেই সব করিয়া দিবে।" এখন মা আসিয়াছেন খবর পাইয়া, কুমুদবাবু পঞ্চবটীর সব গাছ নিয়া ও লোকজন নিয়া, ঁকাশী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আসিয়াই মাকে, যেখানে পঞ্চবটী করা হইবে, সেখানে নিয়া গেলেন। কুমুদবাবু বলিতেছেন, "কি আশ্চর্য যোগাযোগ! আমিও গাছ নিয়া আসিব সব ঠিক করিয়াছি, এর মধ্যে মাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁর আদেশে পঞ্চবটী হইতেছে, তিনিই যখন উপস্থিত, তখন সবই মঙ্গল।" এই বলিয়া, তিনি তখনই মা ও ভোলানাথকে সমস্ত গাছ স্পর্শ করাইয়া স্থাপন করিলেন। তারপর মা একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কুমুদবাবু প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। একটু ফল ও দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। ঁকাশী হইতে শঙ্করানন্দ স্বামী একটু মিষ্টি আনিয়াছেন। মাকে বলিতেছেন, "মা, গরীবের এই সামান্য জিনিষ একটু খাও।" মা সামান্য একটু মুখে নিয়া বলিতেছেন, "কাল খাব।" সন্ধ্যার পর উপস্থিত সকলে মিলিয়া মার কাছে একটু কীর্তন করিলেন। মিরজাপুর হইতে যে ভক্তেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও, মা ও ভোলানাথকে একটু মিষ্টি খাওয়াইয়া বিদায় নিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শুইয়া পড়িলেন। অনঙ্গ ব্রহ্মচারী আসিয়া কিছুক্ষণ মার সহিত একান্তে কথা বলিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মত শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঁবিন্ধ্যাচলের বাড়ীতে কুমুদবাবু কর্তৃক পঞ্চবটী স্থাপন।

মা ভক্তানুগ্রাহিকা।

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, শনিবার। আজও প্রাতে মা একটু বেড়াইয়া

আসিলেন। মুখ ধোয়াইয়া একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। কুমুদবাবু আসিয়া মার কাছে বসিয়াছেন। নানা কথার মধ্যে যজ্ঞের কথা উঠিয়াছে। স্থির হইয়াছে, অনঙ্গ ব্রহ্মচারী একাই যজ্ঞাগ্নি নিয়া থাকিবেন। মা কুমুদবাবুকেও বলিতেছেন, "তোমরা সকলেই দেখিবে। এই যজ্ঞ ত সকলেরই জন্য হইয়াছে।" তিনিও স্বীকার করিলেন, যাহাতে সুবিধা হয়, তিনি দেখিবেন। অনঙ্গ ব্রহ্মচারীটিও কুমুদবাবুকে গুরুর মত সম্মান করেন। ক্ষেত্রবাবু বাড়ী যাইবেন, তাঁর বাড়ীর জন্য মন একটু ব্যস্ত হইয়াছে। উপেনবাবুকে মা বাড়ীর সব গোলমাল মিটাইয়া বাহির হইতে বলিলেন, যাহাতে চঞ্চল হইয়া পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে না হয়।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমের যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা।

উপেন বাবুকে (ডাক্তার) উপদেশ।

এই সব কথার পর কুমুদবাবু উঠিয়া গেলেন। মাও উপরে গিয়া বসিলেন। ভোলানাথের সহিত কি কথা হইল। অনেকক্ষণ পর অখণ্ডানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া, মা উপরে নিয়া কি কি সব বলিলেন। পরে শুনিলাম, মা আজই কলিকাতা রওনা হইবেন। কমলাকান্ত সঙ্গে যাইবে। দেরাদুনের আশ্রম খালি পড়িয়া আছে। অখণ্ডানন্দ স্বামীকে তথায় যাইতে আদেশ দিয়াছেন। রায়পুর হইতে বিশু ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁর কাছে দেরাদুন আশ্রমে থাকিবে। আমি চাকর ও বিরাজমোহিনী দিদিকে নিয়া, এই আশ্রমেই থাকিব। অনঙ্গ ব্রহ্মচারী ত আছেনই। এই আদেশ শুনিয়াত আমার চক্ষুঃস্থির। কেননা, মাকে ছাড়িতে হইবে। এই জীবনে বাবাকে ছাড়িয়াও কখনও এ ভাবে একা থাকি নাই। বাবাকেও এই বৃদ্ধ বয়সে প্রায় একা একা গিয়া ঐ দূর দেশে থাকিতে হইবে। সবই যেন ছত্রভঙ্গ, কিন্তু জানি, মা যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা নড়িবার নয়। মার আদেশ

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর ও আমার সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

যত কঠোরই হউক, মাথা পাতিয়া নিতেই হইবে। সব কথার উপর, আজই যে মাকে ছাড়িতে হইতেছে, এই ব্যথাই প্রবল হইয়া উঠিল। তখনও ১২টা বাজে নাই, কাজেই আমি মৌন। দুপুরের ভোগ হইয়া গেল। মা খাওয়া দাওয়া করিয়া যজ্ঞ মন্দিরের বারান্দায় গিয়া শুইলেন। ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। আমিও গিয়া বসিলাম। কি বলিব? এবার প্রায় ৮ মাস যাবৎ মার কাছে আছি। একদিন পূর্বেও কিছু জানিনা। অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাত।

মা-ই সান্ত্বনা দিবার ভাবে বলিতেছেন, "যখন পৈতা দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্মচারী করা হইয়াছে, সেই ভাবেই আছ, আর সারাজীবন এই ভাবেই কাটাইলে, এখন সব বন্ধন ফেলিয়া, পুরুষের মত চলিতে আরম্ভ কর।"

আমার প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের সান্ত্বনা ও সাবধানতার কৃপাবাণী।

আরও কত কি বলিলেন। আবার বলিলেন, "বাবার অসুবিধা হইলে দেরাদুনে চলিয়া যাইও। চাকর ত সঙ্গেই আছে। আর আশ্বিন মাসে ঢাকায় ওরা অন্নকূটের সময়, ১০৮ পদের ভোগ দেয়। সেই সময়, তুমি ঢাকায় যাইও। পনর দিন, কি মাস খানেক, ওদের সঙ্গে থাকিয়া আসিও। চাকর সঙ্গে নিয়াই যাইবা। ভয় কি? কত লোক যায়। সাহস করা দরকার। পূজার বন্ধের ভিড় হইবার পূর্বেই যাইও", ইত্যাদি অনেক বলিলেন।

সবই শুনিলাম। যাহা ধারণারও অতীত ছিল, তাহা করাইবেন। কিন্তু এসব কথা মাথায় এখন আসিতেছে না। মা চলিয়া যাইতেছেন, এই কথায়ই মন অস্থির হইয়া আছে। ক্রমে যাওয়ার সময় আসিল। সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে সকলকে কাঁদাইয়া, মা কলিকাতা রওনা হইলেন। স্বামী শঙ্করানন্দ, কুমুদবাবুও এই সঙ্গেই কাশী চলিয়া গেলেন। আমি ও স্বামী অখণ্ডানন্দ মার সঙ্গে স্টেশনে গেলাম। মা স্টেশনে কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন, "তোমার চুল কাটিলে, শিখা রাখিও।" স্বামী শঙ্করানন্দকে

বলিতেছেন, "ব্রহ্মচারীরা ভস্ম মাখে ত? তুমি খুকুনীকে রোজ ভস্ম মাখিবার নিয়ম লিখিয়া দিও। ও ভস্ম মাখে না। যখন হইল, সব নিয়ম মত করাই দরকার।" ঁকাশী হইতে আর কেহ আসিতে পারিল না। সকলেই জানে মা কিছুদিন ঁবিন্ধ্যাচল থাকিবেন। বাবা ও আমি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন ভাবে পড়িয়া রহিলাম। যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বিরাজমোহিনী দিদিরও মার সঙ্গে যাওয়ার স্থির হইল। তিনিও মার সঙ্গেই চলিয়া গেলেন। আমাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিন ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত কথা বলার আদেশ দিয়া গেলেন।

ঁবিন্ধ্যাচল হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা যাত্রা। যাত্রার প্রাক্কালে আমার প্রতি ২।১টি বিশেষ নির্দেশ।

১০ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই, রবিবার। আজ ভোরে উঠিয়া দেখি, সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। আজই ভোরে মার কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা। টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঁবিন্ধ্যাচল স্টেশন হইতে গাড়ীতে উঠিবার পূর্বে মাকে আবার প্রণাম করিলাম। মা গায় হাত দিয়া বলিলেন, "সাবধান মত থাকিও।"

দ্বাচত্বারিংশৎ অধ্যায়

১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই, বুধবার। আজ কলিকাতা হইতে যতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের চিঠিতে জানিলাম, মা রবিবার প্রাতে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ভক্তেরা সকলেই স্টেশনে মাকে নিতে আসিয়াছিলেন। মার জন্য বালিগঞ্জেই একটা শিব মন্দিরে থাকিবার স্থান করা হইয়াছিল। মা স্টেশন হইতে সেখানে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ঢাকুরিয়াতে ভোলানাথের ভগ্নীপতি কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের বাড়ী যান। তাঁরা পুত্র শোকে কাতর। মা সারাদিন সেখানেই থাকিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে রাজসাহী রওনা হইয়া গিয়াছেন। ২।১ দিনের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিবার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছানর সংবাদ প্রাপ্তি।

১৪ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার। আজ কলিকাতা হইতে ভ্রমরের ও ভোলানাথের পত্রে জানিলাম, গতকল্য বুধবারেই মা কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। মার সহিত রাজসাহীতে বিরাজমোহিনীদিদি যান নাই। ভ্রমর গিয়াছিল, কলিকাতায় মার আর কত দিন থাকা হয়, কিছুই ঠিক নাই। মা পূর্ব্বোক্ত শিব মন্দিরে আছেন।

রাজসাহী ঘুরিয়া কলিকাতায় পুনরাগমনের সংবাদ প্রাপ্তি।

১৬ই শ্রাবণ, ১লা আগস্ট, শনিবার। আজ কলিকাতা হইতে শ্রীযুত ভোলানাথের চিঠিতে জানিলাম, তাঁহারা এখনও কলিকাতাতেই আছেন। ভোলানাথ ডাক্তার দেখাইতেছেন। ঢাকার ভক্তেরা ঢাকা যাওয়ার জন্য খুব অনুরোধ করিয়া পত্র দিতেছেন। কিন্তু মা ঢাকা যাইবার কথা কিছুই বলিতেছেন না।

১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগস্ট, সোমবার। দেরাদুন হইতে হরিরামের

চিঠিতে বিশু ব্রহ্মচারী বাবার কাছে আসিয়া থাকিতে রাজি আছে খবর পাইয়াই, বাবা মার আদেশ মত দেরাদুন রওনা হইয়া গেলেন। গতকল্য তূরীয়নন্দ স্বামী দেরাদুন হইতে মার আদেশে ঁবিন্ধ্যাচল আসিয়াছেন। বাবা ঁকাশী হইয়া যাইবেন। আমিও বাবার সঙ্গে ঁকাশী রওনা হইলাম। ২।১ দিন তথায় থাকিয়া তিনি দেরাদুন রওনা হইলে, আমিও চলিয়া আসিব, এই সঙ্কল্প। সন্ধ্যার পূর্বেই ঁকাশী পৌঁছিয়া এক ধর্মশালায় আছি।

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর ঁকাশী হইয়া দেরাদুন যাত্রা।

২০শে শ্রাবণ, ৫ই আগস্ট, বুধবার। আজও মার আর কোন খবর নাই। শুনিলাম, শ্রীযুত রেবতী সেন মহাশয় আজ তিন দিন যাবৎ কলিকাতা হইতে ঁকাশীতে আসিয়াছেন। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের একটি নূতন মঠ ঁকাশীতে স্থাপন করা হইল, সেই উপলক্ষে আসিয়াছেন। তাঁর কাছে মার খবর পাইবেন ভাবিয়া, বাবা তখনই তাঁর কাছে গেলেন। কিন্তু দেখা হইল না। তিনি বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। পরদিন দুপুর বেলা রেবতীবাবুর সহিত দেখা হইল। মার খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, মার সহিত তাঁর তিন দিন দেখা হইয়াছে। মার কাছে খুব ভিড়। মা বিড়লা পার্কের ঁশিব মন্দিরে আছেন। দিনে মধ্যে মধ্যে কোথায়ও যান। সুরেশবাবু যে নিজের বাড়ীর দোতালায় মার জন্য ২।৩টি ছোট ছোট কোঠা রাখিয়াছেন, যাহা অপর কোন কাজেই ব্যবহার করেন না, সেই কোঠায় নিয়া সুরেশবাবু মাকে একদিন ভোগ দিয়াছেন। শ্রীযুত প্রাণকুমার বাবুর নূতন বাড়ীতেও মাকে একদিন নিয়াছিলেন। মা বেশী সময় ঁশিব মন্দিরেই থাকেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তদের বাড়ী অল্প সময়ের জন্য যান। এই সব খবর পাইয়া, আমরা বেলা প্রায় ৪টায় ধর্মশালায় ফিরিয়াছি।

রেবতীবাবু প্রমুখাৎ শ্রীশ্রীমায়ের সংবাদ প্রাপ্তি—মা বালিগঞ্জের বিড়লা পার্কের ঁশিব মন্দিরে।

একটু পরেই নেপালদাদা এক চিঠি নিয়া উপস্থিত। চিঠিখানি কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ মহাশয় স্বামী শঙ্করানন্দকে লিখিতেছেন।

একটু পরেই সংবাদ প্রাপ্তি ঃ— শ্রীরামপুর হইতে শ্রীমায়ের অজ্ঞাত বাস। (১৩৪৩। ১৮ই শ্রাবণ, সোমবার) (৩রা আগস্ট, ১৯৩৬)

লিখিয়াছেন, "মা ১৮ই শ্রাবণ (সোমবার) প্রাতে শ্রীরামপুরে ভোলানাথ প্রভৃতি সকলকে নিয়াই যান। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই ভোলানাথের সঙ্গে সকলকে কলিকাতা ফিরাইয়া দিয়াছেন। মা, বিরাজমোহিনী দিদি ও রাজসাহীর প্রফেসর অটল বাবুর ভাগিনেয় কমলকে নিয়া, শ্রীরামপুর হইতে রাত্রির গাড়ীতে কোথায় চলিয়া যান, কেহই জানে না। ভোলানাথকে ঢাকুরিয়া পিসিমার বাসায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে বলিয়া গিয়াছেন।" খবর শুনিয়া, আমরা মহা ব্যস্ত হইলাম। কেননা, এই দুর্বল শরীর নিয়া মা এই ভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন। কোথায় যাইবেন, কে জানে? সঙ্গে দুইজনই প্রায় নূতন লোক। কমল যদিও অনেক দিন হইতেই মাকে দেখিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে কখনও থাকে নাই। বিরাজমোহিনী দিদিও মার সঙ্গে বেশী থাকেন নাই। মাত্র ২।৩ বৎসর মার সহিত তাঁর পরিচয়। কয়েক মাস সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত হইয়াই বা কি করিব? বিচার করিয়াই বা কি করিব? মনটা বড়ই চঞ্চল হওয়ায়, সকলেরই মনে হইতে লাগিল, কি জানি ঘুরিতে ঘুরিতে মা যদি খেয়াল বশে ঁবিন্ধ্যাচলই আসেন। মা বাহির হইয়া পড়িলেন, আমরাও যে যার স্থানে গিয়াই বসিয়া থাকি, এই ভাবিয়া আগামী কল্য ভোর ৫টার গাড়ীতেই আমি ঁবিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইব ও ১০টার গাড়ীতে অখণ্ডানন্দজী দেরাদুন রওনা হইয়া যাইবেন, স্থির হইল। মনটা বড়ই অস্থির। বাবাও খুব ব্যস্ত হইলেন। কি করিয়া কোথায় মার খবর পাইবেন, ভাবিতেছেন। অনেক রাত্রিতে আমি ও বাবা একটু বিশ্রাম করিয়া, রাত্রি প্রায় ২॥ টার সময়ই উঠিয়া, স্টেশনে আসিবার জন্য প্রস্তুত

হইলাম। ৩টার পর আমরা স্টেশনে পৌঁছিয়া বসিয়া আছি।

২১শে শ্রাবণ, ৬ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার। ৫টার গাড়ীতে বাবা আমাকে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেলেন। এক চাকর সম্বল করিয়া আমি চলিলাম। আর কেহ কোথায়ও নাই। জীবনে এইরূপ এই প্রথম। মাই জানেন, আরও কত অবস্থার ভিতর দিয়া নিয়া যাইবেন। আমাদের সে চিন্তার অধিকার নাই। আমরা মার কৃপায় যেন শুধু আদেশ পালন করিয়াই যাইতে পারি। বাবাও এই ৭২ বৎসর বয়সে একা একা চলিলেন। ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। বিধির বিধানের মতই মার আদেশ অলঙঘনীয়। প্রায় ৮টায় আসিয়া বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি, মার কোন খবর এখানে আসে নাই। আশ্রম শূন্য লাগিতেছে। প্রাণ শূন্য, তাই সবই শূন্য। কিন্তু ব্যথা নিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মার আদেশ, "সকলে নিয়ম মত সাধন ভজন করিয়া যাও। বসিয়া থাকিও না। প্রতি নিশ্বাসেই আয়ু কমিয়া আসিতেছে"। মার বাক্য শিরোধার্য করিয়া নিয়মিত কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম।

কাশীধাম হইতে আমার বিন্ধ্যাচল আগমন।

বৈকালে কলিকাতা হইতে ভোলানাথের ও ভ্রমরের পত্র পাইলাম। একই খবর। নূতনের মধ্যে এই, যে ভ্রমর লিখিয়াছে, মা কলিকাতা হইতেই "এক বস্ত্রেই যাবো" বলিয়া, সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র বা একখানা কম্বল পর্যন্ত নেন নাই। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। শ্রীযুত ভোলানাথ লিখিয়াছেন, "মা বলিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন তাঁর জন্য চিন্তা না করে এবং তাঁর অনুসন্ধান না করে। তিনি সময় মত আসিয়া সকলের সহিত মিলিবেন।" ভোলানাথ এখন কলিকাতা থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন। মা এক বস্ত্রে গিয়াছেন শুনিয়া আরও, মর্মাহত হইলাম। মা যা কিছু করেন, আমাদেরই

শ্রীশ্রীমায়ের অজ্ঞাত বাসের সংবাদে মন অত্যধিক অবসন্ন।

মঙ্গলের জন্য সন্দেহ নাই। মা কতবার এইরূপ ভিখারিণীর বেশে বাহির হইতেছেন। তবুও আমাদের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না। এই বর্ষায় কোথায় গেলেন, কবে ফিরিবেন, এই সব ভাবিয়া মন বড়ই ব্যাকুল হইল। ছাদের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর মার কত কথাই মনে হইতে লাগিল। বাবাও কাছে নাই। যে মার কথা একটু বলিয়া শান্তি পাইব, সে উপায়ও নাই। বিশেষতঃ আমি মৌন। কথা বলিবারও উপায় নাই। নীরবেই এই ব্যথা সহ্য করিতে লাগিলাম। মাকে আমরা পাইয়াও কিছুই বুঝিতেছি না। অমূল্য রত্ন যেন হেলায় হারাইতেছি। আজ তাই মনে হইতেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীরামপুর হইতে অজ্ঞাত বাসের পূর্বদিনের সংবাদ।

২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগস্ট, শুক্রবার। কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ মহাশয়ের পত্রে জানিলাম, মা গত ১৭ই শ্রাবণ (রবিবার) ২রা, আগস্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন, তাঁহাদের বাসায় সন্ধ্যার পরেই গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ ছিলেন। সেখানে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় ও নিবারণ সমাজপতি মহাশয় মাকে কীর্তন শুনাইয়াছেন। মেয়েরা মাকে ফুলের সাজে কৃষ্ণ সাজাইয়া দিয়াছিলেন। মাও ভাবে বিভোর ছিলেন। সন্ধ্যা হইতেই সে দিন মাকে খুব আনন্দপূর্ণ দেখা গিয়াছিল। ভোলানাথকে দেখিবার জন্য ডাক্তার ডেনহাম হোয়াইট যতীশ গুহ মহাশয়দের বাড়ী আসিয়াছিলেন। মা তাহাকে সন্দেশ খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তিনি মাকে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সংবাদ প্রাপ্তি, যে —শ্রীশ্রীমা খড়্গপুরের অভিমুখে।

২৬শে শ্রাবণ, ১১ই আগস্ট, মঙ্গলবার। আজ সোলন হইতে জ্যোতিষদাদা, শ্রীরামপুরের ত্রিগুণা বাবুর এক পত্র, মার খবর জানাইবার জন্য, আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাহা পাইলাম। চিঠির খবর, "মা গত ১৮ই শ্রাবণ (১৯৩৬ সন) সোমবার বেলা প্রায় ৯টায় ত্রিগুণাবাবুর সহিতই শ্রীরামপুর

যান। সূর্যাস্তের পূর্বেই কলিকাতার সকলকে ভোলানাথের সহিত কলিকাতায় ফিরাইয়া দিয়া রাত্রি ৮।৩০ মিনিটের গাড়ীতে বিরাজদিদি ও কমলকে নিয়া খড়গপুরের দিকে গিয়াছেন। প্রথম ৺পুরী যাইবেন বলিয়াছিলেন; শেষে বলিলেন, খড়গপুর যাইবেন। তথায় যাইয়া যাহা হয় ঠিক করিবেন।" সঙ্গে জিনিষপত্র কিছুই নেন নাই। এর বেশী খবর আর কেহ পায় নাই।

২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, বুধবার। আজ সন্ধ্যার সময়, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত যতীশ গুহ মহাশয়ের পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন, "৺পুরী-

শ্রীশ্রীমা ৺পুরীধামের জটীয়া বাবার আশ্রমে।

ধামের জটীয়া বাবার আশ্রম হইতে শ্রীযুত মাখনবাবু কলিকাতা পত্র দিয়াছেন, যে মা ৺পুরীতে গিয়াছেন। এইরূপ অযাচিত ভাবে হঠাৎ মাকে পাইয়া তাঁহারা মহা আনন্দে আছেন। জটীয়া বাবার আশ্রমে খুব উৎসব হইয়াছে। মার ৺ভুবনেশ্বর যাওয়ার কথা, ইত্যাদি"। মার খবর পাইয়া একটু আশ্বস্ত হইলাম। ৺ভুবনেশ্বরে আমার আচার্যগুরু দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে মার খবর জানাইবার জন্য পত্র লিখিয়া দিলাম।

মা যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন, মার আদেশমত নিত্য নিয়মিত ক্রিয়াদি করিয়া দেখিতেছি, ভালই আছি। মনে করিয়াছিলাম, এই নূতন

মায়ের বিধান সবই মঙ্গলময়।

অবস্থায়, কি জানি কি ভাব হইবে। বাবাও চিঠি লিখিয়াছেন, তিনি বিশু ব্রহ্মচারীকে নিয়া ভালই আছেন। কোন অসুবিধা নাই। মার বিধান সব মঙ্গলময়। আমরা না বুঝিয়া মনে ভয় পাই। কিন্তু বিশ্বাস ও নির্ভরতার সহিত আদেশ পালন করিয়া গেলে দেখা যায়, ভয়ের কিছুত নাইই, বরং মঙ্গলই নিহিত আছে।

রাজসাহী হইতে অটলদাদার পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "এত

বৎসর এত কান্নার পর মা জননী আসিয়া দেখা দিয়াছেন। আমার সব ক্ষোভ মিটিয়াছে। জীবনে এত আনন্দ ও এত আশীর্বাদ আর পাই নাই, এখন প্রার্থনা করিও শীঘ্র শীঘ্র সংসারের ঋণমুক্ত হইয়া মার কোলে যাইয়া শান্তি পাইতে পারি। ধর্মশালা সুবিধা মত না পাওয়ায়, মা আমার খোলা বারান্দায় এক রাত্রি কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন, ইহাও মার কৃপা।" জ্যোতিষদাদাও সোলন হইতে মার যখন যাহা খবর পাইতেছেন, তখনই আমাকে জানাইতেছেন। কিন্তু সেখান হইতে খবর কি, কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। যতীশ গুহ মহাশয় আরও একটু লিখিয়াছেন, "মা এখানে আসিয়াই আপনাদের উপর যে যে আদেশ হইয়াছে আমাকে বলিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "মা, সকলকে এভাবে কাঁদাইয়া লাভ কি?" মা অমনি উত্তর দিলেন, "এভাবে কাঁদিলেই যার যেটুকু ময়লা আছে, ধুইয়া যাইবে।"

অটলদাদার ও যতীশদাদার চিঠি।

"কাঁদিলেই ময়লা ধুইয়া যাইবে।"

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়

২রা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট, মঙ্গলবার। আজ ভোলানাথের চিঠিতে জানিলাম, মা ৺পুরী ও ৺ভুবনেশ্বর হইয়া, আবার কোথায় গিয়াছেন। হয়ত, এখন যেখানে গিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা নিষেধ। তাই তিনি এই ভাবে লিখিয়াছেন। আর কোন খবর নাই।

৺পুরী ও ৺ভুবনেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমায়ের পুনশ্চ অজ্ঞাত বাস।

৩রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, বুধবার। আজ সন্ধ্যাবেলা কলিকাতা হইতে

যতীশ দাদার পত্রে জানিলাম, মা ভুবনেশ্বর হইতে খড়্গপুর, আদ্রা হইয়া ঁমথুরা গিয়াছেন। ঁমথুরা গিয়া কমলকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করায়, বিরাজমোহিনী দিদি ও মাকে মথুরায় রাখিয়া কমল কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছে। ঁভুবনেশ্বর হইতে শ্রীযুত দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠি আজই পাইলাম। মা ৬ই আগস্ট ঁভুবনেশ্বর ধর্মশালায় গিয়াছিলেন। খবর পাইয়া ৭ই আগস্ট তিনি মার সঙ্গে দেখা করেন। প্রায় দুই ঘন্টা মার কাছে ছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা মা খড়্গপুরের দিকে গেলেন। তারপর কোথায় যাইবেন, ঠিক নাই, বলিয়াছেন। এর পরেই ঁমথুরা গিয়াছেন খবর পাইলাম।

শ্রীশ্রীমা ঁমথুরায়।

৬ই ভাদ্র, ২২শে আগস্ট, শনিবার। আজ কলিকাতা হইতে যতীশদাদার কন্যা ফুল্লযূথিকার চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, "মা গত ঝুলন যাত্রার দিন, রাত্রিতে আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন। আমরা মাকে ফুলের মুকুট, বাঁশি ইত্যাদি দিয়া কৃষ্ণ সাজাইয়াছিলাম। পীত বসন কিনিয়া আনিয়া মাকে পরাইয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীর কীর্তন হইয়াছিল। হলে লোক ধরে না বলিয়া ছাদে কীর্তন হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পর মা সব খুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "তোর কাছে রাখিয়া দে, নীচে গিয়া পরিয়া তোকে দেখাইব"। ৩।৪ শত লোক হইয়াছিল। পরে মা নীচে হলে আসিয়া সব সাজ পরিয়া শ্রীকৃষ্ণের মত বাঁশী হাতে নিয়া, বাঁকা হইয়া দাঁড়াইলেন। সকলে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। পরে আমরা (বোনেরা) ঁকৃষ্ণের গান করিলাম। মা কিছুক্ষণ পর বলিলেন, 'এখন শীগ্‌গীর এগুলি খুলিয়া নে। শরীরটা অন্যরকম হইলে মুস্কিলে পড়বি'। তখন আমরা সব খুলিয়া নিলাম। রাত্রি প্রায় ২॥ টা অবধি আমরা এ আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অন্যান্য খবর

ফুল্ল-যূথিকার চিঠি—ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রির আনন্দের বিস্তৃত বিবরণ।

বাবার পত্রেই জানিয়াছেন। কিন্তু এ খবর হয়ত বাবা বিস্তারিত দিতে পারেন নাই, কারণ, তিনি সব সময় কাছে ছিলেন না। আমি, দিদি ও অনু মাসী মার কাছে সর্বদা ছিলাম।"

পুনশ্চ সংবাদ ঃ— ৺মথুরায় শ্রীশ্রীমা নিঃসম্বল অবস্থায়; ভিখারিণী প্রায়।

শেষ লিখিয়াছে, "মা ৺মথুরায় গিয়া কমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কাছে আর কত টাকা আছে'। তিনি বলিলেন, '১০ টাকা'। তখন মা বলিলেন, 'এই টাকা নিয়া তুমি চলিয়া যাও'। মার সঙ্গে কিছুই নাই। এক টুক্‌রা কম্বল মার শরীরের মাপে কাটিয়া রাখিয়াছেন। আর একটি ঘটি মাত্র আছে। আর কিছুই নাই। এর পর কি করিবেন, কেহ জানে না।" এই খবর পাইয়া মর্মাহত হইলাম। যাঁহাকে একটু সেবা করিবার জন্য কত লোক লালায়িত, আজ তিনি পথের ভিখারিণীর বেশে সাজিয়াছেন!! কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কেহ জানে না।

অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিষেধ।

জ্যোতিষদাদার ও বাবার পত্র পাইলাম। তাঁহারাও লিখিয়াছেন, "মা অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই সাহস হয় না। প্রার্থনা ভিন্ন আর আমাদের উপায় কি?" কবে ফিরিবেন, মাই জানেন। বিরাজমোহিনী দিদি মাত্র সঙ্গে আছেন।

৺মথুরা হইতে কোথায় যাইবেন কেহ জানে না।

১২ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট, শুক্রবার। আজ ভোলানাথের পত্র পাইলাম। মা কবে ফিরিবেন, কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিয়া যান নাই। ৺মথুরা হইতে অন্যত্র যাইবেন জানাইয়াছেন। কমলও আসিয়া জানাইয়াছে, যেদিন সে ৺মথুরা হইতে রওনা হইয়া আসে, সেই দিনই মার অন্যত্র রওনা হইয়া যাওয়ার কথা। কোথায় যাইবেন, কেহ জানে না। নরসিংহ ৺মথুরায় আছে। তাহার নিকট খবর নিয়া জানা গেল, মা যে ৺মথুরা গিয়াছেন, তাহাই সে জানে না। মার আর খবর শীঘ্র পাওয়া যাইবে না আশঙ্কায় আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

১৪ই ভাদ্র, ৩০শে আগস্ট, রবিবার। আজ বাবার পত্রে জানিলাম, বাবা, মার খবরের জন্য ব্যস্ত হইয়া নানা জায়গায় চিঠি লিখিয়াছিলেন। বীরেন দাদাকেও আগ্রায় চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি ঁমথুরা গিয়া বাবার লিখিত ধর্মশালায় মার খোঁজ করিয়া জানিলেন, মা ১০।১২ দিন পূর্বে ঐ ধর্মশালায় আসিয়া জায়গা না পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরে বাবা কোথা হইতে খবর পাইয়াছেন, মা ঁবৃন্দাবনে ঘুরিতেছেন। মার নিষেধ। কাজেই খবর পাইয়াও কাহারও কিছু করিবার উপায় নাই।

অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর চিঠি শ্রীশ্রীমা ঁবৃন্দাবনে।

২০শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার। আজ বাবার পত্রে জানিলাম, মা ফয়জাবাদে কয়েকদিন থাকিয়া ঁঅযোধ্যায় আসিয়াছেন। ফয়জাবাদ হইতে লছমী রানী এই মর্মের চিঠি পাঠাইয়াছেন। ইতিপূর্বে এলাহাবাদ হইতে মার ভক্ত (কাশ্মিরী) একটি স্ত্রীলোকের পত্রে জানিয়াছিলাম, তিনি খবর পাইয়াছেন, মা লক্ষ্ণৌ আছেন। আজই জ্যোতিষ-দাদার পত্রে জানিলাম, তিনি খবর পাইয়াছেন, মা ঁঅযোধ্যা হইতে লক্ষ্ণৌ, কানপুরের দিকে যাইবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ঐ কাশ্মিরী স্ত্রীলোকটির পত্রও আজ পাইলাম। তিনিও লিখিয়াছেন, মা ফয়জাবাদ হইতে ঁঅযোধ্যা আসিয়াছিলেন। পরে লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। বলিয়াছেন, "যদি তোমরা আমার শরীর রাখিতে চাও তবে আমাকে ভুলিও না।" কোথায়ও কাহাকেও খবর দিতে দেন নাই। বলিয়াছেন, "শরীরটা কখন কোথায় চলিয়া যায়, ঠিক নাই। খবর পাইয়া কেহ আসিয়া হয়ত দেখা না পাইলে দুঃখিত হইবে।" কয়েকদিন পর অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর পত্রে জানিলাম, "মা বোধ হয় কানপুরে আছেন। এক এক জায়গায় যান, যেই লোকের ভিড় হইতে আরম্ভ হয়, অমনি মা অন্যত্র

পরবর্তী সংবাদঃ— শ্রীশ্রীমা ফয়জাবাদে, ঁঅযোধ্যায়, লক্ষ্ণৌএ, এবং কানপুরে।

চলিয়া যাইতেছেন। এই ভাবে মা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।" বোধ হয়, দেরাদুনেই একবার কি কথায় মা বলিতেছিলেন, "লোকে যে বলে, মুনি ঋষিরাও ত রাগ করিতেন, তবে আমাদের বেলায় দোষ কি? ইহার উত্তর এই, যে মুনি ঋষিরা ছিলেন পূর্ণ। রাগ যে করিতেন, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারিতেন। এবং তাহার ফলে, তাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে পারিতেন। যেমন তাঁহারা ভস্ম করিতে পারিতেন, তেমনই আবার সৃষ্টিও করিতে পারিতেন। এই জন্যই সাধারণের সহিত তাঁহাদের তুলনা দেওয়া ঠিক নয়।"

৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। মা লক্ষ্ণৌ, কানপুরের দিকে গিয়াছেন, এই খবরের পরে মার আর কোন খবর পাওয়া যাইতেছে না।

ভক্ত শ্যামদাস বাবাজীর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভক্তানুগ্রহকাতরা শ্রীশ্রীমার বিনা আহ্বানে স্বয়ং ৺পুরীধামে গিয়া বাবাজীর কুটিরে দর্শন-দান।

গতকল্য রাত্রিতে ৺পুরী হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ৺বিন্ধ্যাচল আসিয়াছেন। তিনি আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমে আসিয়া নিম্নলিখিত ঘটনা বলিলেন, "আনন্দময়ী মা ৺পুরী গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমি খবর পাই নাই। আমি সমুদ্রের ধারে হরিদাস ঠাকুরের মঠের কাছে বাড়ী করিয়া সেখানেই আছি, হরিদাস ঠাকুরের মঠের বাবাজী (শ্যামদাস বাবাজী) পরম বৈষ্ণব। বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি এখন বাতে পঙ্গু হইয়া আছেন। আজ প্রায় ৩ মাস পূর্বে তিনি একটি লোকের মুখে মা আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগলের মত হন। এমন কি, দেরাদুনে তাঁকে দর্শন করিতে যাইতে পর্যন্ত প্রস্তুত। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যাই। একদিন গিয়া শুনি, এই ব্যাপার। শ্যামদাস বাবাজী প্রায় ১৮।২০ বৎসর যাবৎ ৺পুরী আছেন।

কোন বিষয়েই তাঁর বেশী ইচ্ছা, অনিচ্ছা দেখি নাই। আজ তাঁকে এই রকম চঞ্চল দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এবং তাঁকে বলিলাম, আপনি কত সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, এখন স্বয়ং জগন্নাথ দেবের স্থানে বসিয়া আছেন। আপনার আনন্দময়ীকে দেখিবার জন্য এত চঞ্চলতা হইল কেন? আপনার পায়খানায় যাওয়ার পর্যন্ত ক্ষমতা নাই। আর দেরাদুন যাইতে চাহিতেছেন? আমিও আনন্দময়ীকে কখনও দেখি নাই। আপনার এরূপ চঞ্চল হওয়া মোটেই সাজে না। যদি আপনার তাঁকে দর্শন করা ভাগ্যে থাকে, এই ঘরে বসিয়াই তাঁর দর্শন পাইতে পারেন। এই সব কথা বলায় তিনি কিছু আর বলিলেন না। ঘটনাচক্রে এই কথার মাস দেড়েক পর আমি শ্যামদাস বাবাজীর কাছে গিয়াছি। তিনি অতি আনন্দের সহিত বলিলেন, 'মা আনন্দময়ী এই ঘরে বসিয়াই আমাকে দর্শন দিয়া গিয়াছেন। কয়েক মিনিট এখানে ছিলেন। মাখনবাবু তাঁকে নিয়া আসিয়াছিলেন। আমি তাঁকে দর্শন করিতে যাইব ভাবিলাম। কিন্তু শুনিলাম, তিনি পুরী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি শ্যামদাস বাবাজীকে বলিলাম, 'আপনি আমায় তখন ডাকিলেন না কেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার কি তখন জ্ঞান ছিল? মা কয়েক মিনিট মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম।' আমার বাড়ীর নিকটেই গিয়াছিলেন, অথচ আমার সহিত দেখা হইল না।"

এই ঘটনাটি শুনিয়া আমরাও আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কয়েকদিন হয়, তুরীয়ানন্দ স্বামীজী* আমাকে বলিতেছিলেন, "মা, যে কেন এই ঘুরিয়া

* কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর হইতেই গেরুয়া ব্যবহার করেন এবং মা তাঁর নাম তুরীয়নন্দ রাখিয়াছেন। মার আদেশে তিনি দেরাদুন হইতে বিন্ধ্যাচল আশ্রমেই আসিয়া আছেন। তাঁর কাছেই ভদ্রলোকটি এই ঘটনা বলিতেছিলেন, আমিও শুনিলাম।

ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কিছুই বুঝিতেছি না। এত আশ্রম করা হইল কিন্তু মা বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতেছেন।" আমি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলাম, "দেখুন ঁপুরী যাইবার এক কারণ আজ শুনিলেন। এইরূপ কত জায়গায় কত ঘটনা আছে, কি করিয়া ধারণা করিবেন? এই ভদ্রলোক ঘটনাচক্রে এখানে আজ আসিয়াছেন, এবং শ্যামদাস বাবাজীর সহিত এঁর পরিচয় আছে; আপনাদের সঙ্গেও আছে। তাই তিনি অযাচিত ভাবে এই ঘটনা শুনাইয়া গেলেন। নতুবা, এ ঘটনা জানিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।"

শ্রীশ্রীমায়ের নানা স্থান পর্যটনের কারণ নির্দেশের প্রয়াস।

৩১শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার। আগ্রা হইতে বীরেনদাদার চিঠি পাইলাম। তিনি মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি দেরাদুনের চিঠিতে খবর পাইলাম, মা আগ্রার দিকে আসিয়াছেন। পরে খোঁজ নিয়া জানিলাম, মা সত্যই একদিনের জন্য আগ্রা আসিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। পরে ঁবৃন্দাবনে চিঠি লিখিয়া খবর পাইলাম, মা ঁবৃন্দাবনে বর্ধমান রাজার মন্দিরেই গিয়াছিলেন। সেখানকার ম্যানেজার যোগেন্দ্রবাবু মাকে আগ্রা ফোর্টের টিকিট কিনিয়া দিয়াছেন। পরে খবর পাইলাম, আগ্রা ফোর্টে আসিয়া এটোয়ার টিকিট করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তারপর খবর পাইলাম, মা অযোধ্যার দিকে গিয়াছেন। দুইবার মা আগ্রা আসিলেন অথচ একবারও আমি দর্শন পাইলাম না। আবার ঁমথুরাতে নরসিংহ প্রফেসারী করিতেছে। মা ঁমথুরা গিয়াছিলেন। অথচ সে খবরই জানে না। মার ইচ্ছা, কাহারও সহিত দেখা না হয়। এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের আংশিক সংবাদ সম্বলিত বীরেনদাদার চিঠি।

আজ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর চিঠি পাইলাম। তিনি মার সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "ঁপুরী হইতে মাখনবাবু লিখিয়াছেন, মার সহিত তাঁহার

কথা হয়। মা নাকি বলিয়াছেন, "এখন বাগানে বেড়াইতেছি। কোন্ গাছটা কেমন আছে, দেখিয়া যাই।" মা আপন মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি ভাবে গাছের খবর নিতেছেন মাই জানেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর চিঠি।

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়

১৩৪৩ সনের আশ্বিন মাসে খবর পাইলাম, মা এটোয়া গিয়া প্রায় ২৭ দিন ছিলেন। তারপর লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। আমি ১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) বিন্ধ্যাচল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কমলের মুখে মার খবর কিছু কিছু পাইলাম। মথুরা হইতে মা কমলকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। শুনিলাম মা ভুবনেশ্বর হইতে আগ্রা এবং শ্যামকুটীর (আগ্রা ও মথুরার মধ্যস্থানে একটি আশ্রম) হইয়া মথুরা গিয়াছিলেন এবং কমল যে কয়দিন মার সঙ্গে ছিল, সে কয়দিনের ঘটনা লিখিয়া, জ্যোতিষ-দাদাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। কলিকাতা হইতে ঢাকায় যাইবার পূর্বদিন অর্থাৎ ২২শে আশ্বিন, (৮ই, অক্টোবর) ভোলানাথের সহিত দেখা করিতে গিয়া জানিলাম, সেই দিনই বিরাজমোহিনীদিদির পত্র ভোলানাথের কাছে আসিয়াছে যে, মা লক্ষ্ণৌ আছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অজ্ঞাত বাসের স্থানগুলির সম্বন্ধে আংশিক সংবাদ সংগ্রহ।

আমি ২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) মার আদেশে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ২৭শে আশ্বিন বুধবার, (১৩ই, অক্টোবর) আমি আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে আছি। মার আদেশে ১০৮ পদের ভোগের দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ কালীপূজার পর প্রতিপদ তিথি

আমার ঢাকায় আগমন। (১৩৪৩।২৪শে আশ্বিন)। মার সম্বন্ধে সংবাদ। (১০ই অক্টোবর, ১৯৩৬)

পর্যন্ত, ঢাকায় থাকিতে হইবে। মা কলিকাতা হইতে বাহির হইবার পূর্বদিন খুব আনন্দ করিয়া গিয়াছেন, শুনিলাম।

১৩৪৩ সন ২৯শে আশ্বিন। বাবার পত্রে জানিলাম, তিনি মাণিকের (১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৬) পত্রে জানিয়াছেন, যে মা লক্ষ্নৌ হইতে বড়বাঙ্কি গিয়াছিলেন। মাণিক ও সঙ্গে ছিল। সেখানে ছয় দিন থাকার পর মাণিককে মা সরাইয়া দিয়া কোথায় গিয়াছেন, মাণিক জানে না। আমি কোথায় আছি ও বাবা কেমন আছেন, মাণিককে মা খবর নিতে বলিয়াছেন; এবং পুনরায় মাণিকের সহিত মার দেখা হইবে, মাণিক এরূপ আশা করে।

১৩৪৩ সন, ১২ই কার্তিক (২৮শে আশ্বিন, ১৯৩৬)। ভূপতিদাদার কাছে জ্যোতিষদাদার পত্র আসিয়াছে। তাহাতে জানিলাম, মা ১৯শে অক্টোবর নৈনিতাল হইতে নামিয়াছেন। তারপর কোথায় আছেন, খবর পান নাই। মাণিককে লক্ষ্নৌতে মা বলিয়াছিলেন, পূজার সময় কোথায় থাকিবেন, তাহা মাণিককে জানাইবেন। মা ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লক্ষ্নৌতে আসিয়া বড়বাঙ্কি যান। সঙ্গে মাণিকও যায়। ৬ দিন বড়বাঙ্কি থাকিয়া অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর মা মাণিককে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। পরে সেইদিন বৈকালে খোঁজ করিয়া মাণিক আর মাকে বড়বাঙ্কিতে পায় নাই। হয়ত, মা সেখান হইতে নৈনিতাল গিয়া থাকিবেন।

শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে পরবর্তী সংবাদ।

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়

বাস্তবিকই অনেকের মনেই এ সন্দেহ জাগে, 'মা কেন এই ভাবে এত কষ্ট করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন'। কত জায়গায় মার একটু আরামে থাকিবার জন্য কত বন্দোবস্ত করা হইতেছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে,

যেখানেই একটু সুবিধা হইয়া ওঠে, অমনি মা সে স্থান ত্যাগ করেন। কত লোক মাকে একটু দেখিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু মা সকলকে কাঁদাইয়া কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী হইয়া পড়িতেছেন। ঢাকায় যেই আশ্রম হইল, মা বাহির হইয়া নানা স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। কিছু দিন পর ফিরিলেন। কিন্তু আশ্রমে বেশী দিন থাকিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে যখন দিন দিনই আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল, মার দর্শনের জন্য লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, অমনি মা একেবারে উত্তরাখণ্ডে চলিয়া গেলেন এবং প্রায় দশ মাস রায়পুরের এক পাহাড়ের উপরে পুরাণা মন্দিরের বারান্দায় স্থান নিলেন। কাহাকেও নিজের খবর পর্যন্ত লইতে দিলেন না। সেখানে অসুখ হইল। তবুও কাহাকেও সেখানে সেবার জন্য পর্যন্ত যাইবার অনুমতি দিলেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্র দুর্বোধ্য।

আবার দেরাদুনে ভক্তেরা কত আশায় আশ্রম করিল। প্রতিষ্ঠার কয়েক দিন পরই বাহির হইয়া গেলেন। সোলনে গিয়া শোগী বাবার তৈয়ারী যে ঘরে ছিলেন, বর্ষাকালে রোজই প্রায় বৃষ্টিতে সে ঘর জলে ভরিয়া যাইত। শোগীবাবা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি নিজের মতে ঘরগুলি তৈয়ার করিয়াছিলেন। সব ঘরগুলিরই এই অবস্থা। রাজা সাহেব মাকে অন্যত্র নিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মা এই মন্দিরেই রহিলেন। কাহারও বাড়ী যান না। তাই এই অবস্থায়ই ঘুরিতেছেন। পূর্বেও সোলন আসিয়া এক গুহায় ছিলেন। তাহাও জল পড়িয়া ভিজিয়া যাইত (সে স্থানও আমরা দেখিয়াছি)। কোন প্রকারে এক কোণায় থাকিতেন। প্রথম প্রথম যখন সকলের ঘরে যাইতেন, তখন কখনও রাজবাড়ী ও যাইতেছেন, কখনও ভিখারীর বাড়ী যাইতেছেন, কখনও বহু লোকের মধ্যে বাস করিতেছেন, কখনও একান্তে আছেন। কিন্তু ইহা সব সময়েই লক্ষ্য করিয়াছি, বাহিরের

এই বিভিন্ন অবস্থায় মার ভাবের কোনই পরিবর্তন হয় নাই। কোন অবস্থাটা মা বেশী পছন্দ করেন ইহা বোধ হয়, কেহই বলিতে পারিবেন না। প্রকৃত কথা এই যে, কিছুতেই তাঁর আসক্তি নাই। যিনি কয়েকদিন মার সঙ্গে মিলিয়াছেন, তিনিই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

১৯৩৬ সনে মা বাংলা দেশ হইতে ফিরিয়া দেরাদুন গিয়া, কৃষ্ণাশ্রমে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে থাকিবার খুবই সুবন্দোবস্ত। কিন্তু মা কয়েকদিন পরেই হঠাৎ মনোহর মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া জায়গা নিলেন। কৃষ্ণাশ্রমের তুলনায় সেখানে থাকিবার অনেক অসুবিধা। (পূর্বে যখন মা ও জ্যোতিষদাদা এই মন্দিরের বারান্দায় থাকিতেন, তখন আরও অসুবিধা ছিল। বৃষ্টির জলে বারান্দা সব ভিজিয়া যাইত। আবার শীতের দিনেও চারিদিক দিয়াই ঠান্ডা লাগিত)। কিন্তু মা এখানেই আসিলেন। কেন আসিলেন, কে বলিবে? সেই সময়তেই একদিন নরসিংহের সহিত মার কথা হইতেছিল। মা বলিতেছিলেন, "এই রৌদ্রের মধ্যে এত কষ্ট করিয়া কেন বারে বারে এখানে আস? তোমাদের মাথা খারাপ হইয়াছে। তোমরাও মানুষ আমিও মানুষ। কি দেখিতে আস?" হাসিয়া হাসিয়া এই কথা বলিতেছেন। নরসিংহ বলিতেছে, "তা'ত ঠিকই। কিন্তু আমাদের কাছে কেন সকলে যায় না, তা বলিতে পার? আমরা ত লোক গেলে কত আদর অভ্যর্থনা করি, আর তুমিত সব সময় সকলের সহিত কথাও বল না, আসিতেও বলনা তবুও কেন এত লোক আসে? আর দেখ, এই গরম, কৃষ্ণাশ্রমে বেশ ইলেক্‌ট্রিক পাখা ছিল, আলো ছিল, বেশ আরামের স্থান। তুমি সে স্থান ছাড়িয়া এই খোলা বারান্দায় আসিয়া কেন স্থান নিলে? রৌদ্রে বারান্দা আগুন হইয়া ওঠে; থাকা যায় না। আর তুমি সেই ঠান্ডা স্থান ছাড়িয়া এই গরমের মধ্যে এইখানেই চলিয়া আসিলে! আমরা ত কখনও আসিতাম না। তোমাতে ও আমাদের মধ্যে এই সব প্রভেদ। আমরা

চাই আরাম, আর তুমি, যেখানেই একটু সুবিধা বা আরাম মিলিতেছে দেখ, অমনিই সে স্থান ত্যাগ কর। এই সব কারণেই এতগুলি লোক, না ডাকিলেও, তোমার কাছে ছুটিয়া আসে।"

আজ পর্যন্ত মা এই ভাবেই ঘুরিতেছেন। এর পর কি হইবে, মাই জানেন। যাঁহারা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তাঁহারাও বলিতে পারিতেন না, মা আজই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন কি না। অথচ, যতদিন সঙ্গে আছেন, বেশ স্নেহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন অবস্থা বা কাহারও সঙ্গই তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। তাই তিনি সর্বদাই স্বাধীন। যখনই কোথায়ও যাইবার কথা মনে ভাসিয়াছে, অমনি আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া, নিজে হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেন। এই যে মাকে নিয়া সকলে আনন্দের হাট বসাইত, ইহা ভাঙ্গিতে বা গড়িতে, মার ভ্রূক্ষেপও হইত না; তাঁর সংস্পর্শে আসিলেই ইহা লক্ষ্য করিবেন। কখনও ব্যবহার দেখিয়া মনে হইত, হয়ত মা আমাকে কি অমুককে খুব স্নেহ করেন, আবার আর একটি ব্যবহারে হয়ত দেখিলাম, আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্নেহ ভালবাসার তিনি অতীত। নানালোকের সহিত নানা ভাবে মিলিতেছেন। কত ভাবেরই খেলা করিতেছেন। তাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁকে বুঝিয়া ওঠা দায় হইয়া পড়ে। তিনি কিন্তু প্রতি কথাতেই বলেন, "জানিও, আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করি না। তোমরা সকলে যেমন করাইয়া নেও শরীরটা তেমনই করিয়া যাইতেছে।"

ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায়

১৯৩৫ সনে, মা যখন তারাপীঠ গিয়াছিলেন, তখন এক সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান বৃদ্ধকে, মা "বাবা" বলিতেন; বৃদ্ধও সেই ডাকে গলিয়া যাইত। প্রত্যহই মাকে সে একবার দেখিতে আসিত। সিদ্ধাশ্রমের কিছু দূরেই একটা মস্‌জিদ আছে। তাহার নিকটেই বৃদ্ধ মুসলমানটির বাড়ী। মা তাঁহার বাড়ীতে অনেকবার সকলকে নিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ গিয়া তাহার স্ত্রীদের (বৃদ্ধের দুই স্ত্রী) কাছে বলিত, "মেয়ে এসেছে। তোমরা বাহির হও।" তাহারা আসিয়া মাকে আদর করিয়া বসাইত। মাও সেখানে গিয়া একেবারে মেয়েই সাজিতেন। খুব আনন্দ করিতেন। মার নিকট কিছু ভাল খাবার আসিলেই মা আমাদের বলিতেন, "বাবার জন্য কিছু পাঠাইয়া দাও।" বৃদ্ধ মাকে দেখিতে আসিয়া যদি বেশী দেরী দেখিত, তবে বাহির হইতেই কাহাকেও দিয়া মার কাছে বলিয়া পাঠাইত, "মাকে গিয়া বল, তার বাবা এসেছে, একবার দেখা করিতে চায়।" মা এই খবর পাইলেই বৃদ্ধের সহিত দেখা করিতেন।

১৯৩৫ সনের একটি ঘটনা। ৺তারাপীঠে বৃদ্ধ মুসলমান শ্রীশ্রী মায়ের "বাবা"।

মার ৺তারাপীঠ থাকাকালীন একটি মৌলবী সাহেবও মার কাছে কলিকাতা হইতে আসিয়া কিছু দিন ছিলেন। ইনি দিল্লীর বড় ঘরের ছেলে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর কাছে মার কথা শুনিয়া, মৌলবী সাহেব প্রথম মাকে দেখিতে কলিকাতায় বিনয়বাবুর বাসায় যান। কলিকাতার সংজ্ঞাদেবীর বাড়ীর পাশেই ইঁহার বাড়ী। মাকে দেখিয়াই ইঁহার মন গলিয়া যায়। পরে ইনি ৺তারাপীঠে মার কাছে যান। ২।৪ দিন ছিলেন। মা ইহার নাম রাখিলেন প্রেম গোপাল। আরও অনেক ভক্তদের নাম রাখা হইল, সত্যগোপাল, নিত্য গোপাল, জয়গোপাল ইত্যাদি। আর

মৌলবী সাহেবের নাম হইল 'প্রেমগোপাল"। এই মৌলবী সাহেব মার সম্বন্ধে উর্দু ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। মাকে তাহা পড়িয়া শুনাইয়াছেন। কয়েক দিন পর মার আদেশে তিনি কলিকাতা ফিরিয়া যান। কিন্তু সংজ্ঞাদেবীর নিকট শুনিলাম, তিনি কলিকাতায় গিয়া মার জন্য এত ব্যাকুল হইলেন, যে খাইতে পর্যন্ত পারিতেন না; কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পরে সংজ্ঞাদেবী আবার ইঁহাকে তাঁরাপীঠ পাঠাইয়া দেন। দ্বিতীয় বার তিনি আসিয়া কয়েক দিন মার কাছে থাকিয়া, একটু সুস্থ হইয়া, মার আদেশ মত পুনরায় কলিকাতা চলিয়া যান। মৌলবী সাহেবকে হিন্দু মাতাজীর এত ভক্ত হইতে দেখিয়া, তাঁরাপীঠে অনেক মুসলমান জমা হইয়া, মৌলবী সাহেবকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। ইহাতে মৌলবী সাহেব একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলকে মসজিদে ডাকাইয়া একত্র করিলেন, এবং প্রায় ঘন্টা দুই বক্তৃতা দিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, মা কি জিনিষ; এবং এই মার কাছে গেলে, তাঁদের ধর্ম্মমতেও কোন বাধা হইতে পারে না। মাকেও নিয়া সেই সভায় একটা চৌকীর উপর আসন পাতিয়া বসাইয়া, পরে মাকে নমস্কার করিয়া তিনি এইরূপে বক্তৃতা দিলেন। মাকে ইনি খুবই শ্রদ্ধা করিতেন।

তাঁরাপীঠে মুসলমান মৌলবীকে "প্রেম গোপাল" নাম করণ।

কলিকাতা হইতে মার জন্য কি খাবার নিয়া প্রেমগোপাল গিয়াছেন। ইচ্ছা, নিজ হাতে একটু মাকে খাওয়াইয়া দেন। কিন্তু বলিতে সাহস পান না। মা এই কথা শুনিয়া তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া একটু খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। তিনি মহা আনন্দে মার মুখে একটু মিষ্টি দিয়া দিলেন। পরে তিনি প্রসাদ নিলেন। কিন্তু মা সকলকে সেই প্রসাদ দিতে দিলেন না। মা এই প্রেমগোপালকেও খুব স্নেহ করিতেন। মার বৃদ্ধ মুসলমান

প্রেমগোপালের হস্তে শ্রীশ্রীমায়ের বিনা দ্বিধায় ভোগ গ্রহণ।

পিতাটীর বাড়ীতে এই প্রেমগোপালকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইল। এবং তিনি ইহাকে নাতি বলিয়া আদর করিতেন। আবার মায়ের বাপ বলিয়া বৃদ্ধকে, প্রেম গোপাল "নানা" বলিয়া ডাকিতেন। মধ্যে মধ্যে প্রেম গোপাল মার কাছে ভগবানের নাম গান করিতেন। হিন্দু ভক্তেরা বসিয়া শুনিতেন। আবার হরিনাম কীর্তনেও মুসলমানেরা উপস্থিত থাকিতেন। এই ভাবে মার কাছে হিন্দু মুসলমানের মিলন হইত।

তাঁরাপীঠে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বরচিত সংগীত গান।

তাঁরাপীঠে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ খুব গান করিতে পারিতেন। নিজেই গান রচনা করিতে পারিতেন। তিনি ভিন্ন গ্রামবাসী। মার দর্শনে তাঁরাপীঠ আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। একদিন আসিয়া মাকে বলিলেন, "মা, তোমার জন্য একটি গান রচনা করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া গাহিতে লাগিলেন।

"ওগো [ও] বাজীকরের মেয়ে
তোমার যা কিছু তা সবই গোল।
তোমার কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা,
এ ভেল্‌কি বোঝাও গণ্ডগোল।।
চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা,
(আর) এই ধরাখানিও করলি গোল।
(তোমার) অনন্ত গোলের ভেল্‌কি দিয়ে,
এই বুড়ো বাবাকে কর্‌লি পাগল।।

(মা) (তুমি) যে আলোতে ফুটিয়ে হাসি,
সাজাও সাধের রঙ্‌মহাল,
(আবার) সেই আলোতেই শ্মশান ঘাটে;
কান্নাকাটির উঠাও রোল।

যে পথে মা শুনাও তুমি, বাজিয়ে বিয়ের শানাই ঢোল,
আবার সেই পথেই মা শুনতে পাইগো গঙ্গা যাত্রার হরিবোল।।

ও গো (ও) বাজিকরের মেয়ে
কাতর হয়ে কইছে রাধা
ওমা তোর ভেল্‌কি ভয়ে হয়ে বিহ্বল,
আমার ভেল্‌কি দেখার সাধ মিটেছে, মা
দাও মা এবার শান্তি-কোল।।"

গানটি আমাদের প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল। তাই লিখিলাম।

আবার মা যখন 'তারাপীঠ হইতে শ্রীরামপুর গেলেন, তখন গৌরাঙ্গের মন্দিরে মা যাইয়া বসিতেই, একটি ভক্ত স্ত্রীলোক নিম্নলিখিত গানটি করিয়াছিলেন। এই গানটিও আমার প্রাণে খুব ভাল লাগিয়াছিল।

তাই লিখিতেছি ঃ—

শ্রীরামপুরে ভক্ত মহিলার মাতৃ সমক্ষে গান।

"করুণা পাথার, জননী আমার
এলে মা করুণা করিতে।
তাপিতের তরে নরদেহ ধরে,
অশেষ যাতনা সহিতে।
ত্রিদিব ত্যজিয়া এ ধরায় আসা,
সন্তানের তরে কত কাঁদা হাসা,
অহেতুক তব এই ভালবাসা,
পারে কি গো নরে বুঝিতে।
শত জনমের যত পাপ, হায়,
ঢালিয়া দিয়াছি ঐ রাঙ্গা পায়;

সকলি ত তুমি সহিলে হেলায়
কোল দিতে, মা গো, তাপিতে।
আবিলতা—ভরা হৃদয় আমার,
কেমনে পূজিব শ্রীপদ তোমার,
নয়ন ভরিয়া দাও অশ্রুধার,
পদ পঙ্কজ (তব) ধোয়াতে"।

বাস্তবিকই ত মা সন্তানের জন্য কতই না সহিতেছেন কিন্তু সন্তান তাহা বুঝিল কই? কিন্তু বুঝিবার প্রসঙ্গ বা তুলি কেন? সহিবেন না? মা যে চিরদিনই "মা"।

দীক্ষা সম্বন্ধে দেরাদুনে অমূল্যবাবুর সহিত মার কথা হয়। অমূল্যবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, বীজ না পাইলে কেবল নামেই কি কাজ হয়?" মা বলিলেন "হ্যাঁ, নামেই হয়। তোমরা কি দেখনা যে, ছোট ছেলে পেলে যখন মা বলিতে পারে না, তখন সে কাঁদিলেই মা বুঝিতে পারেন, যে শিশু মাকেই চাহিতেছে। অমনি মা তাহার কাছে যায়। কিন্তু বড় হইলে ছেলে কাঁদিলেই মা বুঝিতে পারেন না যে, ছেলে মাকেই চাহিতেছে। সেইরূপ, অজ্ঞান অবস্থায় আমরা যে নামেই ডাকিনা কেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন।" আবার অন্য সময় মা এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তোমরা যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই ডাকিয়া যাও, দরকার মত তিনিই নিজে আসিয়া তাঁহার প্রকৃত নাম বলিয়া দেন। যেমন দেখনা একটি ছেলের ভাল নাম হয়ত তুমি জান না, কিন্তু তুমি তাহাকে যদি তাহার ছেলেবেলার সাধারণ নামে অথবা খোকা খোকা বলিয়াই ডাক, প্রথম সে খেয়াল না করিলেও তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ডাকিতে থাকিলে, পরে সে নিশ্চয়ই আসিবে। এবং তখন সে নিজেই বলিবে, 'আমার

ভাল নাম এই।' কাজেই যে নামেই ডাক কাজ হয়ই।"

১৮ কার্ত্তিক বুধবার (৩রা নভেম্বর)। আজ জ্যোতিষদাদার পত্রে জানিলাম তিনি মাণিকের পত্রে জানিয়াছেন যে মা নৈনিতাল হইতে নামিয়া আগ্রা যান এবং তথা হইতে দিল্লীর নিকট গড়মুক্তেশ্বর নামক স্থানে গিয়াছিলেন। পরে কোথায় গিয়াছেন জানেন না। মার শরীর ভালই আছে।

নৈনিতাল হইতে শ্রীশ্রীমার আগ্রা ও গড়মুক্তেশ্বর গমনের সংবাদ প্রাপ্তি।

মা একটী পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের নাম বারিক রাখিয়া ছিলেন। সে খুব মোটা ছিল। তাই মা তাহাকে উল্‌টো নাম, অর্থাৎ বারিক মাই (সরু মাই), নাম দিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে কয়েক বার দেখিয়াছি। তাহার সঙ্গে মার প্রথম দেখা হরিদ্বারে, তখন বিশেষ পরিচয় হয় নাই। মা তাহার গল্প একদিন করিতেছিলেন। মা বলিতেছিলেন যে এই বারিক মা বেশী লেখাপড়া না জানিলেও, বেশ কথা বলিতে পারিত। স্বদেশী আন্দোলনে সে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিল। এবং নানা স্থানে সে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইত। তাহার একটা বেশ দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। সে রচনা করিয়া গান করিত। এই সব গান, এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ ইত্যাদি সে এত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিত, যে উহা শুনিয়া লোকে সে স্থান হইতে পালাইয়া যাইত। লোকে ইহা লইয়া তাহাকে ঠাট্টাও করিত। কিন্তু সে এসব কথা গ্রাহ্যই করিত না। তাহার একটা এক রোখা ভাব ছিল।

বারিক মাইর কথা।

সে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিল, তাহা আত্মীয়েরা পছন্দ করিত না। তাহাদের অনেক নিষেধ সত্ত্বেও, যখন সে এই কাজ ছাড়িল না তখন তাহারা এক দিন বারিক মাইকে দোতালায় রাখিয়া সিঁড়িতে তালা দিয়া রাখিল। এবং বলিল, যতক্ষণ সে কংগ্রেসের দল ছাড়িবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা

না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। বারিক মাইও একথায় আহার নিদ্রা ছাড়িল, ঘরের দামী জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও আত্মীয়েরা ছাড়িয়া দিতেছে না দেখিয়া, সে দোতালা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া কংগ্রেসে চলিয়া গেল। তাহার এই বিশাল শরীর নিয়া লাফ দিতে সে একটুও ভয় পাইল না। তাহার মনে এই রূপ একটা দৃঢ় সংকল্প জাগিয়াছিল, যে "হাড় ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, কি প্রাণ যায় যাক, যাহা মনে করিয়াছি, তাহা করিবই," কিন্তু দেখা গেল, যে এত উঁচু হইতে লাফাইয়াও তাহার কোনই ক্ষতি হইল না। কংগ্রেসের কাজে একবার তাহার জেল হইয়াছিল। জেলে যাইয়া সে এমন চীৎকার করিয়া গান করিত, যে লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। জেলের কর্তারা কিছুতেই তাহার গান থামাইতে পারিল না। সে বলিত, "তোমরা আমার হাত পা বাঁধিয়াছ, কিন্তু আমার জিহ্বা বন্ধ করিবার শক্তি তোমাদের নাই। আমি চীৎকার করিয়াই গান করিব। তোমাদের যাহা সাধ্য থাকে কর।" শেষে কর্তৃপক্ষেরা উহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

জেল হইতে আসিয়া সে এক "সৎসঙ্গ" গঠন করিল, সেখানে সৎ আলোচনা, ভজন পাঠ ইত্যাদি হইত। এই ভাবে সদালোচনায় সে সমস্ত দিন কাটাইতে লাগিল। মা বলিতেছেন, "আমি যখন হৃষীকেশ ছিলাম তখন সে মাঝে মাঝে আমার কাছে থাকিত। সে আমার কাছে থাকিত দেখিয়া তাহার সৎসঙ্গের পাঞ্জাবী লোকেরা তাহাকে বলিত, যে, তুমি ঐ বাঙ্গালী মায়ের কাছে যাও কেন? তুমি কি জান না যে বাঙ্গালী মেয়েরা যাদু জানে। তাহারা মন্ত্রবলে মানুষকে ভেড়া করিতে পারে। এই সব কথা শুনিয়া শুনিয়া এবং যখন দেখিল, যে আমার কাছে পাইবার মত কিছুই নাই, তখন সে আমার কাছে আসা বন্ধ করিয়া দিল।

পরে সারদা কয়েক দিনের জন্য ছুটি লইয়া হৃষীকেশ আসিল। তখন

তাহার ইচ্ছা হইল, যে সে বারিক মাইর পাঠ ও গান শুনিবে। তাই সে বারিক মাইর খোঁজ করিতে লাগিল। একদিন পূর্ণানন্দ স্বামীকে দেখিতে যাইবার পথে হঠাৎ আমাদের বারিক মাইর সহিত দেখা হইল। সারদা তাহাকে পূর্ণানন্দ স্বামীর আশ্রমে নিয়া গেল এবং সেখানে সে গানও করিল। ইহার পর সে আবার আমার কাছে আসা যাওয়া আরম্ভ করিল। তাহার আমার কাছে আসা একটা নেশার মত হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীরা নিষেধ করা সত্ত্বেও সে যাতায়াত বন্ধ করিল না। ক্রমে ক্রমে সে আমার কাছেই খাইত, শুইত, সর্বদা আমার কাছেই থাকিত। তাহার স্বভাব ছিল চারিদিকে বেড়ান। কিন্তু তাহা না করিয়া সে এখন চুপ করিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিতেই ভাল বাসিত। তাহার স্বভাবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অনেকেই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, সে নিজেও বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তবুও সে অন্যত্র যাইতে পারিত না। সে যেন একটা মোহের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। এদিকে আমি, যেমন এক দিন পর এক দিন খাই, সে সেইরূপ খাওয়া আরম্ভ করিল। আমি নিষেধ করিলাম কিন্তু সে মানিল না। তাহা ছাড়া লোকের নিকট আমার যাদু বিদ্যার কথা শুনিয়া, এবং নিজের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া, তাহার একটা দৃঢ় বিশ্বাস হইল, যে সত্যই আমি যাদু বিদ্যা জানি। সে আরও শুনিয়াছিল, যে আমি যখন রাত্রিতে শুইয়া থাকি, তখন মাটি হইতে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাই। সে ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য সারারাত জাগিতে লাগিল। কিন্তু আমার কোন পরিবর্তন দেখিল না। বরং রাত্রিতে মাঝে মাঝে আমার কথা শুনিয়া, সে বুঝিল, যে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই না। তখন সে মনে করিল, যে সে জাগা থাকে বলিয়াই বোধ হয় আমি মাটি হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাই না। তখন সে নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া থাকিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে অনাহারে অনিদ্রায় সে ভয়ানক দুর্বল

হইয়া পড়িল।

একদিন রাত্রিতে উহার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল। হাত পা ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। আমি জ্যোতিষকে বলিলাম, উহাকে একটু সেক দিয়া দিতে, এবং গায় হাত বুলাইয়া দিতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তখন আমিই তাহার গায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। শ্বাস অতি ধীরে ধীরে বহিতেছিল। পরে সেটুকুও প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ হাত বুলাইতে বুলাইতে সে চোখ মেলিয়া চাহিল। জ্যোতিষ তাহাকে ২।১টি ঔষধের বড়ি খাওয়াইয়া দিল, ঔষধ খাইয়া সে অনেকটা সুস্থ হইল। পরদিন তাহাকে সব ঘটনা বলা হইল, এবং এই ভাবে সে যদি জাগিয়া থাকে, তবে আর তাহাকে আমার কাছে থাকিতে দেওয়া হইবে না বলা হইল। সে ঘুমাইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু তাহার সঙ্গিনীরা যখন জানিতে পারিল, তাহাকে দুইটি বড়ি খাওয়ান হইয়াছে, তখন তাহারা বারিক মাইকে বুঝাইতে লাগিল, যে বাঙ্গালী মাই তাহাকে যাদুর বড়ি খাওয়াইয়া দিয়াছে এবং তাহার শরীর যাদুর জন্য এত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কথায় এবং নিজের শরীরের অবস্থা দেখিয়া তাহার বিশ্বাস হইল, যে আমি সত্যই তাহাকে কিছু করিয়াছি। সে আবার আমার কাছে আসা বন্ধ করিল।

পরে সে একদিন তাহার বিছানাপত্র নিতে আসিল। আসিয়া দেখে, আমরা হঁরিদ্বার রওনা হইতেছি। এমন কি, আমাদের গাড়ীও প্রস্তুত। তাহাকে দেখিয়া বলিলাম, 'কি মা, তোমার যাদুর কতদূর হইল'। ইহা শুনিয়া সে ভাবিল, আমি বুঝি সবই জানিতে ও দেখিতে পারি। এই ভাবিয়া, সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'আমি তোমার সহিত হঁরিদ্বার যাইব'। আমি বলিলাম, তুমি এখান হইতে চলিয়া না গেলে, আমার সঙ্গে যাইতে পারিতে। কিন্তু এখন ত তাহা হইবার উপায়

নাই কারণ আমাদের গাড়ী ঠিক, এবং উহাতে আর একটি লোকও যাইতে পারিবে না। আমরা তাহাকে রাখিয়াই ঁহরিদ্বার চলিয়া গেলাম। পরে সে অবশ্য ঁহরিদ্বার আমাদের কাছে গিয়াছিল। কিন্তু আমি আর তাহাকে আমার কাছে না রাখিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। পরে সে নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিল, যে তাহার শরীর খারাপের কারণ যাদু নয়, আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগের জন্যই শরীর খারাপ হইয়াছিল।”

এই কথা বলিয়া মা বলিলেন, “এখন তোমরা শুনিলে ত বাঙ্গালী মায়াবিনী কেমন যাদুর বড়ি খাওয়ায়। তবে এক অর্থে, যাদুর মতই। শুদ্ধ ভাবে এক লক্ষ্য হওয়া, একটা যাদুর মতই। ইহা যদি একবার ধরে, তবে আর ছাড়ে না।”

সিমলাতে একবার হারাণবাবু মাকে একটী সুন্দর ক্যাস বাক্স দেন। মাকে নিয়া গিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বাজারে গিয়া, বাক্স কিনিয়া আনিলেন। এবং চারুবাবু ও হারাণবাবু দুইখানি লাঠিও মাকে কিনিয়া দিলেন, বলিলেন, “আমাদের শাসন করিবার জন্য তোমার কাছে রাখিয়া দাও”। মা তাহা আবার তাহাদের দুইজনের কাছেই রাখিয়া আসিলেন। বাক্সটিও মা হারাণবাবুকে নিয়া যত্ন করিয়া তাহার বাসায় রাখিয়া দিতে বলিলেন। তিনি কিছুতেই রাজি হন না, মা বলিলেন, “আমার বাক্সটা তোমার কাছে রাখিয়া দাও”। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায়, মা বলিলেন, “আচ্ছা, বাক্স ভরিয়া দিব”। তখন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা মা, ভরিয়া দিলে নিব”। পরে একদিন রাত্রিতে বসিয়া, মা নানাভাবে নাম লিখাইয়া, বাক্সের খোপে খোপে রাখিয়া দিলেন। আমি চন্দন দিয়া বাক্সের ভিতরের আয়নায় “মা” লিখিয়া দিলাম। নানা কৌশলে নাম দিয়া, মা নিজের বাক্সটি সাজাইয়া দিলেন। এই লীলায় রাত্রি প্রায় ২টা বাজিল।

সিমলাতে হারাণবাবুর বাক্স লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের লীলাখেলা।

কারণ রাত্রিতে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর, মা বাক্সটি নিয়া বসিয়া, এই খেলা আরম্ভ করিলেন। পরদিন বাক্সটি পাইয়া তিনি তখন মহাখুসী। নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। "প্রথমে কিন্তু আমি বাক্সটি দিলাম, মা আবার আমাকেই ফিরাইয়া দিতেছেন" এই ভাবিয়া বাক্সটি নিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখন মার হাতে, নাম দিয়া সাজান বাক্সটি, তাঁহার নিকট মহামূল্য জিনিষ বলিয়া মনে হইল। পরে তিনি আসিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেরই আপশোষ হইতে লাগিল, যে "আমরাও মাকে একটি করিয়া বাক্স দিলে, হয়ত এমনই ভাবে মা সাজাইয়া দিতেন।" হারাণবাবুকে তাঁহারা মহা ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশৎ অধ্যায়

মার গত জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, সব সময়তেই তিনি পূর্ণভাবে লীলা করিয়া আসিয়াছেন। যখন মেয়ের ভূমিকা করিয়াছেন, তখন পিতা মাতার একান্ত অনুগতা ছিলেন। তাঁহাদিগকেই মা গুরু বলিয়া জানিতেন। প্রতিবেশীরাও মাকে খুব স্নেহ করিতেন। দরকার হইলেই তিনি প্রতিবেশীদের বাড়ী গিয়া রান্না করিয়া দিতেন। অন্যান্য কাজ কর্ম করিয়া দিতেন। সব কাজেই তাঁর নিপুণতা প্রকাশ পাইত। তাই গরীবের মেয়ে হইলেও, মার সহজ, সরল ব্যবহারে ও সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, সকলেই বাল্যকালেও মাকে খুব স্নেহ করিতেন।

সর্বাবস্থাতেই শ্রীশ্রীমা'র অস্বাভাবিক নিপুণতা ও পূর্ণতার বিকাশ।

মাতৃ আদেশ পালনের একটি ছোট ঘটনাও লিখিতেছি। একবার মা একটি পাথরের বাটি ধুইতে পুকুরে যান। যাইবার সময় দিদিমা বলিলেন, "দেখিস্, আবার পারিলে ভাঙ্গিয়া নিয়া আসিস্", এটা তিনি সাবধান করিবার জন্যই সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন। সত্য সত্যই বাটিটা মার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। মা অতি যত্নে তাহার সব টুক্‌রাগুলি কুড়াইয়া ভাল করিয়া ধুইয়া দিদিমার কাছে আসিয়া হাজির হইলেন। দিদিমা বলিলেন, "এ কি?" মা বলিলেন, "বাটিটি আমার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তুমি যে বলিয়াছিলে, নিয়া আসিস, তাই সব টুক্‌রা নিয়া আসিয়াছি।" তখন মার অতি অল্প বয়স। এই কথায় দিদিমা আর বাটি ভাঙ্গার জন্য রাগ করিতে পারিলেন না। হাসিয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীমার শৈশবের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা।

এখনও দেখি, পিতার কাছে তিনি সেই কন্যাই আছেন। কোথাও যাওয়া আসার সময় পিতা উপস্থিত থাকিলে, দুই হাতে তাঁহার দুই পা জড়াইয়া, পিতার পায়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া, পিতাকে প্রণাম করেন। আবার যখন বধূ সাজিলেন, তখনও জা, ভাসুরের সেবা এবং তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের যত্ন যথা নিয়মেই করিয়াছেন। সাংসারিক কাজে বাহ্যত এমন লিপ্ত থাকিতেন, যে নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্যই করিতেন না। এজন্য অনেক সময় রোগেও ভুগিয়াছেন। তবুও বধূর কর্তব্যে এতটুকুও ত্রুটি হয় নাই। জা'কে (মার এই অবস্থায়ও) যথেষ্ট সম্মান করিতে আমরাও মাকে দেখিয়াছি।

শ্রীশ্রীমার গার্হস্থ্য জীবনের কথা।

আবার যখন গৃহিণী হইলেন, পতির সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া বরণ করিয়া নিলেন। পতির চরণেই নিজেকে বিলাইয়া দিলেন। ভোলানাথের আদেশ মাকে এমন ভাবে পালন করিতে দেখিয়াছি, যে

তাহা কোনও সাধারণ মানবীর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। মার তুলনা শুধু মাই। মা খুব কড়ি খেলিতেন। তখন মা পিত্রালয়ে ছিলেন। একবার ভোলানাথ গিয়া ইহাতে অমত প্রকাশ করায়, সেই যে মা কড়ি খেলা বন্ধ করিলেন, সঙ্গিনীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আর কখনও খেলিতে বসেন নাই। অথচ মা তখন অল্পবয়স্কা ছিলেন। ভোলানাথ তখন অন্যত্র থাকিতেন; মা খেলিলেও ভোলানাথের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মার তাহা স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। বাজিতপুরে যে শারীরিক ক্রিয়াদি আরম্ভ হইল, তখনও ভোলানাথের সেবার কোনই ত্রুটি করিতেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া অফিসে পাঠাইয়া দিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না। বৈকালে আসিয়া যে হাত মুখ ধুইবেন, সেজন্য জল গামছাখানা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়া দ্বিপ্রহরে নিজের কাজে বসিতেন। আবার হয়ত উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন গৃহিণীর কর্তব্য ধূপ, প্রদীপ, লক্ষ্মীর আসন ইত্যাদি সব ঠিক করিয়া দিয়া পুনরায় রন্ধনাদির কার্যে যাইতেন। রন্ধনাদি করিয়া ভোলানাথের পান তামাক সব প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তিনি শুইলে, আবার মা রাত্রির কাজে বসিতেন। হয়ত এই কাজ করিয়া উঠিয়া খাইতে খাইতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই দিনরাত্রির মধ্যে তাঁর খাওয়া হইল।

“গৃহিণী” মা মা'র তুলনা শুধু মাই।

মা খুব ভালো রান্না করিতে পারিতেন। ভোলানাথ অনেক সময় তাহা প্রতিবেশীদের দিতেন। তাহারাও ইহাতে খুব আনন্দিত হইত। মার ও ভোলানাথের দুই জনেরই দেখিয়াছি, লোককে খাওয়াইয়া খুব আনন্দ পান। অপরিচ্ছন্নতা মার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মার কাজকর্ম, ঘর, দরজা, বিছানা, কাপড়, জামা সবই সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। মা নিজ হাতেই এসব পরিষ্কার করিতেন। আচার করা, আমসত্ত্ব দেওয়া কিছুরই মার ত্রুটি ছিল না। গৃহিণীর যথাকর্তব্য তিনি অতি সুচারুভাবে করিয়া

গিয়াছেন। ননদ ও দেবরদের কাছেও তিনি রহস্যময়ী ভ্রাতৃবধূ সাজিতেন। যদিও এই সব লীলা অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হইয়াছে, তবুও যেটুকু করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত। (এমন কি, সেই ননদ দেবররাই মার ব্যবহার দেখিয়া মাকে "দেবী" জ্ঞান করিয়াছেন)।

হাতের লেস ইত্যাদির ও কার্পেটের কাজ অতি সুন্দর; এখনও তাহা আমার কাছে আছে। মা চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারও করিয়াছেন। গৃহিণী অবস্থায়ই মা এই সব করিয়াছেন। যদিও মার গৃহিণী জীবন খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু এর মধ্যেই সব করিয়াছেন। আর একটা আশ্চর্যের বিষয়, মা সাধারণ গৃহস্থের বউ হইলেও, তাঁর আত্মীয়তা হইত বড় বড় লোকের পরিবারের সঙ্গে। মার অলোকসামান্য রূপ ও ভিতরের আকর্ষণী শক্তিই বোধ হয় ইহার কারণ। ভূদেব বাবুর পরিবারের সহিতই মার বিশেষ আত্মীয়তা। আবার ভূদেববাবুর পূর্বে যিনি ঐ পদে ছিলেন (তাঁহার নাম বাবু রাসবিহারী ঘোষ) তাঁর স্ত্রীও মাকে খুব স্নেহ করিতেন। মা তাঁহাকে 'মাসিমা' বলিয়া ডাকিতেন। এই রাসবিহারীবাবুর মেয়েই মার 'উষাদিদি'।

গৃহিণী বা আশ্রমবাসিনী—মায়ের সব লীলাই অপূর্ব্ব।

এইভাবে মার গার্হস্থ্য জীবন অল্পদিনের মধ্যে শেষ করিয়া, আবার যখন আশ্রমবাসিনী হইয়া "জগতের মা" ভাবে লীলা আরম্ভ করিলেন, তখন তাহাও অপূর্ব। ভোলানাথ যখন শাহবাগে চাকুরী করিতেন, তখন রায় বাহাদুর যোগেশবাবুর বাড়ীর কেহ আসিলে, মা তাঁহাদের বিশেষ ভাবে আদর যত্ন করিতেন। কারণ, তখন উক্ত যোগেশবাবু ভোলানাথের মালিক। আবার সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর মোহন্তের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিলে, মা তাহাদেরও বিশেষ সম্মান দেখাইতেন। কারণ, তাঁহারা জমিদার, প্রজার বাড়ী আসিয়াছেন। পরে যখন মা নিজে সব

কাজ পারিতেন না, তখনও আমাদের দিয়া মা উপরোক্ত কাজ করাইয়াছেন। রায় বাহাদুর যোগেশ ঘোষ মহাশয়ের যখন মার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছে, তখনও দেখিয়াছি, মা পূর্বেরই মত, তিনি বাগানে গেলেই ঘরের ভিতর চলিয়া যাইতেন; পরে যোগেশবাবু মাকে দেখিতে চাহিলে ভোলানাথ গিয়া মাকে বলিতেন। তখন মা ধীরে ধীরে মাথায় কাপড় দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন। পরে যোগেশবাবুদের ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মারও ব্যবহারের পরিবর্তন হইল। পরে খুবই খোলাভাবে মা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিতেন। তাঁহারাও মাকে গুরুর মতই শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। মার সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ ঠিক ঠিক সময়মত প্রকাশ হইয়াছে। এইজন্য মা বলেন, "তোমাদের ভাবানুযায়ীই আমার শরীরের পরিবর্তন আপনিই হইয়া যায়। এর মধ্যে আমার নিজের কোন ইচ্ছা বা কর্তৃত্ব নাই।" এইভাবে মা সব লীলাই সুচারুভাবে করিয়া গিয়াছেন। কোন ভূমিকাই অঙ্গহীন হয় নাই। যিনি পূর্ণ, তাঁর কোন কাজই অসম্পূর্ণ হইতে পারে না।

মা উপদেশ দিতেও অনেক সময়ই বলেন, "যখন যাহা করিবে, তাহা মনপ্রাণ দিয়াই করিবে। সে কাজ ছোটই হউক কি বড়ই হউক, তাহাতে যায় আসে না।" মার মুখেই শুনিয়াছি, তিনি পুস্তকাদি প্রায় কিছুই পড়েন নাই; লেখাপড়াও সামান্য জানিতেন; তা'ছাড়া ধর্মপুস্তক একটু শুনিলেই কেমন হইয়া যাইতেন। একবার অষ্টগ্রামে মাকে একটি ভদ্রলোক (মা তাহাকে ভাইয়ের মত দেখিতেন এবং তিনিও মাকে "রাঙ্গাদিদি" বলিয়া ডাকিতেন। রাঙ্গাদিদি নামটি মার সৌন্দর্য দেখিয়া অষ্টগ্রামে কাহারও কাহারও মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল) একখানা ধর্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইতে ছিলেন। একটু পরেই মার অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, মার কানে কিছুই যাইতেছে না। মা স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। তিনি তখন আস্তে

আস্তে বই নিয়া উঠিয়া গেলেন। আর কখনও তিনি বই পড়াইয়া শুনাইতে চেষ্টা করেন নাই।

মা একবার যাহাকে দেখিতেন কখনও তাহাকে ভুল হইত না। হয়ত বহু লোকের মধ্যে দেখিয়াছেন, কি দূরে একদিন রাস্তায় দেখিয়াছেন, পরিচয়ও নাই কিন্তু সেই লোক যদি বহু বৎসর পর মার কাছে আসিতেন, মা অমনি বলিয়া দিতেন রাস্তায় একদিন ইহাকে দেখিয়াছিলেন।

১৩৪৩ সনের অগ্রহায়ণ। (ডিসেম্বর, ১৯৩৬) মার আদেশে ঢাকা হইতে বিন্ধ্যাচল আসিবার সময় কলিকাতা হইয়া আসিলাম। কলিকাতায় অবলাদের কাছে দুইটি ঘটনার কথা শুনিলাম।

প্রথমটি এই ঃ— অবলার ভাসুর শ্রীযুত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি ২৭।২৮ বৎসরের পুত্র সম্প্রতি মারা যায়। সেই উপলক্ষ্যে, অবলা ও দীনেশবাবু, সতীশবাবুর বাসায় যায়। সতীশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে কাশীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন নাকি মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কয়টি ছেলে?" তিনি বলিয়াছিলেন, "মা আমার ৪টি ছেলে।" মা নাকি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ত দেখি ৩টি ছেলে।" সতীশবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "এতদিন পর আমার ছেলে মারা যাওয়ার পর, মার সেই কথা আমার মনে পড়িতেছে।"

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে দুইটি শুনা ঘটনা। প্রথমটি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই ঃ—অবলার একবার যমজ কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। একটি হওয়া মাত্রই মারা যায়; দ্বিতীয়টি জীবিত ছিল। ইহার পূর্বে অবলার আরও ২টি কন্যা জন্মিয়াছিল। কাজেই সে এই যমজ কন্যা হওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে কন্যার জন্ম পিতামাতার দুঃখেরই কারণ হয়। সেইভাবেই অবলা আঁতুর

দ্বিতীয়টি

ঘরে থাকিয়াই একদিন আশুর (অর্থাৎ তাহার পিসতুত ভ্রাতার) সহিত এই কন্যার মৃত্যুতেও সে দুঃখিত হইবে না, ইত্যাদি কথাবার্তা বলিয়াছিল। এই কথাবার্তার পরদিনই, মা গিয়া তাহার আঁতুড় ঘরেই উপস্থিত। হঠাৎ হাসিতে হাসিতে বলিয়া ফেলিলেন, "কি, তুই বুঝি এই কন্যার মৃত্যু কামনা করিতেছিস্? যদি এই মেয়ে ১০ মাসের হইয়া মারা যায়, কি করিবি?" অবলা বলিল, "মা ৩।৪টি মেয়ে হইল। তাই বড় বিরক্ত লাগিতেছিল।" কিন্তু সে আশ্চর্য হইল যে, গতকল্য যে মেয়ের মৃত্যু হইলেও সে দুঃখিত হইবে না ইত্যাদি কথা ভ্রাতা আশুর সহিত বলাবলি করিতেছিল, মা তাহা কি করিয়া জানিলেন? আসল কথা এই যে, সত্যিই সেই মেয়ে ১০ মাসের হইয়াই মারা গেল। মায়ের দৃষ্টি ত ভবিষ্যতের অন্ধকারে বাধা পায় না। তাই অমূল্যবাবু বলেন, "মা আমার শুধু অন্তর্যামিনী নন, তিনি আবার বিশ্বতশ্চক্ষু।"

অমূল্যদাদার স্ত্রীকে অজানা বিশেষ কৃপা।

মা যখন ১৩৪৩ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা যান, সেবার যেদিন মা ঢাকা হইতে পারুলদিয়া রওনা হইলেন, সেই দিন অমূল্যদাদার স্ত্রীকে বিশেষ কৃপা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সেই ঘটনা অপরের নিকট বলা নিষেধ। অমূল্যদাদা বলেন "মার কৃপার সীমা নাই। মা আমার বংশ উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

অষ্টাচত্বারিংশৎ অধ্যায়

১৩৪৩ সন, ৭ই অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর, ১৯৩৬)। মার আদেশ মত ২৯শে কার্তিক (১৪ই নভেম্বর) রবিবার অন্নকূট হইয়া যাওয়ার পরই, ৩০শে কার্তিক (১৫ই নভেম্বর) সোমবার আমি কলিকাতা রওনা হইয়া আসিয়াছি। তথায় ৪।৫ দিন থাকিয়া ৺কাশীধাম আসিয়াছি। বাবাও মার আদেশ মত আগ্রার "শ্যামকুটীর" আশ্রমে ৩ দিন থাকিয়া আজ ৺কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি মার পূর্ব আদেশানুযায়ী ৺বিন্ধ্যাচলের যজ্ঞশালার কিছু কার্যোপলক্ষে, কিছুদিনের জন্য ৺বিন্ধ্যাচল যাইতেছেন।

ভ্রমরের নিকট মাণিকের পত্রে মায়ের অসুখের সংবাদ প্রাপ্তি।

কলিকাতায় ভ্রমরের নিকট মাণিকের পত্র আসিয়াছে, দেখিলাম। তাহাতে জানিলাম, মার খুব জ্বর হইয়াছিল, এবং এটোয়াতে একবার খুব পেট খারাপ হইয়াছিল। মা নৈনিতাল হইতে বেরিলি আসিয়া মাণিককে খবর দেন। মাণিক বেরিলি যাইয়া মার সহিত মিলিত হয়। ১০।১২ দিন সে মায়ের সঙ্গেই ছিল। বেরিলিতে মহারতন মাকে দর্শন করিতে পারিয়াছেন। তথা হইতে মা মাণিককে নিয়াই আগ্রা যান। মাণিকের নিকট আরও খবর পাওয়া গেল, মাসখানেক পর আবার তাহার সহিত মার দেখা হইবে বলিয়া সে আশা করে। সে মাকে গড় মুক্তেশ্বর রাখিয়াই লক্ষ্ণৌ ফিরিয়া গিয়াছে। ৺মহা অষ্টমী ও ৺মহা নবমীর দিন বীরেনদাদা মাকে কাছে পাইয়া মাকে প্রাণ ভরিয়া পুষ্পবিল্বপত্রে পূজা করিয়াছেন।

ঐ অসুখ সম্বন্ধীয় ভ্রমরের তৎকালে দুইটি স্বপ্ন-দর্শন।

স্থানান্তরে ইহা লেখা হইয়াছে। আর একটি বিশেষ ঘটনা এই, যে মার যখন জ্বর, সেই সময়েই ভ্রমর ২ দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। প্রথম দিন দেখিতেছে, যেন মার জ্বর। মা বলিতেছেন, 'আজ খুকুনীর আলুসিদ্ধ ভাত খাইয়াছি' (সত্যিই

আমি সেই সময়টা আলুসিদ্ধ ভাতই প্রত্যহ পাক করিয়া ভোগ দিয়া খাইতাম)। পরদিন আবার স্বপ্ন দেখিতেছি। মা যেন বলিতেছেন, "তুমি /৩ সের দুধ খাও, তবেই আমি ভাল হইব।" সত্যিই ভ্রমর /৩ সের দুধ খাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু /২॥ সের খাইয়া আর পারে নাই। পরে আবার একদিন /৫০ পোয়া দুধ খাইয়াছে। সে মোটেই দুধ খাইতে পারে না। কিন্তু একদিন এত দুধ খাইয়াও তাহার কিছুই অসুখ করিল না। সে জ্যোতিষদাদাকেও এই স্বপ্নের বিষয় জানাইয়া, কি করিবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। জ্যোতিষদাদাও তাহাকে স্বপ্নানুযায়ী কাজই করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এবার কলিকাতায় থাকা কালীন সকলে মিলিয়া একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত যতীশ গুহের বাসায় বসিয়া মার সম্বন্ধে আলাপ হইত। একদিন কথায় কথায় নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার কথা শ্রীযুক্ত যতীশদাদা ও শ্রীযুক্ত প্রাণকুমারবাবু বলিলেন যদিও এসব ঘটনার সময় আমরাও মার সাথে ছিলাম, কিন্তু ঘটনাগুলি ভাল মনে ছিল না। মা ১৩৩৮ সনে (১৯৩১) যেবার প্রাণকুমারবাবুর বাসায় চুঁচুঁড়া যান, সেবার মা সকলকে নিয়া চুঁচুঁড়াতে গঙ্গায় স্নান করিলেন। প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রী ৮।৯ বৎসর যাবৎ বাতে আক্রান্ত হওয়ায় প্রায় অবশ অবস্থায় ছিলেন। অপরের সাহায্য ছাড়া হাঁটিতেই পারিতেন না। এই অবস্থায় মা গঙ্গার ভিতর তাঁহাকে কোলে নেন এবং রোজই রেলিং ধরিয়া অল্প অল্প হাঁটিতে উপদেশ দেন। সেই দিনই স্নানের পর, সকলে মার চরণামৃত নিতে আরম্ভ করায়, মা গঙ্গা হইতে উঠিয়াই গঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে চরণামৃত রাখিয়া গেলাম এখান হইতেই সকলে নেও।"

চুঁচুঁড়াতে গঙ্গাস্নান।

আর একটি ঘটনা—চুঁচুঁড়াতে প্রাণকুমার বাবুর বাসায় মা গিয়াছেন। সঙ্গে যতীশ গুহ মহাশয়েরাও সপরিবারে গিয়াছেন। খুব আনন্দ চলিতেছে।

হঠাৎ একদিন মানির (যতীশ গুহের ভগ্নী) গহনা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক গহনা কাজেই সকলেই ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রাণকুমারবাবু পুলিশ আনাইবেন। ইতি মধ্যে বাবা (অখণ্ডানন্দ স্বামী) বলিলেন, "গহনা চুরির কথা মার কানে দিয়াছ?" সকলেই বলিলেন, "না, মার কাছে বলা হয় নাই।" বাবা বলিলেন, "একবার মার কাছেও একথা জানাও।" তখনই সকলে গিয়া মার কাছে জানাইলেন। মা বলিলেন, "কোথায় যাইবে?" বিছানায়ই আছে। ভাল করিয়া দেখ গিয়া।" সকলেই তখন আবার বিছানা দেখিতে গেল। এবার গিয়াই বিছানার মধ্যেই গহনা পাওয়া গেল। অথচ, এই বিছানা পূর্বে অনেক বার ঝাড়িয়া দেখা হইয়াছিল।

চুঁচুঁড়াতে গহনা চুরি

আর একটি ঘটনা— জামসেদপুর হইতে অনিল কুমার বসু মহাশয় আসিয়াছেন। ইনিও মার খুব ভক্ত। চুঁচুঁড়াতে যখন মা যান, তখন ইনিও সস্ত্রীক তথায় ছিলেন। মা যখন চুঁচুঁড়া হইতে নবদ্বীপ যান, তখন অনিল বাবুর স্ত্রী (প্রাণকুমারবাবুর ভাগিনেয়ী) মার সহিত যাইবার জন্য খুব ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মা অনিলবাবুকে সেকথা বলিলেন। অনিল বাবু বলিলেন, "মা, কি করি? আর ত ছুটি নাই।" মা বলিলেন, "আরও ১৫ দিনের ছুটি নিতে পার না?" তিনি বলিলেন, "তাহা সম্ভব নয়।" এরপর মা আমাদের নিয়া নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। অনিলবাবু জামসেদপুর চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইতেই তাহাকে সকলে বলিল, "একি? তুমি না ১৫ দিনের ছুটির জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছ? আবার এখনই চলিয়া আসিলে যে? এর কারণ কি?" অনিলবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। কারণ, তিনি ত ছুটির জন্য টেলিগ্রাম করেন নাই। এ ঘটনাটি তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

অনিলবাবুর ছুটির টেলিগ্রাম

চুঁচুঁড়া হইতে সকলে মিলিয়া (যতীশ গুহদের সমস্ত পরিবার মার

সঙ্গেই আসিয়াছিলেন) নবদ্বীপ যাওয়া হয়। মা প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীকেও এই সঙ্গে নিয়া গেলেন। নবদ্বীপে গিয়া মা সকলকে নিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। কোনও কারণে প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রী স্নানে যাইতে পারিলেন না, তিনি একাই বাসায় রহিলেন। ইহাতে অনেকেরই মন খারাপ হইল। তাঁর জামাতা শ্রীযুক্ত যতীশ পুনঃ পুনঃ এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করায়, প্রাণকুমারবাবুর বড় ছেলে টুনু গিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে বলিল, "মা আমার মাকে নিয়া আসি?" মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, নিয়া আস গিয়া।" তখনই টুনু গিয়া তার মাকে স্নানের ঘাটে নিয়া আসিল। সকলকে লইয়া মা সুরধুনীর জলে স্নান করিলেন। সকলেই আনন্দে ভরপুর। শিশুকে যেমন প্রথম প্রথম হাঁটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপে টুনুর মাকে জলে নামাইয়া মা তাঁহাকে হাঁটাইতে লাগিলেন। কখনও হাত ধরিয়া, কখনও ছাড়িয়া দিয়া, একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া, আসিতে বলিতেছেন। এই ভাবে জলের মধ্যে অনেকক্ষণ হাঁটাইলেন, পরে উঠিয়া আসিলেন। টুনু ও প্রাণকুমারবাবু বলিলেন, নবদ্বীপে ২ দিন থাকিয়া, চুঁচুঁড়াতে ফিরিয়া গিয়াই, ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে ৭ দিনের মধ্যেই নাকি টুনুর মা বেশ ভালভাবে হাঁটিতে পারিয়াছিলেন।

সুরধুনীতে শ্রীশ্রীমার অপূর্বলীলা ও টুনুর মার আশ্চর্য রোগমুক্তি।

ইহার কিছুদিন পর, একবার রেবতী সেন মহাশয় কলিকাতা বোবাদের স্কুলে, বোবাদের অভিনয় দেখাইতে মাকে নিয়া যান। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। সেই দিনই চুঁচুঁড়া হইতে প্রাণকুমার বাবুও সপরিবারে আসিয়া তথায় যান। তখনই আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, যে টুনুর মা এতকাল পর বেশ স্বাভাবিকভাবে হাঁটিতে পারিতেছেন।

পাবনাতে একবার শ্রীযুক্ত প্রাণকুমারবাবুর আহ্বানে মা তাঁহার বাসায়

যান। তখনকার একটি ঘটনা এইঃ— মার গমনে তথায় খুবই আনন্দ উৎসব চলিতেছে। বাসায় লোকে লোকারণ্য। দিন রাত্রি প্রায় একভাবেই লোকের ভিড় চলিতেছে। মা একদিন হঠাৎ সামনের একটি মাঠে গিয়া কি যেন খুঁজিতেছেন, এই ভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম "মা তুমি কি খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছ?" মা বলিলেন, "রাখ, আমি সাপের খোঁজ করিতেছি।" কিন্তু তখন কোন সাপ দেখা গেল না। অথচ মা যখনই সাপের কথা উঠাইতেন, তাহার ২।১ দিনের মধ্যেই সাপ দেখা যাইত। মা এই কথা বলিয়া, কিছুক্ষণ পর বাসায় চলিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর প্রাণকুমারবাবুর চাকর মার খাবার জল আনিতে পুকুরে গিয়াছে। গিয়াই দেখে, দুইটি সাপ। সে ভয়ে উঠিয়া আসিয়া আরও একটি লোককে ডাকিয়া নিয়া গেল। সে যাইয়া দেখে, কলসীর দুই দিকে দুইটি সাপ মাথা উঁচু করিয়া আছে। একটু তাড়া করিতেই সাপ দুইটি চলিয়া গেল। পরে চাকরটি বাসায় আসিয়া একথা বলায় মার কানে ও কথা উঠিল। মা তখন হাসিতে লাগিলেন।

পাবনাতে সাপের খোঁজ।

আর একটি ঘটনা— একবার মা সালকিয়াতে পিসীমার বাসাতে আছেন। সেখান হইতে একদিনের জন্য শ্রীরামপুর গোবর্ধনদের বাড়ী গিয়া একদিন থাকিয়া সালকিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। মার তখন শরীরে খুব জ্বর; বোধ হয় ১০২।৩ ডিগ্রী হইবে। সেখানে বাবা ভোলানাথ, যতীশ গুহ মহাশয়ের ভ্রাতা নীতীশকে বলিলেন, "তোরা নাকি আমাদিগকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়া যাবি।" নীতীশ বলিল, "আমরা নিব কে বলিল? তবে আপনারা নাকি যাইবেন? আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাইব।" ভোলানাথ বলিলেন, "কেন, সকলেইত বলে, যে যতীশ সকলকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইবে।" তখন নীতীশ বলে, "বেশত, আপনারা যদি যান, তবে একদিন যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।" ইহার উত্তরে ভোলানাথ বলেন,

"তবে কালই চল।" মাও বলিলেন, "বেশত চল না।"

তখন নীতীশ মাকে বলে, "না, কাল না যাইয়া কয়েকদিন পরে গেলেই হয়। কেননা, তোমার আজকাল শরীরটা অসুস্থ। একটু ভাল হইলেই বেশ যাওয়া যাইবে।" প্রকৃত কথা এই যে, নীতীশ জানিত, যে ঐ সময়ে তাহার দাদাদের (অর্থাৎ যতীশ গুহ ও ক্ষিতীশ গুহ) হাতে টাকা পয়সা বিশেষ কিছুই নাই এবং খুবই টানাটানিতে সংসার খরচা চলিতেছে। অথচ ৺দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইলে কিছু খরচার আবশ্যক। কাজেই পাটোয়ারী বুদ্ধিতেই নীতীশ মার অসুখ থাকার অজুহাত দেখাইয়া, কয়েকদিন পরে ৺দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু মা সমস্তই বুঝিয়া বোধ হয় শিক্ষা দিবার জন্যই নীতীশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হইব, কালই চল—হইয়া যাইব।"

ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে শ্রীশ্রীমার ৺দক্ষিনেশ্বর গমন।

তখন ভোলানাথ নীতীশকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র শীঘ্র কলিকাতা যাও এবং তোমার দাদাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেল—আগামীকল্য সালকিয়া ঘাট হইতে আমাদের সবাইকে তুলিয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা কর।" নীতীশ খুবই চিন্তিতমনে কিছু পরেই কলিকাতা রওনা হইয়া যায়। রওনা হইবার পূর্বে মার চরণে প্রণাম করিবার সময়ে মনে মনে প্রার্থনা জানাইয়াছিল, যেন সমস্তই সুব্যবস্থা হয়। মা নীতীশের দিকে তাকাইয়া অতি করুণ দৃষ্টিতে বলিলেন, "হইব, হইয়া যাইব, কালই চল।" রাত্রি প্রায় ৮ টার সময়ে নীতীশ তাহাদের ভবানীপুরের বাসায় পৌঁছায় এবং তাহার দাদাদের সমস্ত বিষয় জানায়। যতীশ গুহ নাকি নীতীশের কথা শুনিয়াই তাহাকে মন্দ বলিল এবং সালকিয়াতে ফোন করিয়া ৺দক্ষিনেশ্বরে যাওয়ার দিন পরিবর্তন করা যায় কি না, সেই বিষয়ে প্রস্তাব করাতে, ক্ষিতীশ গুহ বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাক না 'মা

যখন, 'হইয়া যাইব' বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে।' তখন বাক্সপেঁটারা খোঁজাখুঁজি করিয়া, তিন ভ্রাতা ও তাহাদের মা মোট পাঁচটি টাকা পাইলেন এবং ভাঁড়ার হইতে মোট নয় সের আন্দাজ ডাল ও ছয় সের আন্দাজ চাউল পাইলেন।

তিন ভাই ও তাহাদের মা এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন ব্রহ্মচারী মহাশয় (মা যাঁহাকে আদর করিয়া খোকন লালা নাম দিয়াছেন) সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি একটু উপরে আসিতে পারি?" বলিতে বলিতে উপরে আসিয়া, তিনি বলিলেন, "আমি নীচ হইতে আপনাদের সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়াছি। আপনারা এত ভাবছেন কেন? মা যখন কালই যাওয়ার কথা বলিতেছেন, তখন আর কোনও ভাবিবার কারণ নাই। আমি আমার ভাইয়ের দোকান হইতে কিছু ঘৃত লইয়া কাল সকালেই এখানে আসিব এবং আপনাদের চাউল ডাল লইয়া যাইব ও আমি পূর্বেই দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ভোগাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করিব।" ক্ষিতীশ গুহের একখানি পুরাতন মোটর গাড়ী তখন ছিল। উক্ত গাড়ীতেই দুই তিন দফায় তাহাদের বাড়ীর সমস্ত পরিবারদের বড়বাজার ঘাটে পৌঁছান যাইবে, এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। এবং দুই চারি টাকা আটক পড়িলে কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লইবে এইরূপ মনস্থ করিল।

তৎপরদিবস উক্ত যতীশ গুহদের একজন জ্ঞাতির মৃতাশৌচ অন্ত হয়। অতি প্রত্যুষেই ধোপা নাপিত প্রভৃতি সকলেই হাজির হইয়া যাহার যাহার করণীয় কার্য সব সম্পন্ন করিল। সমস্ত বাড়ী ধৌত আদি কার্যও অতি প্রত্যুষেই শেষ হইয়াছিল। উক্ত জ্ঞান ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার কথামত আসিয়া চাউল ডাল লইলেন এবং তরকারির জন্য উক্ত পাঁচটি টাকা হইতে তাহাকে একটি টাকাও দেওয়া হইল। তিনি যথাসময়ে

ঁদক্ষিণেশ্বরে রওনা হইলেন।

কিন্তু ৭টার সময়ে মোটর আসিবার কথা; ৮টা বাজিয়া যায় মোটরের দেখা নাই। তখন যতীশ গুহ ও ক্ষিতীশ গুহ তাহাদের মা, মাসিমা ইত্যাদি ৪।৫ জনকে লইয়া বাসে করিয়া বড়বাজার ঘাট রওনা হইল; ইহাতেই প্রায় এক টাকার মত খরচা হইয়া গেল। বড়বাজার ঘাটে উহাদের স্নানাদি কার্য সব শেষ করিয়া নিতে বলিয়া, উক্ত দুই ভ্রাতা নৌকা আকর্ষণে চেষ্টিত হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন দেখিল যে কোন নৌকাই ৮ টাকার কমে ঁদক্ষিণেশ্বরে যাইতে স্বীকৃত নহে, এবং ১৬ জনের অধিক লোক কোন নৌকাতেই লইবে না, তখন দুই ভ্রাতা ভাবনায় আকুল হইয়া পড়িলেন। বড়বাজার হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রায় আহিরিটোলা ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। কিন্তু সর্বত্রই একই উত্তর পাইতেছে। অগত্যা হতাশ হইয়া দুইভাই যখন ঁগঙ্গার পার দিয়া ফিরিতেছেন, তখন তাহারা শুনিতে পাইল, যে তাহাদের কে ডাকিতেছে। ঁগঙ্গার দিকে যাইয়া দেখে, যে দুইখানি নূতন নৌকা পারের দিকে আসিতেছে, এবং উহারই মাঝিরা উক্ত ভ্রাতাদের ডাকিতেছে। মাঝিরা উপরে উঠিয়াই উহাদের বলিল "বাবু, আপনারা ভাড়া যাবেন ত আমাদের নৌকায় চলুন।" যতীশ গুহ ঁদক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা এবং বেশী ভাড়া দিতে পারিব না বলায়, মাঝিরা বলিল, "বাবু আজ নূতন নৌকা বাহির করিয়াছি। কোনও ভাড়ার কথা আমরা বলিব না। আপনারা যাহা দিবেন তাহাই লইব।"

তখন দুই ভাই বলাবলি করিতেছে, যে তাহাদের সঙ্গে অতি সামান্য টাকা আছে, এমতাবস্থায় দুইখানা নৌকাই নেওয়া সঙ্গত কিনা। ইহাতে মাঝিরা বলিল, "বাবু, আমরা খুড়া ভাইপো—আজ প্রথম নৌকা বাহির করিয়াছি— আপনারা যাহা দিবেন, তাহাতেই আমরা রাজি। চলুন আর বিলম্ব করিবেন না।" উক্ত ভ্রাতারা দেখিল, যেন মাঝিদেরই গরজ বেশী।

তখন উহাদের আনন্দের আর সীমা নাই। মার অপার করুণার নিদর্শন উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণোদ্দেশে কোটি কোটি প্রণতি জানাইয়া, উহারা পরিবারবর্গসহ নৌকায় অপর পারে সালকিয়া ঘাট হইতে মা ও আমাদের সকলকে উঠাইয়া লইলেন, এবং এইভাবে সকলে মিলিয়া ঁদক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করা হইল।

ঁগঙ্গার বক্ষে ভক্তসঙ্গে মা চলিয়াছেন। ভক্তেরা খোল করতাল নিয়া কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। সে আনন্দ বর্ণনাতীত। মার খুব জ্বর; কিন্তু আনন্দময়ীর মূর্তি সর্বদাই আনন্দে ভরপুর। কেহ ঁচন্ডীর স্তব পড়িতেছে, কেহ রাধাগোবিন্দ নামের কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মা একখানা আলোয়ান গায় দিয়া বসিয়া আছেন। প্রায় ১১॥ টার সময় ঁদক্ষিণেশ্বরের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল।

ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীশ্রীমা। অপূর্ব আনন্দ।

মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। সকলেই মার পদচিহ্নে হাত দিয়া তাহা মাথায় ও বুকে লাগাইতে লাগিলেন। ঁকালীমাতার মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঁমদনমোহনের মন্দিরে আরতি হইল। সকলে গিয়া মাকে নিয়া নাট মন্দিরে বসিলেন। তখন অনেকেই কীর্তনের পূর্বে ঁগঙ্গাস্নান সারিয়া আসিবার জন্য স্নান করিতে চলিলেন। মা বলিলেন, "আমি স্নান করিব না?" যতীশদাদার মা বলিলেন, 'মা তোমার জ্বর, তুমি স্নান করিবা না; তুমি এখানে বস, আমরা স্নান করিয়া আসিতেছি।" তাঁহারা সকলে স্নান করিয়া আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন, এর মধ্যেই ভক্তদের গোলমাল শুনিয়া পিছন ফিরিয়া দেখেন, মা মহা আনন্দে ঁগঙ্গার দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। আসিয়াই ঁগঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে ঝাঁপাইয়া

ঁদক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা।

ঁদক্ষিণেশ্বরে ঁগঙ্গায় জলক্রীড়া।

পড়িল। কিছুক্ষণ পর মা উঠিলেন। আবার গিয়া নাট মন্দিরে বসিলেন। ভক্তেরা মার মাথা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। কীর্তন আরম্ভ হইল। বহুলোক একত্র হইল।

কিছুক্ষণ পরে ভোগের যোগাড় হইয়াছে। খবর পাইয়া ভক্তেরা মাকে ও ভোলানাথকে নিয়া ভোগ দিলেন। পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন।

স্বল্প আয়োজনে বহুলোকের প্রসাদ প্রাপ্তি।

প্রায় ৮২।৮৩ জন লোক প্রসাদ পাইল, কিন্তু চাউল, ডাল মাত্র ১৫ সের দেওয়া হইয়াছিল। এত ভক্তেরা প্রসাদ নেওয়ার পরও বালতি ভরা খিচুরি রহিয়াছে দেখিয়া, সকলেই একটু আশ্চর্য হইলেন। ভোগের পর আবার নাট মন্দিরে মাকে নিয়া বসিয়া ভক্তেরা কীর্তনাদি করিলেন। মার একটু ভাবের পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল।

অত্যাশ্চর্য উৎসব-ব্যয় সঙ্কুলান

বেলা শেষে সকলে উঠিয়া মাকে নিয়া বাসায় ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন কেহ কেহ এই উৎসবে কিছু কিছু দিতে চাহিলেন। যতীশ গুহ মহাশয় বলিলেন, আশ্চর্যের বিষয়, সকলে মিলিয়া যাহা দিলেন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, নৌকা ভাড়া যে কয় টাকা কম পড়িয়াছিল, তাহাই পাওয়া গিয়াছে; একটি পয়সা বেশী বা কম নয়। সকলে ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য হইলেন। যতীশদাদারা বুঝিলেন, এই জন্যই মা আসিবার সময় বলিয়াছিলেন "হইয়া যাইব।" সকলে আবার ফিরিয়া নৌকায় চলিয়াছেন; মা নৌকায় উঠিয়াই শুইয়া পড়িলেন। সেইদিন শুক্লা দশমী; ঁজগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের দিন ছিল। কীর্তন করিতে করিতে মাকে নিয়া ভক্তেরা বাসায় ফিরিলেন। মা আমাদের নিয়া সালকিয়া গেলেন। আর আর সকলে যে যার বাসায় চলিয়া গেল। স্নানের পর হইতে মার জ্বর ছাড়িয়া গেল।

ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ সন, (২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৬) ৺কাশীধাম। ৺কাশী আসিয়া নেপাল দাদার নিকট শুনিলাম, তাঁর এক বন্ধু মাকে সম্প্রতি সুলতানপুরে দেখিয়া আসিয়াছেন। সুলতানপুরে সারদা শর্মার বোন রমা, লেডি ডাক্তার। তাহার বাসার নিকটেই একটি মন্দিরে মা ছিলেন। আর কোন খবর নাই। এই সময়ে, একদিন ৺তারাপীঠ হইতে মার টেলিগ্রাম পাইয়া আমরা ৺তারাপীঠ চলিয়া গেলাম।

১৩৪৩ সনের শ্রাবণ (জুলাই, ১৯৩৬) মাসে মা বিরাজ দিদিকে নিয়া অজ্ঞাতবাসে বাহির হন। সেই ঘটনা ৺তারাপীঠ গিয়া বিরাজ দিদির মুখে শুনিলাম। তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি।

শ্রীশ্রীমার শ্রীরামপুর হইতে অজ্ঞাতবাসে বাহির হইবার সঠিক বৃত্তান্ত।

১৮ই শ্রাবণ সোমবার (৩রা আগস্ট) দুপুরবেলা মা শ্রীরামপুর পৌঁছিলেন। মা গিয়া ৺গৌরাঙ্গ মন্দিরে উঠিলেন। এবং ভক্তেরা সকলে তথায় সমবেত হইলেন। মা বলিয়া দিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্বেই কলিকাতার ভক্তদের ভোলানাথের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। বৈকালে মা ৺গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেলেন। পরে মা প্রকাশ করিয়াছেন, যে তথায় গিয়াই নাকি মা ৺জগন্নাথের মূর্তি দেখিতে পাইলেন এবং সেই হইতেই মা ৺পুরী যাওয়া ঠিক করিলেন। অবশ্য এ কথা আর কেউ তখন জানে না। মা কলিকাতা হইতে এক বস্ত্রে বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিগুণাবাবু মাকে একখানি কাপড় দেওয়ায়, মা পরিহিত কাপড়খানি ছাড়িয়া তাহাকে দিয়া দিলেন। শ্রীরামপুর হইতে রাত্রির গাড়ীতে মা খড়্গপুরের টিকিট কিনিয়া রওনা হইলেন। ত্রিগুণাবাবু মাকে একখানি কম্বল ও আরও একখানি কাপড় লুকাইয়া বিরাজ দিদির কাছে

দিয়া দিলেন। শ্রীরামপুর ষ্টেশনে একটি লোক একখানি ভাল শাড়ী, কিছু সন্দেশ ও সিন্দুর মাকে দিলেন। সন্দেশ তখনই বিলি হইয়া গেল। শাড়ীখানি বিরাজদিদি সঙ্গে নিলেন।

শ্রীরামপুর হইতে খড়্গাপুর গিয়া ঁপুরী যাওয়ার গাড়ী না পাওয়ায় একখানি ঘর ভাড়া করিয়া এক বেলা তথায় রহিলেন। পরে ঁপুরী রওনা হইলেন। পুরী যাইয়া গোয়েঙ্কার ধর্মশালায় উঠিলেন। ঘর না পাইয়া বারান্দায় রহিলেন।

শ্রীরামপুর হইতে ঁপুরীধাম।

উক্ত ধর্মশালাগুলিতে পার্শ্বেরই একটী ঘরে একটী উড়িষ্যাবাসী যাত্রী সপরিবারে ছিল। সেই ঘরেই বিরাজদিদি কাপড় ও কম্বল রাখিয়া দর্শনে বাহির হইলেন। মা নাকি ধর্মশালায় গিয়াই বলিয়াছিলেন, "এই ভাল শাড়ী খানা উহাদের (উড়িষ্যাবাসী যাত্রীদের) দিয়া আমি উহাদের নিকট হইতে একখানি কাপড় নিব।" একথা কমল ছাড়া আর কেহ জানে না। দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, বিরাজদিদি ঐ যাত্রীদের ঘর হইতে কাপড়, কম্বল যখন আনিতে গেলেন, তখন ঐ যাত্রীরা নিজেরাই বলিল, "এই শাড়ীখানা বিক্রি করিবে? এখানার দাম কত?" বিরাজদিদি বলিলেন, "আমি দাম জানি না; এক ভক্ত মাকে দিয়াছে। আমি বিক্রি করিব না।" তখন ঐ যাত্রীরা বলিল, "মা ত সরু পাড়ের কাপড় পরেন। এই শাড়ী ত মা পরিবেন না।" এই সব কথা বিরাজদিদি মাকে বলায়, মা হাসিয়া যাত্রীদের ডাকিতে বলিলেন। এবং মা তখন তাহাদের ঐ শাড়ীখানি নিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা দাম না দিয়া শাড়ী নিতে কিছুতেই রাজি হইল না। এই নিয়া মার সহিত তাহাদের অনেকক্ষণ কথা হইল। মা ঐ যাত্রীদের বাপ মা ডাকিয়া অনেক করিয়া মিষ্ট ভাষায় ভুলাইয়া কাপড়খানি নিতে রাজি করাইলেন। তাহারা শাড়ী নিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার আসিয়া মাকে

ঁপুরীধামে একটি ঘটনা।

একখানি সরু পাড়ের কাপড় কিনিয়া দিতে চাহিল। মা অনেকবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু শেষে তাহাদের বিশেষ অনুরোধে রাজি হইলেন। তাহারা মাকে একখানি সরু পাড়ের কাপড় আনিয়া দিল। মা প্রথম আসিয়াই যাহা কমলকে গোপনে বলিয়াছিলেন, তাহাই পূর্ণ হইল।

বৈকালে মা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বাহির হইলেন। একটি বৈষ্ণব ছেলে হঠাৎ মাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনাকে শাহবাগে দেখিয়াছি আপনি শাহবাগের মা না?" এই বলিয়া সে চলিয়া গিয়া ঁবিজয় গোস্বামীর আশ্রমে মাখনবাবুকে খবর দেয়। মা সমুদ্রের ধারে ছিলেন, মাখনবাবু ধর্মশালায় গিয়া মার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। মা যখন সমুদ্রের ধার হইতে ধর্মশালায় ফিরিয়া গিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে ছিলেন, তখন হঠাৎ নাকি বলিয়া উঠিলেন, "মাখন বাবু লণ্ঠন হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতেছি।" এই কথার কিছু পরেই সত্যই একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া, মাখনবাবু মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে হঠাৎ পাইয়া তিনি মহা আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ মার সহিত বাক্যালাপ করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

ঁপুরীধামে দ্বিতীয় একটি ঘটনা।

পর দিন সকালে সমুদ্রের ধারে মা বেড়াইতে ছিলেন। তখনও ঁনবদ্বীপের একটি ছেলের সহিত দেখা হইল। সে ঁনবদ্বীপে মাকে দেখিয়াছে। মাকে নিয়া সে অনেক জায়গা ঘুরিয়া বেড়াইল। বৈকালে মাখনবাবু মাকে নিয়া শ্যামদাস বাবাজীর নিকট গেলেন এবং আনন্দবাজার প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়াইলেন এবং ধর্মশালায় নানারূপ প্রসাদ কিনিয়া আনিয়া মাকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া দিলেন এবং মাও সকলকে খাওয়াইয়া দিলেন।

ঁপুরীধামে শ্রীশ্রীমার শ্যামদাস বাবাজীর কুটীরে অযাচিত দর্শন দান।

সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে মা ঁভুবনেশ্বর রওনা হইলেন। ঁভুবনেশ্বর গিয়া ধর্মশালায় ছিলেন। পরদিন সকালে নানা স্থানে ঘুরিয়া দুপুর বেলা ধর্মশালায় ফিরিলেন। খবর পাইয়া দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া মার সহিত দেখা করিলেন। মার সহিত প্রায় দুই ঘন্টা বাক্যালাপ করিলেন এবং গান করিয়া মাকে শুনাইলেন। সেই দিনই বৈকালে মা ঁভুবনেশ্বর হইতে রওনা হইয়া গোমো, আদ্রা প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া, আগ্রা পৌঁছিলেন। তথায় একদিন থাকিয়া, শ্যামকুটীর ঘুরিয়া আসিয়া, মোটরে ঁমথুরা গেলেন। ঁমথুরা গিয়া এক ধর্মশালায় তিন দিন থাকিলেন। তথায়ও ভক্তেরা কেহ খবর পাইল না। তিন দিনের বেশী ধর্মশালায় থাকিতে দিবে না, তাই মা বাহির হইয়া পড়িলেন। কমলকে সেখান হইতেই কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। কমল অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু মা বুঝাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কমলের সঙ্গে সঙ্গেই মাও স্টেশনে বেড়াইতে গেলেন। তথা হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম ঘাটে গিয়া বসিলেন। সে দিন মার ফল খাওয়ার দিন। সঙ্গে কিছুই নাই। যাহা সামান্য বাসনপত্র বিরাজদিদি ঁপুরীতে কিনিয়াছিলেন, সবই মা কমলের সঙ্গে দিয়াছিলেন। কম্বলখানি কাটিয়া এক টুকরা রাখিয়া কমলকে দিয়াছিলেন। একটি ঘটি ও কম্বলের টুকরা ও একখানি কাপড় ছাড়া মার সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। বিরাজদিদির সঙ্গে এক কম্বল ও দুই খানি কাপড় ছিল। সঙ্গে তখন সামান্য কিছু টাকা ছিল। কিছু ফল কিনিয়া ঐ ঘাটে বসিয়াই বিরাজদিদি মাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া চারিদিকে বহু লোক দাঁড়াইয়া গেল। মার এই রুক্ষ চুল ও অপরের হাতে খাওয়া

ঁপুরীধাম হইতে ঁভুবনেশ্বরে।

গুপ্তভাবে অন্যান্য স্থানে গমন এবং পরে ঁমথুরায়।

ঁমথুরা হইতে কমলকে বিদায়। কেবলমাত্র বিরাজমোহিনী দিদি মার সঙ্গে।

দেখিয়া পাগল ভাবিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। মাও তাহাদের সহিত হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক নাই। রাস্তার ধারে এক একটি স্থান দেখাইয়া বিরাজদিদিকে মা বলিতেছেন, "এখানে থাকিতে পারিবে?" এর মধ্যেই কাশ্মীরী এক ভক্ত মহিলা মাকে দেখিয়া, মহা আনন্দের সহিত আসিয়া, মার চরণ বন্দনা করিলেন। এবং মার দর্শনে নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মা কাহারও বাড়ী যাইবেন না। তখন তিনি বলিলেন, "এই বিশ্রামঘাটেই আমাদের এক মন্দির আছে, সেখানে চলুন।" মাকে তথায় নিয়া গিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; এবং মার ভোগের দুধ ফল সব নিয়া আসিলেন। পরদিন রুটি তরকারী তিনিই তৈয়ার করিয়া মাকে আনিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। খাওয়াইতে বসিয়াছেন, এর মধ্যে শিবনারায়ণ পণ্ডিত (কাশ্মীরী) নামে একটি লোক আসিয়া, মাকে দর্শন করিয়া, মহা আনন্দিত হইলেন। এবং বলিলেন "আমি আপনাকে একবার দেখিয়া, অনেক ধর্মশালায় খোঁজ করিয়াছি কিন্তু পাই নাই। এখন আপনি আমার সঙ্গে আমার একটি মন্দির আছে, তথায় চলুন; তথায় কোন অসুবিধা হইবে না।" মা বলিলেন, "এখন হইবে না, পরে দেখা যাইবে। এখন আমি ঁবৃন্দাবন যাইব।" সেই লোকটি বলিল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাইব।"

ঁমথুরায় কাশ্মীরী ভক্ত-মহিলার শ্রীশ্রীমাকে পরিচর্যা।

সেই পন্ডিতটিই মাকে সঙ্গে করিয়া ২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার (১৪ই আগস্ট) ঁবৃন্দাবন রওনা হইলেন। প্রায় দুইটার সময় মা বর্ধমান রাজার ধর্মশালায় পৌঁছিলেন। সেখানকার ম্যানেজার যোগেন্দ্রবাবু মার পূর্ব পরিচিত, তিনি আসিয়া মাকে ধর্মশালার ভিতর

ঁবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীমা।

নিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরই মা পণ্ডিতজীকে ঁমথুরা ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগস্ট) ঁবৃন্দাবন ছাড়িয়া মা ঁমথুরা স্টেশনে গেলেন। তথায় গিয়া ম্যানেজার যোগেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আপনি এখন কোথায় যাইবেন? কোথাকার টিকিট করিব?" মা বলিলেন, "আমার ত কিছু ঠিক নাই। রাস্তা হইতে কেহ নিয়া গেলে হয়ত তথায়ই চলিয়া যাইব। এখন আগ্রার টিকিট করিয়া দাও।"

ঁবৃন্দাবনধাম হইতে আগ্রায়।

ম্যানেজারবাবু আগ্রার টিকিট কিনিয়া দিলেন। ঁমথুরা হইতে ঁবৃন্দাবন যাওয়ার সময় মার একখানা কাপড় "ধুইয়া রাখিয়া দিও," বলিয়া উপরোক্ত কাশ্মীরী মহিলাকে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই কথায় মনে করিয়াছিলেন, মা হয়ত আবার ঁমথুরা যাইবেন। কিন্তু মা যে কতজনকে এই ভাবে কাপড়, কম্বল, চাদর, জামা রাখিয়া দিতে বলেন, তাহা আর ফিরাইয়া নিবার জন্য নয়, একথা হয়ত সেই মহিলাটি জানিতেন না। আগ্রা ফোর্টে নামিয়া বিরাজদিদিকে এটোয়ার টিকিট করিতে বলিয়া মা স্টেশনে বসিয়া রহিলেন। এর মধ্যে আগ্রার দুইটি ছেলে আসিয়া অযাচিতভাবে মার সহিত আলাপ করিতে থাকে এবং মাকে অনুরোধ করে যে, "আপনি আগ্রাতে আমাদের কাছে চলুন; আমরা যমুনার ধারে আপনার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব, কোনও অসুবিধা হইবে না।" এই বলিয়া তাহাদের ঠিকানাও দিয়া দিল।

মা এটোয়ায় যাইবার জন্য টুণ্ড্লা গাড়ী বদল করিলেন। টুণ্ড্লাতে হঠাৎ স্টেশনে একটি ছেলে মাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "মাতাজী,

আগ্রা হইতে এটোয়ার পথে টুণ্ড্লায়।

আমি আপনাকে সুলতানপুরে দেখিয়াছি, সুলতানপুর যাবেন? আমিও সুলতানপুরে যাইতেছি।" মা বলিলেন, "এটোয়ার টিকিট কিনিয়াছি," সেই ছেলেটিই উদ্যোগ করিয়া টিকিট বদলাইয়া সুলতানপুরের টিকিট করিয়া দিল।

মা এটোয়া না গিয়া মধ্য পথ হইতেই সুলতানপুর চলিলেন। এলাহাবাদ গিয়া গাড়ী বদল করিবার সময় ঐ ছেলেটিকে আর পাওয়া গেল না। সুলতানপুর যাওয়ার সময় মা ও বিরাজদিদি মেয়েদের গাড়ীতে বসিয়াছেন; প্রতাপগড় স্টেশনে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক সেই গাড়ীতে উঠিল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কয়টা বাচ্চা?" মা বলিলেন, "আমিই তো তোমার বাচ্চা; আমার আবার বাচ্চা হইবে কি করিয়া?" এই কথায় সেই স্ত্রীলোকটি কেমন হইয়া গেল। তারপর মার সহিত ২।৪টি কথা হইতেই খুব ভাব হইয়া গেল। বিরাজদিদি মার জন্য একটি খেলনা আনিয়াছিলেন; মা কিছুক্ষণ তাহা নিয়া নাড়াচাড়া করিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "মায়ের কাছেই ত ছেলে মেয়ের খেলনা থাকে, আমার এই খেলনাটি তোমার কাছে রাখিয়া দাও।" সে মাকে তাহার ঠিকানা দিল এবং পুনরায় দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। যাইবার সময় সে কাঁদিতে লাগিল। মা বিরাজদিদিকে নিয়াই সুলতানপুর গেলেন। সুলতানপুর গিয়া কালু মল্লির ধর্মশালায় উঠিলেন। তথায় রমা শর্মা (সারদার বোন) লেডি ডাক্তার। বিরাজদিদি গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন। রমা আসিয়া মার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিল। মা ১লা ভাদ্র বেলা প্রায় ৯।১০টার সময় সুলতানপুর পৌঁছিলেন। সেইদিন তথায় থাকিয়া, পরদিন অর্থাৎ ২রা ভাদ্র, সকালবেলা গোমতী দেখিতে বাহির হইলেন। পথে মোটর যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "এ মোটর কোথায় যাইবে?" কে বলিল, ফয়জাবাদ যাইতেছে। অমনি মা বিরাজদিদিকে বলিলেন, "চল ফয়জাবাদ যাই।" বেলা প্রায় ১১টার সময় ফয়জাবাদ রওনা হইয়া বৈকাল প্রায় ৪।৫টার সময় ফয়জাবাদ পৌঁছিলেন। স্টেশন হইতে টোঙ্গা করিয়া অযোধ্যা রওনা হইলেন।

সুলতানপুরে শ্রীশ্রীমা।

পঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রায় ৫৷৷।৬টার সময় অযোধ্যা পৌঁছিলেন। অযোধ্যা যাইয়া লালদাস বাবাজীর মন্দিরে উঠিলেন। রমা সঙ্গেই ছিল। সেই মন্দির হইতে অন্য এক মন্দিরে গিয়া থাকিবেন, স্থির হইল। সরযূর তীরে বেড়াইতে গিয়া, অহল্যা বাইয়ের ঁরাম মন্দিরে রামায়ণ পাঠ হইতেছিল, মা তথায়ই বসিয়া পড়িলেন। মন্দিরটি খুব সুন্দর। রমা পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা এই মন্দিরে থাকিতে পারিবেন কি না?" পূজারী সানন্দে স্বীকৃত হইয়া, দুইখানি ঘর থাকিবার জন্য দেখাইয়া দিল। তখন মা ঐ মন্দিরেই রহিয়া গেলেন। রমা চলিয়া গেল। মা প্রায় ৭ দিন পর্যন্ত ঐ মন্দিরে থাকিলেন। কেহই খবর পাইল না। দিনে মা ঘরে শুইয়া থাকিতেন; বৈকালে বারান্দায় রামায়ণ পাঠ হইত, মাও তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতেন। পরে মা সরযূর তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এবং সাধু-সন্ন্যাসীর কুটীরে চুপে চুপে ফাঁক দিয়া কি দেখিতেন। মুখে কোন শব্দ নাই। সাধুরা ভোরে স্নান করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। মা বেড়ার ফাঁক দিয়াই একটু একটু দেখিতেন। এইভাবে ৭ দিন কাটিয়া গেল।

ঁঅযোধ্যায় শ্রীশ্রীমা।

অষ্টম দিনের দিন ঐ মন্দিরে ঁসত্যনারায়ণের পূজা হয়। ফয়জাবাদের কাশ্মীরীদের পুরোহিতই ঐ মন্দিরের পূজারী। ফয়জাবাদের কাশ্মীরীরা অনেকেই মার বিশেষ ভক্ত। পূজা উপলক্ষে একটি ছেলে প্রথম আসিয়া, মাকে দূর হইতে দেখিয়া যায় এবং তখনই সাইকেল নিয়া ফয়জাবাদ গিয়া মার আগমনের সংবাদ সকলকে দেয়। শুনিয়াই তথা হইতে ২।৩ মোটর ভরিয়া ভক্তেরা সপরিবারে আসিয়া মার চরণে উপস্থিত হইল। এবং পূজারীকে

ঁঅযোধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব অর্চনা।

খুব অনুযোগ করিল যে, মাতাজী এতদিন যাবৎ আসিয়াছেন, তিনি কেন ফয়জাবাদ এই খবর দেন নাই? পূজারী বেচারা সব দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। সে বলিল, "আমি ত মাতাজীকে চিনিতে পারি নাই।" এই উপলক্ষ্যে অযোধ্যাবাসীরাও মার সংবাদ জানিল। তখন মার কাছে খুব ভীড় লাগিয়া গেল। সকলে ফুলের মালা, আরতি ও ফল মিষ্টি দিয়া মার বিশেষভাবে পূজা করিতে লাগিল। কাপড় জামা ইত্যাদি স্তূপাকার হইতে লাগিল এবং তখনই মা সেই সব ভক্তদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। মহানন্দ হইতে লাগিল। পরদিন সকালে আবার ভক্তেরা মিলিয়া মার পূজা করিলেন। দুপুরে মার ফটো তোলা হইল। বৈকালে রামায়ণ শেষ হইল। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীরামচন্দ্রের আসনের মধ্যেই মারও ফটো রাখিয়া পূজারীরা সব পূজা ও আরতি করিলেন। সেইদিনই মা অযোধ্যা ছাড়িবেন বলিয়া প্রকাশ করায়, খুব কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। কিন্তু মার যাওয়া বন্ধ হইল না। সেইদিনই রাত্রিতে মনকেশ্বর রয়নার মোটরে মাকে ফয়জাবাদ স্টেশনে নিয়া যাওয়া হইল। স্টেশনে গাড়ীর জন্য প্রায় দুই ঘন্টা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এর মধ্যেই প্রায় শতাধিক লোক স্টেশনে সমবেত হইল। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী মাকে ঘেরিয়া রহিল। পূজা ও ভোগাদিও হইল।

রাত্রি প্রায় ১২টার গাড়ীতে মা লক্ষ্ণৌ রওনা হইলেন। গাড়ীর মধ্যেই বড়বাঙ্কির এক উকিল, মাকে একবার বড়বাঙ্কিতে নিয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। মা বলিলেন, "এখনত লক্ষ্ণৌ যাইতেছি, পরে দেখা যাইবে।" লক্ষ্ণৌ যাইয়া ভোর ৫ টায় নামিলেন। তথা হইতে এটোয়ার টিকিট করিয়া এটোয়ায় গেলেন। এটোয়ায় নামিয়া পীতাম্বর পান্থের (সিভিল সার্জ্জন) বাংলোর দরজায় গেলেন। তিনি স্নান করিতেছিলেন। খবর পাইয়া

লক্ষ্ণৌ হইয়া এটোয়াতে শ্রীশ্রীমা।

ভিজা কাপড়েই আসিয়া মাকে ঐ ভাবে একা একটি স্ত্রীলোকের সহিত দেখিয়া, অবাক্ হইয়া বলিলেন, "মা, কি ব্যাপার? তুমি এই ভাবে একা আসিয়াছ?" তিনি তাঁর বাগানের মধ্যে কম্বল বিছাইয়া দিয়া, মাকে বসাইলেন। পরে প্রায় ৩ মাইল দূরে যমুনার ধারে দাউজীর মন্দিরের কাছে একটি নূতন বাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল, সেই বাড়ীতেই ডাক্তারসাহেব মার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তথায় মা ২৫ দিন ছিলেন। প্রত্যহ ১২টার সময় ডাক্তারসাহেব, মার কি দরকার জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিতেন। পরে নিজেও প্রত্যহ ৫টা কি ৫৷৷ টায় বৈকালে মোটরে মার কাছে যাইতেন। অনেকক্ষণ থাকিতেন, পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য লোকেরা মার খবর পাইয়া মার কাছে যাইতে লাগিলেন। মার সঙ্গে তাহাদের অনেক তত্ত্ব কথার আলোচনা হইত। সকলেই মার কথা শুনিয়া খুবই আনন্দ পাইতে লাগিলেন। প্রতাপগড়ের রানীরা মার সংবাদ পাইয়া মাকে নিজেদের বাগান বাড়ীতে নিয়া গেলেন। এবং মাকে আরতি ও পূজাদি করিলেন। সেখানেও বহু লোকের সমাগম হইল। কীর্তনাদি হইল। আরও ২।৩ স্থানে মাকে নিয়া গিয়া ভক্তেরা ভোগ কীর্তনাদি করিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মার কাছে লোকের ভীড় হইতে লাগিল। গরীব লোকেরাও এক মুষ্টি চাল, কেহ এক মুষ্টি ডাল আনিয়া মাকে দিয়া যাইত। মাও আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিতেন। সেখানেও যমুনার ধারে মার ফটো তোলা হইল।

এটোয়াতে একটি ঘটনা।

এটোয়াতে মা একদিন একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে দুপুরে গিয়া বসিলেন। সেই গাছটি এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যে গাছের ছায়াতেই সে স্থানটি প্রায় অন্ধকার হইয়া আছে। বিরাজ দিদি কিছু আঙ্গুর মাকে খাওয়াইবার জন্য সঙ্গে নিয়া গিয়াছেন। গাছের তলায় একটি শিবলিঙ্গ ছিল। মা সেই আঙ্গুর খাইলেন না, বলিলেন,

"শিবকে সব দিয়া দেও।" বিরাজদিদি তাহাই করিলেন। সেই স্থানটি খুবই নির্জন। মা প্রায়ই যমুনার ধারে গিয়া বসিতেন; সেইখানেই মাকে দর্শন করিতে সকলে আসিতেন। শ্মশান নিকটেই—কাজেই মড়া পোড়ার গন্ধ সর্বদা আসিত।

এখানে মা একদিন যমুনার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখেন, যমুনার ধারে একটি ক্ষেতের পার্শ্বে নিম গাছের তলায় এক কুঁড়ে ঘরে এক বাগদি পরিবার থাকে। মা তাহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বেচারা পেঁপের পাতা পাতিয়া মাকে বসিতে দিল। মা গিয়া তাহাদের মেয়ে সাজিয়া মা, বাবা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাহারাও মাকে খুব যত্ন করিতে লাগিল। মাকে একটি কাঁচা পেঁপে দিল। কিছুতেই দাম নিল না। মা মধ্যে মধ্যে যাইয়া ওখানে বসিয়া থাকিতেন। অনেক বড় বড় লোক যাঁহারা মার দর্শনে যাইতেন, তাঁহারাও ওখানে গিয়া পেঁপের পাতার উপরেই বসিতেন।

এটোয়া হইতে মা নৈমিষারণ্য রওনা হইলেন। এটোয়ার সিভিল সার্জনই নৈমিষারণ্যের টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং আরও কিছু টাকা সঙ্গে দিলেন।

এটোয়া হইতে নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীমা।

যেদিন নৈমিষারণ্য পৌঁছিলেন, সেইদিনই তথা হইতে লক্ষ্ণৌ রওনা হইয়া আসিয়া, সরোজিনী ধর্মশালায় উঠিলেন। সেখানকার ম্যানেজার মতিবাবু পূর্বে মাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি মাকে খুব যত্ন করিয়া রাখিলেন। লক্ষ্ণৌএ সাত দিন থাকার পর, অষ্টম দিনে মাণিক খবর পাইয়া রাত্রিতে

লক্ষ্ণৌতে শ্রীশ্রীমা

গিয়া মার সঙ্গে দেখা করিল। নবম দিনে মা গোমতী দেখিতে চলিলেন। তখন বেলা প্রায় ১২টা। মার ফল খাওয়ার দিন, কিছু ফল সঙ্গে নিয়া, গোমতীর তীরে এক গাছতলায় গিয়া

কম্বল বিছাইয়া বসিলেন। যাহারা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহারা এই অবস্থা দেখিয়া বলাবলি করিতেছিল "হয়ত ইঁহারা কোনও রূপ বিপদে পড়িয়াছে; কিছু সাহায্য করা উচিত কি না?" ইত্যাদি কথা নিজেরাই বলাবলি করিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণ পর মা গোমতীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ মার পূর্ব পরিচিত একজন কাশ্মীরী (নানীর জামাতা) মার বিশেষ ভক্ত, তিনি দূর হইতে মাকে দেখিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ও মার কাছে আসিয়া মার চরণ বন্দনা করিলেন। কিছুক্ষণ মার কাছে থাকিয়া, তিনি উঠিয়া গিয়া সকলকে খবর দিলেন। পরদিন সকাল বেলা বহু ভক্তেরা আসিয়া মার চরণ দর্শন করিলেন। মার বিশেষ ভক্ত নানীও তখন সেখানে মেয়ের বাসায় ছিলেন। তিনিত মাকে পাইয়া কাঁদিয়াই আকুল। সেইদিনই মা বেলা ১০টার সময় গোমতীর তীরে এক ধর্মশালায় গিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় স্টেশনে গিয়া প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত স্টেশনেই বসিয়া রহিলেন। ওখান হইতে বড়বাঙ্কি রওনা হইলেন। মাণিকও সঙ্গে আছে। লক্ষ্ণৌতেই মার জ্বর হইল।

জ্বর নিয়াই মা বড়বাঙ্কি রওনা হইলেন। রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় বড়বাঙ্কি পৌঁছিয়া স্টেশনে একটা খোলা জায়গায় পড়িয়া রহিলেন। মার

বড়বাঙ্কিতে শ্রীশ্রীমা।

তখন প্রায় ১০৪° জ্বর। পরদিন ভোরে ধর্মশালায় গিয়া পূর্বোক্ত উকিলকে খবর দিলেন। খবর পাইয়াই উকিলটি আরও ২।৪ জন ভদ্রলোকের সহিত মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। বড়বাঙ্কিতে চার দিন ছিলেন। এর মধ্যেই অনেক লোক আসা যাওয়া করিতে লাগিল। ২।৪ জন বড় বড় পণ্ডিতও আসিয়া মার সহিত কথাবার্তা বলিয়া খুবই আনন্দ পাইলেন। মার মীমাংসা শুনিয়া তাহারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সেখানেও মাকে অনেকে পূজাদি করিলেন।

সেখান হইতে মাণিককে বিদায় দিয়া, মা বেরিলি চলিলেন। পথে

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে প্রায় ২ ঘন্টা বসিয়া ছিলেন। ভোরে বেরিলিতে যাইয়াও মার জ্বর ছিল। বিরাজ দিদিরও জ্বর জ্বর ভাব। বেরিলি যাইয়া মা ধর্মশালায় গেলেন। স্টেশনের নিকটেই ধর্মশালা। হাটিয়াই মা ধর্মশালায় গেলেন, ধর্মশালায় ঘর পাওয়া গেল না। বারান্দাতেই একটা চারপাইয়ের উপর মার কম্বলের টুক্‌রা বিছাইয়া দেওয়া হইল। মা তথায় পড়িয়া রহিলেন। একটি লোহার চুলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, বিরাজদিদি মাকে একটু টমেটোর ঝোল করিয়া দিলেন; নিজেও একটু সাগুদানা তৈয়ার করিয়া খাইলেন।

বেরিলিতে শ্রীশ্রীমা।

মার এক পূর্ব পরিচিত পাঞ্জাবী ভক্ত মহিলা (মহারতন) তথায় ছিলেন। তাঁর স্বামী শ্রীযুত যশপাল তথায় রেজিষ্ট্রার। বিরাজদিদি তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন। দিনে অনেক চেষ্টায়ও মহারতনের খোঁজ পাওয়া গেল না। রাত্রিতে ধর্মশালায় একটি পাঞ্জাবী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া বিরাজদিদি আবার মহারতনের খোঁজে বাহির হইলেন। এবার অনেক চেষ্টায় খবর করিয়া জানিলেন, ধর্মশালার অতি নিকটেই মহারতনের বাড়ী। মহারতনের বাড়ী যাইয়া বিরাজদিদি চাপরাশিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এই বাড়ীই মিস্টার যশপালের। কিন্তু সেই বাড়ীর মহারতন (মিসেস্ যশপাল) ছাড়া আর কাহাকেও বিরাজদিদি চেনেন না। কাজেই তিনি যশপালের স্ত্রী আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে তিনি বাড়ী আছেন। এই সব কথাবার্তা হইতেছে, এর মধ্যে মহারতনের একটি মেয়ে বিরাজদিদির কাছে আসিয়া উপস্থিত; তাহাকে দেখিয়া বিরাজদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারতন আছেন? এই নাম শুনামাত্রই মহারতন ছুটিয়া আসিয়া বিরাজদিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মাতাজী কোথায়?" বিরাজদিদির মুখে মার বেরিলি যাওয়ার খবর পাইয়া

বেরিলিতে ভক্ত মহিলা মহারতনের শ্রীশ্রীমাকে বিশেষ পরিচর্যা।

সে কাঁদিয়াই আকুল, তৎক্ষণাৎ বিরাজদিদির টোঙ্গা বিদায় করিয়া দিয়া, মার জন্য দুধ নিয়া নিজের মোটরে বিরাজদিদিকে নিয়া তিনি মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারতন গিয়া ধর্মশালার সকলের চেয়ে ভাল ঘর ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিলেন। পরদিন মহারতন মাকে নিয়া বাজারে গেলেন এবং মার জন্য গরম জামা কম্বল ইত্যাদি সব কিনিয়া আনিলেন। মার নিষেধ মানিলেন না। অনেক অনুরোধ করিয়া মাকে তাহা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু মা নিজের কম্বলের টুক্‌রাখানি ছাড়িলেন না; নূতন কম্বলের নীচে পাতিয়া নিতেন। বিরাজদিদিকে মহারতন এক কম্বল দিলেন। বেরিলিতে মা নয় দিন ছিলেন। মহারতন প্রায় সব সময়ই মার কাছে ধর্মশালায় থাকিতেন। বৈকালে মাকে মোটরে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন।

এখানে একদিন মহারতন মাকে নিয়া নিজের বাসায় গিয়াছেন। বাহিরে মার বসিবার জায়গা করিয়া দিয়াছেন। সেদিন মিস্টার যশপালও মার কাছেই বসিয়াছিলেন। এর মধ্যে সেখানকার আর একটি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (মিস্টার দীক্ষিত) তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া মোটরে মহারতনের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইলেন। মার ২।১টি কথাও শুনিলেন। তখন মিসেস্ দীক্ষিত মাকে তাঁহার একটি ঘটনা বলিলেন।

শ্রীশ্রীমা ও মিসেস্ দীক্ষিত।

ঘটনাটি এই। কিছুদিন পূর্বে একটি জ্যোতিষী নাকি মিসেস্ দীক্ষিতের হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "১৯৩৬ সনের ৯ই অক্টোবর আপনার একটি বিশেষ অনুভূতি হইবে।" হিসাব করিয়া দেখা গেল, ঠিক সেই তারিখেই মার সঙ্গে মিসেস্ দীক্ষিতের দেখা হইল। এর পূর্বেও ২।৩ দিন মিসেস্ দীক্ষিত মহারতনের সহিত দেখা করিতে তাহার বাসায় আসিয়া

মিসেস্ দীক্ষিতের বিশেষ অনুভূতি—জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী।

দেখা পান নাই। শুনিয়াছেন, "এক মাতাজীর কাছে মহারতন ধর্মশালায় গিয়াছেন।" জ্যোতিষীর নির্দ্দিষ্ট দিনে মার সহিত দেখা হওয়ায়, মিসেস্ দীক্ষিত খুবই আনন্দ পাইলেন; এবং এই ঘটনায় মার উপর তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণ হইল। রাত্রিতেও অনেক সময় তিনি ধর্মশালায় মার কাছে কাটাইতেন। মা বলিতেন, "এখন যাও, অনেক রাত হইল। তোমাদের খাওয়া দাওয়ার সময় হইয়াছে।" তিনি উত্তরে বলিতেন, "আমার ক্ষুধা নাই; খাইব না। আপনার সঙ্গ আর কোথায় পাইব?" এই চলিয়া যাই যাই করিয়াও যাইতেন না। পরে একদিন সহরের বড় বড় লোকের পরিবাররা আসিয়া মার কাছে কীর্তনাদি করিলেন। সেখানে স্ত্রীলোকেরা সকলে মিলিয়া প্রত্যেক রবিবারই কীর্তন করেন। যেখানে রবিবার কীর্তনাদি হয়, সকলে মিলিয়া মাকে সেখানে নিয়া গেলেন এবং ফলপুষ্প ও আরতি দ্বারা মার পূজা করিলেন। মাও বলিয়াছেন, "বেরিলিতে মেয়েরা বেশ কীর্তন করে, কীর্তনের মধ্যে বসিয়া তাহারা একটি কথাও বলে না।" এই কয় দিনের মধ্যেই মা তথায় বেশ পরিচিতা হইয়া পড়িলেন। সকলেই মাকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন।

বেরিলিতে একটি সাধু রোজ ধর্মশালায় মহাদেবের মন্দিরে বসিয়া জপাদি করিতেন। তিনি শুনিলেন, এক মাতাজী আসিয়াছেন। বিরাজদিদির কাছে গিয়া সাধুটি মার সহিত দর্শনের বাসনা জানাইলেন এবং মা সকলের সহিতই দেখা করেন জানিয়া, তিনি গিয়া মার সহিত দেখা করিলেন, এবং মাকে বলিলেন,—"অনেক যোগ তপস্যা করিয়াও মনস্থির করিতে পারিতেছি না এবং শান্তি পাইতেছি না।" মা তাহাকে গোপনে কি উপদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। কারণ, প্রথম বীজটি পুঁতিয়া যদি তাহা বারে বারে উঠাইয়া দেখা

বেরিলিতে একটি সাধুর প্রতি মায়ের গুপ্ত উপদেশ।

যায়, তবে সেই বীজে আর গাছ বাহির হয় না। বীজটি মাটির ভিতর পুঁতিয়া যত্নে রক্ষা করিতে হয়, জল সেচন করিতে হয়। শেষে গাছ বাহির হইয়া বড় হইয়া গেলে, সেই গাছ হইতেই আবার কত বীজ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই কত ফুল ফল ঝরিয়া পড়ে।" সেই সাধুটি মার উপদেশ পাইয়া খুবই আনন্দ পাইল। এই রূপে ধীরে ধীরে আরও অনেকে আসিয়া মার নিকট হইতে যাহার যেমন অধিকার, সেই ভাবে উপদেশ পাইয়া খুবই কৃতার্থ হইতে লাগিল।

বেরিলিতে ৯ দিন থাকিবার পর মা বলিলেন, "যখন কম্বলাদি হইল, তখন ইহার সদ্‌ব্যবহার করা যাক, চল নৈনিতাল যাই।" মা নৈনিতাল যাওয়ার সময়, বেরিলিতে সকলে মার ফটো তুলিলেন এবং স্টেশনে এক বিরাট উৎসব আরম্ভ হইল। বাহিরের লোক ও দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া এই বিদায় উৎসব দেখিতে লাগিলেন। মা ট্রেনের যে কামরায় উঠিলেন সেই কামরা ভক্তদের শ্রদ্ধাঞ্জলির পুষ্পে ভরিয়া গেল। এই ভাবে বেরিলি হইতে বিদায় হইয়া মা নৈনিতাল চলিলেন। আর একটি আশ্চর্যের বিষয়, অনেক জায়গায়ই নাকি অনেকে বলিয়াছেন যে, মাকে তাঁহারা পূর্বেই স্বপ্নে অথবা ছায়ারূপে দেখিয়াছেন।

বেরিলি হইতে নৈনিতাল গমনের ইচ্ছা এবং বেরিলি স্টেশনে অপূর্ব বিদায়োৎসব।

একপঞ্চাশৎ অধ্যায়

নৈনিতাল গিয়া, তালিতাল নামক স্থানে মা মোটর হইতে নামিতেই দেখিলেন, মার পূর্ব পরিচিত এক ভক্ত কৃষ্ণরাম পান্থ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনিও মাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং মাকে খুব আগ্রহের সহিত মোটর হইতে নামাইয়া নিলেন এবং বলিলেন, "আমি কখনও এদিকে আসি না। আজ এদিকে আসিবার কেমন একটা ইচ্ছা হইল যে, না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখন বুঝিতেছি, কেন সেই ইচ্ছা হইয়াছিল। আর আমার প্রাণটা কয়দিন যাবৎই মা মা করিয়া কাঁদিতেছিল। কত জায়গায় তোমার খবরের জন্য চিঠি দিয়াছি। তুমি আজ কত কষ্ট করিয়া আমাকে দর্শন দিতে আসিয়াছ।" এই বলিয়া সে কাঁদিয়া আকুল। সকলকে চিঠি লিখিয়া খবর দিতে চাহিলেন। কিন্তু মা নিষেধ করিলেন, "আমি কয়দিন কোথায় থাকিব, কিছুই ঠিক নাই। অনর্থক সকলে আসিয়া কষ্ট পাইবে।" কৃষ্ণরাম পান্থের সহিত ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার তারাচাঁদবাবুর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহারাই মাকে ডাণ্ডি করিয়া নিয়া নঁয়না দেবীর মন্দিরে গেলেন। তথায় মার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। মন্দিরের উপরের তলার ২।৩টি ঘর খুলিয়া দিয়া গালিচা পাতিয়া দিলেন। তাঁহারাই মার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। ঘটনা এমন হইল, যেন মাকে আনিবার জন্যই পান্থজী তথায় গিয়াছিলেন। মা নৈনিতাল ৯ দিন ছিলেন।

কৃষ্ণরাম পান্থের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে নৈনিতালে শ্রীশ্রীমার আগমন।

নৈনিতাল যাওয়ার ৫।৬ দিন পরই দুর্গা পূজার নবরাত্রি আরম্ভ হইল। এই কয় দিনের মধ্যে সেখানকার লোক, মাকে পুষ্প চন্দন ফলাদি দ্বারা, কত ভাবেই না পূজা করিয়াছে। সকলে মার কাছে আসিয়া চোখ বুঝিয়া

বসিত। একদিন ডাণ্ডিতে মাকে পান্থজীর বাড়ী নিয়া যাইতেছেন, আর চারিদিক হইতে সকলে মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিল। একটি লোক হাত জোড় করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে মার ডাণ্ডির আগে আগে চলিতেছিল। সে দৃশ্য দেখিতে খুবই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল।

নৈনিতালে শ্রীশ্রী মাকে অপরূপ পূজা।

এক দিন একটি পাহাড়ী লোক (দেবী দত্ত) মাকে একটি সাধুর আশ্রমে নিয়া গেলেন। সাধুর আশ্রমে গিয়াও সকলে মাকে পূজা করিলেন, এবং কীর্তনাদি করিলেন। সাধুটি মৌন। ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়াছিল। সেও উঠিয়া ফল ও পুষ্প মার হাতে দিল। মার আদেশে বিরাজদিদি সাধুটিকে এবং উপস্থিত সকলকে ফল ফুল বাঁটিয়া দিলেন।

নৈনিতালে মৌন সাধুর শ্রীশ্রীমাকে পূজা।

আর এক দিন কয়টি কুমারী আসিয়া মার চারিদিকে বসিয়া গান ও স্তবাদি পাঠ করিতে লাগিল। সেদিন (৩১শে আশ্বিন ১৩৪৩ সন) (১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৬) শনিবার, দ্বিতীয়া তিথি। মা কুমারীদের পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন এবং বিরাজদিদিকে বলিলেন, "তুমিত নবরাত্রি কর। নবরাত্রির মধ্যে কুমারী পূজা করিবা? তবে বন্দোবস্ত কর। এক ডজন রুমাল আনিতে বলিয়া দাও। এবং ফুল চন্দন, ফল মিষ্টিরও যোগাড় কর।" মেয়েরা ৭।৮টি আসিয়া প্রথম দিন মাকে ঘেরিয়া গান করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন ১২টি কুমারীই আসিয়া হাজির হইল। মা পূর্বেই এক ডজন রুমালের কথা বলিয়াছিলেন। মা সকলকে এক একখানা রুমাল ও মালা, ফল, মিষ্টি দেওয়াইলেন। এবং বিরাজদিদিকে দিয়া কুমারীদের আরতি করাইলেন। নৈনিতাল হইতে মাকে তারাচাঁদবাবু ভাওয়ালি বেড়াইতে নিয়া গিয়াছিলেন।

নৈনিতালে বিরাজদিদির কুমারী পূজা।

নৈনিতাল হইতে মা আবার বেরিলি আসিয়া ৩ দিন ছিলেন এবং পূর্বের কথা মত মাণিককে লক্ষ্ণৌতে সংবাদ দেন। মাণিক বেরিলি যাইয়া মার সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজঘাট যায়।

নৈনিতাল হইতে বেরিলি।

রাজঘাটে একদিন থাকিয়া, আগ্রায় কৈলাস নামক স্থানে শ্যামকুটীরে গেলেন। আগ্রা যাইবার সময়েই ট্রেনে মা বলিতেছিলেন, "আমাকে যেন কেহ ধরিয়া ফেলিবে বলিয়া মনে হইতেছে।" সত্যিই রাজামুণ্ডি স্টেশনে নামিয়া যখন শ্যামকুটীরে যান, তখনই রাস্তায় টঙ্গার মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মাকে হঠাৎ দেখিয়া, গাড়ীর পিছনে পিছনে সাইকেল নিয়া ছুটিয়া যায়, এবং প্রথমেই বলে, "এইবার তোমায় ধরিয়া ফেলিয়াছি। আর কোথায় যাইবে? তুমি যেখানেই যাও, আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইব। কয়বার আগ্রায় আমাদের ফাঁকি দিয়া গিয়াছ।" শেষে মার কথায় ফিরিয়া, বাসায় গিয়া খবর দেয়। খবর পাইয়াই শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে যাইয়া মার পূজাদি করেন। সেদিন ঁমহাষ্টমী। ডাক্তার ভার্গবও তথায় ছিলেন। তিনিও মার সংবাদ পাইয়া মাকে গিয়া দর্শন করিলেন। মাও আগ্রা আসিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রুগ্ন ছেলেকে দেখিতে হাসপাতালে যান। সেই দিনই মা বিরাজদিদিকে দিয়া শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুই কন্যাকে কুমারী পূজা করাইলেন এবং পর দিন অর্থাৎ ঁমহানবমী দিন ডাক্তার ভার্গবের মেয়েকে কুমারী পূজা করিতে বিরাজদিদিকে বলিলেন।

বেরিলি হইতে আগ্রা। (১৩৪৩ ঁমহাষ্টমী ও ঁমহানবমীর দিন)

ঁবিজয়াদশমীর দিন আগ্রা হইতে রওনা হইয়া দিল্লী হইয়া ভোরে লাহোর গেলেন। লাহোরে একদিন থাকিলেন। ধর্মশালায় ছিলেন। সেইদিন এক ঁকালীবাড়ীতে বেড়াইতে যান। বিরাজদিদি যেই অবনত

মস্তকে ঁকালীকে প্রণাম করিতে যাইবেন, অমনি পায়চারি করিতে করিতে মা এমন জায়গায় গিয়া পড়িলেন, যে বিরাজদিদির মস্তক মার চরণেই ন্যস্ত হইল। উঠিয়াই বিরাজদিদি দেখেন, মা দাঁড়াইয়া আছেন। বিরাজদিদির হঠাৎ মনে হইল, "মা কি আজ আমার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন?" ঐ ঁকালী বাড়ী হইতে ধর্মশালায় ফিরিয়া গেলেন। রাত্রিটা ঐ ধর্মশালাতে থাকিলেন।

আগ্রা ছাড়িয়া লাহোরে গমন। (১৩৪৩ ঁবিজয়া দশমীর দিন।) (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬)

পরদিন রওনা হইয়া প্রায় ৪টার সময় অমৃতসর পৌঁছিলেন। তথা হইতে মিরাট হইয়া গড়মুক্তেশ্বর গেলেন। গড়মুক্তেশ্বর হইতেই মাণিককে বিদায় দিলেন। গড়মুক্তেশ্বরে একদিন মা হাঁটিতে হাঁটিতে এক কুম্ভকারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আর কোথায় যাইব। এইখানেই বসি।" এই বলিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। কুম্ভকার ঘট তৈয়ার করিতেছিল। মা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "মাটিটার ত খুব কষ্ট হইতেছে, কিন্তু তবু উহাকে ঘুরাইয়া তৈয়ার করিতেই হইবে। তৈয়ার করিতে হইলে, এমনই কষ্ট দিয়া করিতে হয়।"

গড়মুক্তেশ্বরে শ্রীশ্রীমা।

আরও ২।১টি কথা এখানে লিখিবার আছে। মার সঙ্গে খরচের কোন টাকা ছিল না। কিন্তু শুনিলাম, টাকার কখনও কোন অভাব হয় নাই। যখনই যেখানেই গিয়াছেন, অযাচিত ভাবে উপস্থিত লোকেরা টিকিট কিনিয়া দিয়াছে এবং খরচের জন্য আরও কিছু টাকা বিরাজমোহিনী-দিদির হাতে দিয়া দিয়াছে। আর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, মা ও বিরাজ দিদি, বোধ হয় বাজারের পুরি, তরকারী, মিষ্টি, মিঠাই খাইয়াই কাটাইয়াছেন। কিন্তু

অজ্ঞাতবাসে আশ্চর্য ভাবে ব্যয়-সঙ্কুলান এবং অদ্ভুত আহার গ্রহণ।

বিরাজদিদি ও মার মুখে শুনিলাম, তাহা মোটেই নয়। বাজারের মিষ্টি পর্যন্ত আনা হয় নাই। যখন যেখানে যেরূপ মিলিয়াছে, তাহাই বিরাজদিদি পাক করিয়া মাকে দিয়াছেন ও নিজেও সেই প্রসাদই গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন শুধু জলে তরকারী সিদ্ধই খাওয়া হইয়াছে। কিছুদিন শুধু কচু সিদ্ধই খাইয়াছেন। আবার কখনও ভাত তরকারিও রান্না হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মাকে ভক্তেরা রান্না করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিরাজদিদিকে মা কাহারও পাক করা জিনিষ খাইতে দেন নাই। তিনি সর্বদাই নিজের হাতেই পাক করিয়া খাইয়াছেন।

গড়মুক্তেশ্বর ১৫ দিন থাকিয়া সুলতানপুরে আসিয়া ৯ দিন থাকিয়া অযোধ্যা আসিলেন। অযোধ্যায় ৪।৫ দিন গুপ্তভাবে থাকিলেন। হঠাৎ মার পরিচিত এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া মাকে দেখিয়া গিয়া সকলকে সংবাদ দিলেন। মা অযোধ্যায় বদ্রিনারায়ণজীর মন্দিরে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া, তখন দলে দলে লোক মাকে দর্শন করিতে মন্দিরে আসিতে লাগিলেন।

গড়মুক্তেশ্বর হইতে সুলতানপুরে প্রত্যাবর্তন এবং তথা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।

ফয়জাবাদ হইতে গোপালজীর কাকা মনকেশ্বর নাথ রয়না ও তাঁহার স্ত্রীও মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। রয়নার স্ত্রী বলিলেন, "মার আসিবার সংবাদ পাইবার কিছু পূর্বেই নাকি তিনি ছায়ারূপে নিজ পূজার ঘরে মাকে দেখিয়াছিলেন এবং কে যেন তাহাকে বলিল যে, 'মাতাজী আসিয়াছেন'।" তথায়ই আরও ২।৩ জন স্ত্রীলোক বলিলেন, তাহারাও নাকি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, মা আসিতেছেন।

অযোধ্যা হইতে সকলে মাকে ফয়জাবাদ নিয়া গেলেন। তথায় স্টেশনেই মা রহিলেন। স্টেশনেই ভক্তেরা মার পূজা, আরতি ও ভোগাদি বিশেষ ভাবে করিলেন।

ফয়জাবাদ স্টেশনে শ্রীশ্রীমা।

একটি অন্ধ বালক আসিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে লাগিল। মা তাহাকে ফল দেওয়াইলেন।

ফয়জাবাদ স্টেশন হইতে দেওঘর গেলেন। তথায় চার দিন ছিলেন।

দেওঘরে শ্রীশ্রীমা।

মা তথায় গুপ্তভাবেই ছিলেন। পূর্ব পরিচিত প্রাণগোপাল বাবুও দেওঘর আছেন। কিন্তু মা কাহারও সহিত দেখা করেন নাই।

দেওঘরে একদল যাত্রী, মা যে ধর্মশালায় ছিলেন সেই ধর্মশালায় আসিয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক হঠাৎ কি কারণে

তথায় ধর্মশালাতে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং তাঁহার অদ্ভুত ভাবে রোগ-মুক্তি।

ভয় পায়; এবং তাহাতে তাহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা দেখিয়া ধর্মশালার ম্যানেজার তাঁহাদের খবর দেন, "একটি মাতাজী এই ধর্মশালায় আছেন। তোমরা তাঁহার কাছে যাইতে পার।" এই খবর পাইয়া পীড়িতা স্ত্রীলোকটির স্বামী মার ঘরের দরজায় গিয়া আঘাত করায়, বিরাজদিদি দরজা খুলিয়া ঐ লোকটির মুখে সব সংবাদ শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মাতাজী এই সব ব্যারাম পীড়ার কথা কিছুই বলেন না।" তখন সেই লোকটি জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, মার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা তখন নাকি নিজ হইতেই বিরাজদিদিকে বলিলেন, "চল, আমরা একটু গিয়া দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া, মা বিরাজদিদিকে নিয়া ঐ লোকটির সঙ্গে পীড়িতা স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটির অবস্থা খুব খারাপ। হাত পা ঠান্ডা, ঠোঁট নীলবর্ণ। মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। চোখ দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে। কিন্তু চোখ খুলিতে পারিতেছে না। মা একটু দেখিয়া বিরাজদিদিকে দিয়া নিজ ঘর হইতে একটি বেদানা আনাইয়া, তাহার রস করাইয়া রোগিণীকে

খাওয়াইয়া দেওয়াইলেন এবং ম্যানেজারকে বলিয়া একটি ঘরে তাহাদের পাঠাইয়া দিলেন। মাও সেই ঘরে গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া পীড়িতাকে শোয়াইয়া দিতে বলিয়া চলিয়া আসিলেন। পরদিন দেখা গেল, পীড়িতা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। মার সহিত সেই দিনই তাহারা দেওঘর ত্যাগ করিল। বিরাজদিদি বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগিণীর এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া তিনি খুবই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন।

দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়

দেওঘর হইতে মা ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার তাঁরাপীঠ গেলেন।

তাঁরাপীঠে শ্রীশ্রীমার প্রত্যাবর্তন ও সকলের নিকট তাঁহার আগমন বার্তা প্রকাশ। (১৩৪৩। ১০ই অগ্রহায়ণ।) (২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৬)

পথে এক গ্রামে মার পূর্ব পরিচিত এক ভক্ত স্ত্রীলোকের বাড়ীতে মা খাওয়া দাওয়া করিয়া গেলেন। সেই স্ত্রীলোকটির নাম শ্মশানবাসিনী। রামপুর হাট হইতেই মার গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লোক সব ভীড় করিয়া চলিতে লাগিল। মা তাঁরাপীঠ যাইয়াই আমাদের টেলিগ্রাম করেন।

উক্ত সংবাদে তাঁরাপীঠে ভক্ত সমাগম।

আমার ১১ই অগ্রহায়ণ, (২৫শে নভেম্বর) শুক্রবার সন্ধ্যায় ভোলানাথের টেলিগ্রামে মার তাঁরাপীঠ পৌঁছানর সংবাদ এবং আমাদের তথায় যাইবার আদেশ পাই। ১২ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) শনিবার (পূর্ণিমার রাসযাত্রা) তাঁরাপীঠ রওনা হইয়া ১৩ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর)

রবিবার মার চরণ দর্শন করি। সেই দিনই রাত্রি প্রায় ১২টায় শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষ ও তাহার মামা শিশির গিয়া উপস্থিত হইল। পরদিন জামসেদপুর হইতে যতীশ ডাক্তারের স্ত্রী, লক্ষ্মীবাবু, অমূল্য গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই মা ডিব্রুগড় যাওয়া স্থির করিয়াছেন। মার পুরাতন ভক্ত শ্রীমান হরিদাস মুখোপাধ্যায় ডিব্রুগড় আছে। সেই মাকে যাইবার জন্য অনেকদিন হইতেই অনুরোধ করিতেছিল। কথা হইল, আসাম ঘুরিয়া আসিয়া জামসেদপুর যাওয়া হইবে। ১৫ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) ভোলানাথ বিশেষভাবে ঁতারামার পূজা দিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত শচীবাবু, মিনু, (শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার বসুর ছেলে) এবং বিমলা মা, আনন্দ ভাই প্রভৃতি অনেকেই মার দর্শনে ঁতারাপীঠ গিয়াছেন। মাকে কলিকাতা যাওয়ার জন্য সকলে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মা যাইতে রাজি হইলেন না।

নৈহাটীতে শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ভক্তগণ।

১৫ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) মঙ্গলবার মা সকলকে নিয়া ঁতারাপীঠ হইতে রওনা হইলেন। কলিকাতা যাইবেন না, তাই নৈহাটী হইয়া আসাম রওনা হইলেন। নৈহাটী পর্যন্ত জামসেদপুরের ও কলিকাতার ভক্তেরা মার সঙ্গেই রহিল। কথা হইয়াছে, মাও ভোলানাথের সহিত, আমি, বিরাজদিদি ও অখণ্ডানন্দ স্বামিজী আসাম যাইব। আর সকলেই নৈহাটী হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। সকালে নৈহাটী পৌঁছিলাম। গাড়ীর দেরী আছে, তাই এক মন্দিরে যাইয়া খিচুড়ির বন্দোবস্ত করিতেছি। মা ইতিমধ্যে ভ্রমর, যতীশ ডাক্তারের স্ত্রী এবং আরও ২।১ জনকে নিয়া, নদীর পারে বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। মার খাওয়া হয় নাই, আমি ব্যস্ত হইতেছি। কিন্তু মা ফিরিতেছেন না।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর মা ফিরিলেন। সঙ্গে আরও ২।৩টি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক। তাঁহারা মাকে একদিন রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

আমরা ত দেখিয়া অবাক, যে এই অপরিচিত স্থানে মাকে উহারা চিনিলেন কি করিয়া? আমরা এই সব বলাবলি করিতেছি যে, মা আবার ইহাদের জুটাইলেন কি করিয়া? মা হাসিতেছেন। তখন ভ্রমর ও যতীশ ডাক্তারের স্ত্রী বলিলেন, মা নাকি নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এই ভদ্রলোকদের বাড়ী গিয়া ঢুকিয়া বলিতেছেন, "বাবা আমাকে একটু জল দেও।" তাঁহারা তখন ব্যস্তভাবে জল ও কিছু ফল মিষ্টি আনিয়া দিলেন। মা নিজের হাতে খাইতে পারেন না শুনিয়া, তাঁহারাই মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। মাও বেশ পরিচিতার মত মা, বাবা ডাকিয়া তাঁহাদের বাড়ী কিছু সময় থাকিয়া, পরে যখন উঠিয়া আসেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীর ২।৩টি ভদ্রলোকও আসিয়াছেন। মন্দিরে আসিয়া তাঁহারা ভক্তদের মুখে মার খবর শুনিয়া নিজেদের কৃতার্থ বোধ করিলেন। পুনরায় মাকে একবার নৈহাটী যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন। মা-ও বলিলেন, "বাড়ীত চিনিয়াই যাওয়া হইল, বাবার বাড়ী মেয়ের যখন ইচ্ছা হয়, আসিবে। বলিবার দরকার হয় না।" শুনিলাম, ঐ ব্রাহ্মণ পরিবার খুবই ভক্ত পরিবার। বাড়ীতে নারায়ণ ঠাকুর আছেন, বিশেষভাবে তাঁহার সেবাদি হয়। মা বলিলেন, বাড়ী ঘরও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকলেই সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন। মাকে ও ভক্তগণকে সেই দিন নিজেদের বাড়ীতে রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকেরা বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাকে আসিয়া মা বলিলেন, "আমাকে খাওয়াইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইতেছিলে, আমি বাবার বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নৈহাটীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের উপর অযাচিত আকস্মিক কৃপা।

গাড়ীর আর বেশী দেরী নাই। একটা নূতন হাঁড়িতে খিচুড়ি বসান হইয়াছে। ভক্তেরা অনেক তরকারি আনিয়াছেন। যতটা পারা যায় খিচুড়ির

ভিতর দেওয়া হইল, বাকী সব পূজারীদের দেওয়া হইল। পূজারীর স্ত্রী মাকে রুটি করিয়া দিল। তাহারা পশ্চিমাঞ্চলের লোক। মা ও ভোলানাথ রান্নাঘরেই বসিলেন। আর সকলে একটা বারান্দায় বসিয়াছেন। খিচুড়ি নামাইয়া দেখি, তাহা নীচে ধরিয়া গিয়াছে, বেশ গন্ধ বাহির হইয়াছে। বাহির হইতেই শচীবাবু গন্ধ পাইয়া বলিলেন, "দিদি, খিচুড়ি পোড়া লাগিয়াছে।" কি আর করিব? মা ও ভোলানাথকে ভোগে বসাইয়া দিলাম। পরে কিছু প্রসাদ উঠাইয়া সব খিচুড়ির মধ্যে মিলাইয়া নিয়া সকলকে পরিবেশন করিতে গেলাম। আশ্চর্যের বিষয়, তখন আর কেহ পোড়া গন্ধ ত পাইলই না, খুবই আস্বাদ হইয়াছে বলিয়া খাইতে লাগিল। এমন কি হাঁড়ির নীচেরটা উঠাইয়া শচীবাবু খাইলেন। একটুও খিচুড়ি রহিল না। শচীবাবু আসিয়া মাকে বলিলেন, "মা, পোড়া খিচুড়ি ভাবিয়া প্রথমে খুব সামান্যই নিয়াছিলাম, লইয়া দেখি, চমৎকার। শেষে অনেক খাইয়াছি। কি করিয়া এমন হইল?" মা হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "কি জানি? নলহাটীতেও একবার খিচুড়ি পুড়িয়া গিয়াছিল। দুপুর বেলা সকলে খাইবে। শেষে খাওয়ার সময় নাকি কেহ পোড়া গন্ধ পাইল না।" আমি বলিলাম, "সেবারও মা যাইয়া খিচুড়ি নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন এবং পরে আমি একটু খিচুড়ি মার মুখে দিয়া প্রসাদ করিয়া দিয়াছিলাম। ভক্তেরা খাইতে বসিয়া বলিল, পোড়া গন্ধ একেবারেই নাই। বেশ স্বাদ হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ সংস্পর্শে পোড়া খিচুড়ি উপাদেয়।

খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া আমরা সকলে স্টেশনে আসিলাম। প্রায় বেলা ১২টায় আমরা মার সহিত আসাম রওনা হইলাম। জামসেদপুরের ও কলিকাতার ভক্তেরা নৈহাটী হইতেই পৃথক হইয়া অপর গাড়ী ধরিলেন। ১৬ই অগ্রহায়ণ নৈহাটী হইতে রওনা

আসাম অভিমুখে (১৩৪৩।১৬ই অগ্রহায়ণ)। (৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৬)

হইয়া, ১৭ই অগ্রহায়ণ মধ্যাহ্নে চাপরমুখ স্টেশনে পৌঁছিলাম।

নৈহাটী হইতে রওনা হইয়া পরদিন ভোরে আমিনগাঁও হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া, পাণ্ডুঘাট গিয়া ট্রেন ধরিলাম। গাড়ী ছাড়িতে একটু দেরী আছে।

ডিব্রুগড় যাত্রা।

আমি গাড়ীর জানালা দিয়া মার মুখ ধোয়াইয়া দিতেছি। তখনই গাড়ীর ধার দিয়াই একটি ছেলে বই বগলে নিয়া যাইতেছিল। মার দিকে চাহিতেই মা তাহাকে ডাক দিলেন। ছেলেটি গাড়ীর ভিতর আসিল। ছেলেটির চেহারায় বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। মা ছেলেটির সহিত আলাপ করিয়া জানিলেন, তাহার নাম মুকুল দত্ত। তাহার পিতা রেলওয়ে কর্মচারী। গৌহাটী স্কুলে পড়িতে যাইতেছে। মা তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। এর মধ্যে আরও কয়েকটি ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সকলে গৌহাটী স্কুলে যাইতেছে। প্রায় সকলেই রেলওয়ে কর্মচারীদের ছেলে-মেয়ে। মার সহিত তাহাদের খুব ভাব হইয়া গেল। পাণ্ডুর পরের স্টেশনই গৌহাটী। কাজেই অল্প সময় তাহারা মার সঙ্গে ছিল। মা তাহাদের বলিলেন, "তোমরা সকলে একটু একটু ভগবানের নাম করিও। বলত কাহার কি নাম ভাল লাগে?" কেহ হরি, কেহ লক্ষ্মী, কেহ সরস্বতীর নাম করিল। মা বলিলেন, "তোমাদের যাহার যে নাম ভাল লাগে, প্রত্যহ সকালে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া একখানা খাতায় ১০ বার কি ৫ বার কি ১২ বার [বয়স অনুসারে] করিয়া, সেই দেবতার নাম লিখিয়া, পরে খাওয়া দাওয়া পড়া শুনা করিবে। খাতাখানা শেষ হইয়া গেলে নমস্কার করিয়া জলে দিও। আবার নূতন খাতা করিয়া নিও। কেমন পারিবে ত? তোমাদের নামগুলিও বল। আমার যদি খেয়াল

রেলগাড়ীর ভিতর স্কুলের ছাত্র কয়েকটিকে শ্রীশ্রীমায়ের করুণা মাখা উপদেশ।

হয়, মনে করিব তোমরা নাম লিখিতেছ।" এই বলিয়া আমাকে সকলের নাম লিখিয়া নিতে বলিলেন। দুইটি মুসলমানের ছেলেও ছিল। তাহাদেরও এই কথা বলিয়া দিলেন। সঙ্গে যে ফল ছিল, তাহাদের ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। ছেলে-মেয়েগুলি মহা আনন্দে মার কথায় স্বীকৃত হইল এবং মার ঠিকানাও তাহারা লিখিয়া নিল। গৌহাটী স্টেশনে গাড়ী থামিলে, তাহারা মাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। অথচ মার কিছু খবরই তাহারা জানিল না। একটু দূর গিয়াই আবার কয়েকজন ফিরিয়া মাকে বলিয়া গেল, স্টেশনের নিকটেই আমাদের বাসা। আপনি যখন ফিরিবেন, আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিলেই আমরা আসিব। আমাদের সঙ্গে অবশ্য দেখা করিয়া যাইবেন।" আমরা তাহাদের এই ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শিশুদের সরল প্রাণ। কোন গোলমাল নাই।

সেখানে নওগাঁও হইতে বিরাজদিদির কন্যা জামাতা ও আরও ৫।৭ জন স্ত্রী পুরুষ মাকে দর্শন করিতে স্টেশনে আসিয়া বসিয়াছিলেন। পূর্বেই বিরাজদিদি তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চক্রবর্তীকে মার আসাম যাওয়ার খবর দিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। চাপরমুখ হইতে তাঁহারা মাকে নওগাঁও নিয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যদি সম্ভব হয়, ফিরিবার সময় নওগাঁও যাওয়া হইবে বলিয়া তাঁহাদের নিরস্ত করা হইল। তাঁহারাও ফিরিবার সময় অবশ্য নওগাঁও যাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গাড়ী প্রায় ২০ মিনিট তথায় অপেক্ষা করে। মাকে প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইলেন।

গৌহাটী স্টেশনে শ্রীশ্রীমা।

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

আমরা পরদিন ভোর অর্থাৎ ১৮ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) ডিব্রুগড় পৌঁছিলাম। হরিদাস সপরিবারে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। ডিব্রুগড়ের আরও ৪।৫ জন ভদ্রলোকও আসিয়াছিলেন। সকলে মাকে নিয়া ধর্মশালায় গেলেন। পূর্বেই মার যাওয়ার খবর দেওয়া হইয়াছিল। ধর্মশালায় গিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। নদীর ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে যাওয়া হইল। অনেক সেবক-সেবিকা আশ্রমে থাকেন। মাকে নিয়া মেয়েদের মহলে যাওয়া হইল। সেখানে মেয়েরা মাকে ঘুরিয়া সব দেখাইলেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি দেখিয়া মা খুবই আনন্দিতা হইলেন। আশ্রমটিও বেশ সুন্দরভাবে সাজান। আশ্রম হইতে মা ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। মাকে একটু জল খাওয়ান হইল। পরে রান্না হইলে, মার ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ পাইলাম।

ডিব্রুগড়ে শ্রীশ্রীমার মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রম দর্শন।

বৈকাল বেলা হইতেই লোক ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। রাত্রিতে অনেক লোক আসিলেন। মার কাছে সকলে অনেকক্ষণ বসিয়া আলাপ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে চলিয়া গেলেন। পরদিনই আমাদের পরশুরাম কুণ্ড যাওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু হরিদাস এবং অন্যান্য সকলে রাজী হইল না। অনেক কথার পর তিন দিন ডিব্রুগড় থাকা স্থির হইল।

ডিব্রুগড়ে শিশুদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ বাণী।

১৯শে (৩রা ডিসেম্বর) খুব বৃষ্টি হইল। তার মধ্যেও লোক জন আসা যাওয়া বন্ধ হইল না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও অনেক আসিয়াছে। তাহারাও মার কাছে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। মা তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়

করিতেছেন। মা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরা একটু একটু ভগবানের নাম করত?" কেহ সকালে "দুর্গা" নাম করে, কেহ কিছু করেনা, বলিতেছে। মা সকলকেই বলিলেন, "একটু একটু ভগবানের নাম করিতে হয়, তাহাতে মঙ্গল হয়। তোমরা একটা কাজ করিও। এক একখানা খাতা করিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, প্রথমেই যার যে দেবতার নাম ভাল লাগে ৫ বার কি ১০ বার, কি ১২ বার (বয়স অনুসারে বলিয়া দিলেন) ঐ খাতায় সেই দেবতার নাম লিখিয়া নমস্কার করিয়া, পরে খাওয়া দাওয়া পড়া শুনা করিবে। পরে খাতা শেষ হইয়া গেলে, নমস্কার করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে; আবার নূতন খাতা করিবে। কেমন এই কথা মনে থাকিবে ত?" শিশুরা মহানন্দে এই কাজ করিতে স্বীকার করিল। আমি কয়েকখানা খাতা কিনিয়া তার মধ্যে তাহাদের নাম লিখিয়া দিলাম। তাহারা আবার খাতার মধ্যে প্রথমেই মার নাম লিখিয়া দিতে বলিল। তাহাও লিখিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতে মার আদেশ মত লিখিয়া আনিয়া মার কাছে সব খাতা হাজির করিল। এই ভাবে শিশুদের সহিত মা অনেক স্থানেই খেলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সহরের অনেক লোকই মার কাছে আসিয়াছেন। মা এতদূর আসিয়া এই শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া, সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

মুক্তানন্দ স্বামীজীর আশ্রম হইতে মাকে একদিন ভোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া আশ্রম হইতে লোক আসিল। মা একদিন পর একদিন রুটি বা অন্ন গ্রহণ করিতেন। এখন কিন্তু একদিন সম্পূর্ণভাবে উপবাসী না থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে কিছু ফল দুধ গ্রহণ করেন। ১৮ই মার খাওয়ার দিন ছিল না। তাই কথা হইল, ১৯শে অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) আশ্রম হইতে মার ভোগ আসিবে। ১৮ই রাত্রিতে বহুলোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলে বসিয়া মার সহিত আলাপ করিতেছেন। সেই সময় পর দিনের

ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়

আমরা পরদিন ভোর অর্থাৎ ১৮ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) ডিব্রুগড় পৌঁছিলাম। হরিদাস সপরিবারে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। ডিব্রুগড়ের আরও ৪।৫ জন ভদ্রলোকও আসিয়াছিলেন। সকলে মাকে নিয়া ধর্মশালায় গেলেন। পূর্বেই মার যাওয়ার খবর দেওয়া হইয়াছিল। ধর্মশালায় গিয়া একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। আমরাও সঙ্গে গেলাম। নদীর ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে যাওয়া হইল। অনেক সেবক-সেবিকা আশ্রমে থাকেন। মাকে নিয়া মেয়েদের মহলে যাওয়া হইল। সেখানে মেয়েরা মাকে ঘুরিয়া সব দেখাইলেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি দেখিয়া মা খুবই আনন্দিতা হইলেন। আশ্রমটিও বেশ সুন্দরভাবে সাজান। আশ্রম হইতে মা ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। মাকে একটু জল খাওয়ান হইল। পরে রান্না হইলে, মার ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ পাইলাম।

ডিব্রুগড়ে শ্রীশ্রীমার মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রম দর্শন।

বৈকাল বেলা হইতেই লোক ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। রাত্রিতে অনেক লোক আসিলেন। মার কাছে সকলে অনেকক্ষণ বসিয়া আলাপ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় সকলে চলিয়া গেলেন। পরদিনই আমাদের পরশুরাম কুণ্ড যাওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু হরিদাস এবং অন্যান্য সকলে রাজী হইল না। অনেক কথার পর তিন দিন ডিব্রুগড় থাকা স্থির হইল।

ডিব্রুগড়ে শিশুদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ বাণী।

১৯শে (৩রা ডিসেম্বর) খুব বৃষ্টি হইল। তার মধ্যেও লোক জন আসা যাওয়া বন্ধ হইল না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও অনেক আসিয়াছে। তাহারাও মার কাছে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। মা তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়

করিতেছেন। মা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরা একটু একটু ভগবানের নাম করত ?" কেহ সকালে "দুর্গা" নাম করে, কেহ কিছু করেনা, বলিতেছে। মা সকলকেই বলিলেন, "একটু একটু ভগবানের নাম করিতে হয়, তাহাতে মঙ্গল হয়। তোমরা একটা কাজ করিও। এক একখানা খাতা করিবে এবং প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, প্রথমেই যার যে দেবতার নাম ভাল লাগে ৫ বার কি ১০ বার, কি ১২ বার (বয়স অনুসারে বলিয়া দিলেন) ঐ খাতায় সেই দেবতার নাম লিখিয়া নমস্কার করিয়া, পরে খাওয়া দাওয়া পড়া শুনা করিবে। পরে খাতা শেষ হইয়া গেলে, নমস্কার করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে; আবার নূতন খাতা করিবে। কেমন এই কথা মনে থাকিবে ত?" শিশুরা মহানন্দে এই কাজ করিতে স্বীকার করিল। আমি কয়েকখানা খাতা কিনিয়া তার মধ্যে তাহাদের নাম লিখিয়া দিলাম। তাহারা আবার খাতার মধ্যে প্রথমেই মার নাম লিখিয়া দিতে বলিল। তাহাও লিখিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতে মার আদেশ মত লিখিয়া আনিয়া মার কাছে সব খাতা হাজির করিল। এই ভাবে শিশুদের সহিত মা অনেক স্থানেই খেলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সহরের অনেক লোকই মার কাছে আসিয়াছেন। মা এতদূর আসিয়া এই শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া, সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

মুক্তানন্দ স্বামীজীর আশ্রম হইতে মাকে একদিন ভোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া আশ্রম হইতে লোক আসিল। মা একদিন পর একদিন রুটি বা অন্ন গ্রহণ করিতেন। এখন কিন্তু একদিন সম্পূর্ণভাবে উপবাসী না থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে কিছু ফল দুধ গ্রহণ করেন। ১৮ই মার খাওয়ার দিন ছিল না। তাই কথা হইল, ১৯শে অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) আশ্রম হইতে মার ভোগ আসিবে। ১৮ই রাত্রিতে বহুলোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলে বসিয়া মার সহিত আলাপ করিতেছেন। সেই সময় পর দিনের

ভোগের জন্য আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারীরা নানা রকমের জিনিষ নিয়া ধর্মশালায় উপস্থিত হইলেন। একটা ঘরে সব সাজাইয়া রাখা হইল। অনেক জিনিষ আসিয়াছে। আশ্রম হইতে ব্রহ্মচারিণী মায়েরা নিজের হাতে কত রকমের মিষ্টি তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়াছেন। আশ্রমের গাছের ফল, ক্ষেতের তরকারি এবং আরও অন্যান্য বহু জিনিষ ছিল। বিশেষত্ব এই যে, জিনিষগুলি যে ভাবে সাজান গোছান ছিল, তাহাতে আশ্রমবাসিনীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সুরুচির পরিচয় দিতেছিল। মাকে আরও একবার আশ্রমে নিয়া যাইবার জন্য আশ্রমবাসিনীরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। মা ধর্মশালার বারান্দাতেই থাকিতেন। সেইখানেই রাত্রিতে শুইতেন। ভক্তেরা মাকে নিয়া বারান্দায়ই বসিয়াছেন। মাকে একবার ডাকিয়া আনিয়া সব দেখান হইল। মা দেখিয়া আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "আচ্ছা এখনত এ সব আমারই হইয়া গিয়াছে?" অমনি ব্রহ্মচারীটি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" মা তখন হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "এই সব ফল, মিষ্টি উপস্থিত সকলকে ভাগ করিয়া দাও।" আবার হাসিয়া বলিলেন, "আমার জন্যও কিন্তু রাখিও।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মাদের গিয়া বলিও, তাহাদের তৈয়ারী জিনিষ সকলে মিলিয়া মহানন্দে গ্রহণ করিয়াছে।"

মুক্তানন্দ স্বামিজীর আশ্রম হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ভোগের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রেরণ।

১৯শে (৩রা ডিসেম্বর) সব জিনিষই পাক করিয়া ফেলিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, "তোমরা পাক কর। খাওয়ার লোকও জুটিয়া যাইবে।" তাই হইল। ১৯শে সকালে মা হরিদাসের বাসায় এবং আরও ২।৩ বাসায় বেড়াইয়া আসিলেন। হরিদাসের বাসায় সকলের

শ্রীশ্রীমায়ের ফটো এবং সন্ন্যাসীবেশে অখণ্ডানন্দ স্বামীজির ফটো গ্রহণ।

সহিত মার ফটো তোলা হইল। এবং মা গত শ্রাবণ মাসে ৺বিন্ধ্যাচল যখন তিন দিনের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন অখণ্ডানন্দজীর কথায় বলিয়াছিলেন, "বাবা যখন জামা, জুতা, কিছুই ব্যবহার করে না, একেবারেই সব ছাড়িয়াছে, তখন বাবার একটা সেই ভাবের ফটো রাখা দরকার। একেবারে নেংটি পরিয়া ফটো তোলা হইবে।" এই কথার পরই মা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। আমাদের ৺বিন্ধ্যাচল রাখিয়া গেলেন। কাজেই আর ঐ ভাবের ফটো তোলা হইল না। এখন সেই কথা রক্ষা করা হইল। অখণ্ডানন্দজীর ঐ ভাবের ফটো তোলা হইল।

ডিব্রুগড়ে কীর্তন ও মহোৎসবানন্দ।

অনেক বাসা ঘুরিয়া ধর্মশালায় আসা হইল। বহু লোক মার দর্শনের জন্য আসিয়া ধর্মশালায় বসিয়া আছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহার সাংসারিক জীবনে চাকুরী উপলেক্ষ এখানে অনেকদিন ছিলেন। মার কৃপায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়া পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিরা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মার ও ভোলানাথের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইতে বসিল। বহুলোক প্রসাদ পাইল। সন্ধ্যা বেলায় সেখানকার সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্তনের বন্দোবস্ত করিলেন। ২।৩ দল আসিয়া কীর্তন করিলেন। এক ভদ্রলোক রাত্রিতে মার কাছে মহোৎসব করিলেন। রাত্রিতে সকলে মহোৎসবের প্রসাদ পাইলেন। রাত্রি প্রায় ৩টা কি ৩৷৹ টায় সকলে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

কথা হইয়াছে, পরদিন ভোরে মা ৺পরশুরাম কুণ্ডে রওনা হইবেন। সকলে চলিয়া গেলে, মা একটু বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। আমরাও শুইয়া পড়িলাম। যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। ডিব্রুগড় হইতেও ২।৩ জন মার সঙ্গেই ৺পরশুরাম কুণ্ডে যাইবেন। দুই খানা মোটরে যাওয়া হইবে। মা ধর্মশালা হইতে বাহির হইয়া মুক্তানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে

গেলেন। মাকে পাইয়া তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। আশ্রমে কিছু সময় থাকিয়া তথা হইতেই মা মোটরে উঠিলেন। ডিব্রুগড়ের মনোমোহন সিংহ মহাশয় নিজের মোটরখানি মাকে ঁপরশুরাম যাইবার জন্য দিলেন। আর একখানা ভাড়া করা হইল।

ঁপরশুরাম কুণ্ড দর্শনের আয়োজন।

২০শে অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) প্রাতে ৮টার সময় আমরা ঁপরশুরাম কুণ্ড রওনা হইলাম। তিনসুকিয়া সদিয়া হইয়া সন্ধ্যার সময় আমরা এক ডাকবাংলোয় পৌঁছিলাম। অখণ্ডানন্দজী এই দিকে অনেকদিন সিভিল সার্জনের পদে কাটাইয়া গিয়াছেন, কাজেই অনেকের সাহায্য পাওয়া গেল। তাহাতে যাতায়াতের ও অনুমতি পত্র পাওয়ার সুবিধা হইল। এই ডাক বাংলোয় আমাদের এক আত্মীয় (ওভারসিয়ার) ছিলেন। তাঁহাকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। গভীর জঙ্গল; বাঘ হাতীর ভয় খুব আছে। এখন তবুও মোটর যাওয়াতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। রাত্রিটা সেই ডাকবাংলোতেই কাটান স্থির হইল। ভয়ানক শীত। কোন প্রকারে সেইখানেই পাক করিয়া খাওয়া হইল। মার সেই দিন খাওয়া ছিল না তিনি একটু দুধ ও ফল খাইলেন।

ঁপরশুরাম কুণ্ড যাত্রা।

পরদিন ভোরে রওনা হইলাম। প্রায় আধঘন্টা মোটরে গেলাম, পরে হাঁটিতে হইবে। নদীর পার হইয়া প্রায় ৪।৫ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া ঁপরশুরাম কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। মার জন্য কোন প্রকারে একটি ডুলির মত করিয়া নেওয়া হইল। সেখানে তিন দিকেই পাহাড়। দুইটা ঝরণা আসিয়া পাহাড়ের নীচে একটা কুণ্ডের মত স্থানে পড়িতেছে। সকলে সেখানে স্নান করিলেন। মা বসিয়া রহিলেন। রাস্তায় চলিতে চলিতেই ২।১টি পাহাড়ী স্ত্রী লোকের সহিত মার ভাব হইয়া গেল; যদিও কথা কেহ কাহারও বোঝেন না, আকার ইঙ্গিতেই মহা খাতির। মাকে তাহারা রাখিয়া

দিতে চান। স্নান করিয়া সকলেই কাপড় ছাড়িয়া দিল। পাহাড়ী মেয়েরা সেই সব কাপড় নিয়া যায়। এই সেখানকার নিয়ম। মার ২।৩ খানা নূতন কাপড় তাহারা পাইয়া মহা খুশি। স্নান করিয়াই সেখানে হইতে রওনা হইয়া, আবার ৪।৫ মাইল হাঁটিয়া পরে মোটরে করিয়া ডাক বাংলোয় আসিয়া, একটু ফল দুধ খাইয়াই আবার মোটরে রওনা হইলাম। কারণ, রাত্রি প্রায় ১০টায় তিনসুকিয়া স্টেশনে ট্রেন ধরিতে হইবে। তখন বেলা প্রায় ১টা। তখনই রওনা না হইলে ট্রেন ধরা যাইবে না। মার গতকল্য হইতেই খাওয়া নাই। সকলেরই প্রায় এইভাবেই চলিতেছে। রাত্রি প্রায় ৮টায় আমরা তিনসুকিয়া পৌঁছিলাম। মনোমোহন সিংহ মহাশয়ের মেয়ের বাসা তথায় আছে। তাহার বাসায় উঠানে গর্ত করিয়া, খিচুড়ি বসাইয়া দিলাম। গাড়ীর তখনও ঘন্টা দুই দেরী আছে। কোনও প্রকারে খাওয়া দাওয়া করিয়া ১০টার ট্রেন ধরিলাম। মা ভাত খান না, মার জন্য কয়েকখানা রুটি তৈয়ার করিয়া মার সঙ্গে নিলাম। ২১শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) আমরা পরশুরামকুণ্ডে স্নান করিয়া রাত্রি ১০ টার ট্রেনে নওগাঁও চলিলাম।

চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায়

২২শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) বেলা প্রায় তিনটার সময় নওগাঁও পৌঁছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, রাস্তায় প্রায় ২।৩ জন গার্ড ও টিকিট কালেক্টার আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়াছে। একজন কিছু ফলও কিনিয়া দিয়া গেল। কোথা হইতে তাহারা মার খবর পাইল, জানি না। পথে মার পূর্ব পরিচিত ঢাকার ধানকোরার জমিদার দীনেশবাবুর শ্যালক মাখনবাবুর সহিত দেখা হইল। তিনি মাকে

নওগাঁও গমন।

দেখিয়াই মার গাড়ীতেই আসিয়া উঠিলেন। মাকে প্রণাম করিতেই মা তাহাকে চিনিলেন; অথচ বহু বৎসর হইল মা তাহাকে দেখেন নাই। পূর্বেও ইহার সহিত খুব বেশী দেখা শুনা হয় নাই। মাকে দীনেশবাবুর স্ত্রী তাহাদের বাসায় নেওয়াইতেন; কীর্তনাদিও হইত। কিন্তু তখন মাখনবাবুর বয়স অল্প, মার কাছে বড় আসিতেন না। এখন মাখনবাবু নওগাঁওএ ওকালতি করেন। তিনিও নওগাঁও যাইতেছেন। আজ তিনি মার সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। নওগাঁও খবর দেওয়া হইয়াছিল। সকলে মাকে স্টেশন হইতে নিয়া গেলেন। সেখানে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবুর বাসায় একটি ঘর আছে। সেখানে সকলে মিলিয়া কীর্তনাদি করেন, সেই ঘরেই মাকে নিয়া যাওয়া হইল। কথা হইয়াছে, সেই দিনই মা রাত্রি ৮টার গাড়ীতে শিলং রওনা হইবেন। বৈকালে সেখানকার সিভিল সার্জন, এসিস্টেন্ট সার্জন মাকে মোটর করিয়া বেড়াইতে নিয়া গেলেন। এখানেও অখণ্ডানন্দজী সিভিল সার্জনের পদে কয়েক বছর কাটাইয়া গিয়াছেন। কাজেই সকলেই তাঁর পরিচিত। সকলে তাঁর এই সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া খুবই আশ্চর্য হইলেন। তিনি সকলকেই বলিলেন, "এই মার কৃপাতেই সব সম্ভব হইয়াছে।" মাকে নিয়া সিভিল সার্জন রামতারণবাবু জেলখানার ভিতরে দেখাইতে নিয়া গেলেন। কারণ, তিনিই জেলের সুপারিনটেনডেন্ট। তথা হইতে নিজের বাংলোয় নিয়া গেলেন। তথা হইতে এসিস্টেন্ট সার্জনের (অমূল্যবাবুর) বাসা, নগেনবাবুর বাসা এবং আরও ২।১ বাসা হইয়া কীর্তনের ঘরটিতে ফিরিয়া যাওয়া হইল। আজ মার খাওয়ার দিন নয়, তাই মা কিছু ফল দুধ খাইলেন। আমাদেরও একাদশী, কাজেই শুধু ভোলানাথ ভাত খাইলেন। আর সকলেরই একাদশী; ফল দুধ খাওয়া হইল। কথা হইল রাত্রি ৮টার গাড়ীতে মার যাওয়া হইবে না। রাত্রি প্রায় ১টায়, রামতারণবাবু তাঁহার মোটরে মাকে

চাপরমুখ পৌঁছাইয়া দিবেন। চাপরমুখ হইতে শেষ রাত্রির গাড়ী ধরিয়া গৌহাটী ভোরে পৌঁছিয়া বেলা ৮টার মোটরে শিলং রওনা হওয়া যাইবে। তাই হইল। মার কাছে সকলে কীর্তনাদি করিলেন। রাত্রি ১২টায় মাকে রওনা করিয়া সকলে বাড়ী গেলেন।

মাখনবাবু আমাদের সঙ্গেই আসিলেন। আমরা চাপরমুখ পৌঁছিয়া ওয়েটিং রুমে শুইয়া রহিলাম। গাড়ী আসিলে, মাখনবাবু আমাদের উঠাইয়া দিলেন। আমরা ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) সকালে গৌহাটী পৌঁছিলাম। সকলে হাত মুখ ধুইয়া নিলাম। বেলা প্রায় ৮টায় মোটরে শিলং রওনা হইয়া, প্রায় ১১টা কি ১২টার সময় শিলং পৌঁছিলাম। তথাকার এসিষ্টেন্ট সার্জনকে (কুমুদিনী বন্দ্যোপাধ্যায়) খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং মার থাকিবার জন্য জগন্নাথ মন্দির ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা তথায় গিয়া উঠিলাম। পূজারী ৩।৪ জনের পাক বেশী করিয়াছে। ভোগ হইয়া গিয়াছে। (পরে শুনিলাম পূজারীটি চিরকুমার)। মা আজ অনেক দিন পর সেই অন্নই ভোগ গ্রহণ করিলেন। আমার কাহারও হাতে খাওয়া নিষেধ তাই আমি রাত্রিতেই পাক করিব স্থির করিয়া, তখন কিছু ফল খাইয়া লইলাম। এত ঠান্ডা, যে ফল খাওয়াও প্রায় অসম্ভব।

শিলং গমন।

মন্দিরের চারিদিকেই ভদ্রলোকদের বাসা। মা খাওয়ার পূর্বে রাস্তায় একটু বেড়াইতেছেন। এক বাড়ী হইতে একটি স্ত্রীলোক মাকে ডাকিয়া তাহাদের বাসায় নিলেন। মা ঘরে যান না শুনিয়া বাহিরে বসিবার জায়গা দিলেন। কথাবার্তা বলিতেছেন, আমি মন্দির হইতে যাইয়া দেখি, মা বেশ বসিয়া আলাপাদি করিতেছেন। সেই বাড়ীরই একটি মেয়ে মার সঙ্গে মন্দিরে আসিল; মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? এখানে কত দিন থাকিবেন?" মা তখন উত্তরে বলিলেন,

"কালই এখান হইতে চলিয়া যাইব," তখন সে দুঃখিত ভাবে বলিল, "কেন, আরও কিছু দিন থাকুন না; এত শীঘ্রই কেন চলিয়া যাইতেছেন?"

শ্রীশ্রীমায়ের বিপুল আকর্ষণী শক্তি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেন, উনি থাকুন বা চলিয়া যান, তোমার তাতে কি? তুমি উহাকে থাকিতে বলিতেছ কেন? তুমি ত ওঁকে চেন না।" সে মেয়েটি অতি সরলভাবে বলিল, "কি জানি কেন, ওঁকে খুব ভাল লাগিতেছে।" আমি অবাক হইয়া ভাবিলাম, কিসের আকর্ষণ? শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন। আমরা অযোগ্য, তাই এমন জিনিষ হেলায় হারাইতেছি। এই মেয়েটি আর বড় সঙ্গ ছাড়িল না। মাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। মা তাহাকে বলিলেন, "আমার বড়মা আছে (ভ্রমর ঘোষকে বড় মা বলেন) ছোট মা আছে, (তাঁরাপীঠে একটি মেয়েকে মা ছোট মা বলিয়াছেন; নাম লিলি) তুমি আমার কোন মা হইবে?" সে অমনি বলিল, "মেঝ মা।" মা বলিলেন, "বেশ তবে আমার একটা নাম রাখিবে ত? কারণ, আমার ত এখনই জন্ম হইল। তাইত তুমি মা হইলে?"

শ্রীশ্রীমায়ের "মেঝমা" এবং তৎপ্রদত্ত শ্রীশ্রীমায়ের নাম "নারায়ণী"।

সে মেয়েটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমি তোমার নাম নারায়ণী রাখিলাম।" আমি মা ও ঐ মেয়েটি তখন হাঁটিতেছিলাম। এই কথাবার্তায় আমি হাসিতেছি, মাও হাসিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?" মেয়েটি বলিল, "শোভারাণী ঘোষ।" আমি বলিলাম, "তুমি ত এখন আমাদের দিদিমা হইলে, কেমন? সেও মহানন্দে তাহা স্বীকার করিল।

পরে আমরা মন্দিরে ফিরিয়া গেলাম। আরও কয়েকটি মেয়ে আসিয়া জুটিল। মা মেয়েদের নাম লিখিবার কথা বলিয়া দিলেন। বৈকালে একটু বেড়াইয়া আসা হইল। সন্ধ্যার সময় কুমুদিনীবাবু কীর্তনের বন্দোবস্ত

করিলেন। সকলে মিলিয়া মার কাছে কীর্তন করিলেন। অনেকেই মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। মা কালই চলিয়া যাইবেন শুনিয়া, অনেকে খুবই দুঃখ করিতে লাগিলেন। এতদূর আসিয়া একদিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবেন, সকলে খবরও পাইল না, ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। আবার কবে মার দেখা পাইব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, **"তোমরা মেয়েটাকে যখন আনিবে, তখনই আসিব। এখন অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে আসিয়াছি। উহার ২৯শে অগ্রহায়ণের (১৩ই ডিসেম্বরের) মধ্যে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিতে হইবে। বিশেষ কাজ আছে। তাই এবার দেরী করা যাইবে না।"**

শ্রীশ্রীমায়ের শিলং পরিত্যাগের সংবাদে সকলেই দুঃখিত।

সেখানকার হেল্‌থ-অফিসার ডাক্তার সরকার সন্ধ্যার সময় মার কাছে আসিয়াছেন। তিনি অখণ্ডানন্দজীর মুখে মার পরিচয় কিছু কিছু শুনিলেন। পরে আসিয়া মার কাছে বসিলেন। শুনিলাম, তিনি ও তাঁর স্ত্রী খুব পূজাদি করেন এবং সাধু সন্ন্যাসীর কাছে খুব যান। তিনি মার সঙ্গে অনেক আলাপ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে বিদায় নিলেন। পর দিন সকালে ডাক্তার সরকার আসিয়া মোটরে মা ও আমাদের নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। আজই আমাদের শিলং ছাড়িবার কথা। প্রায় ১২টা কি ১টায় মোটর ছাড়ে। মাকে নানা জায়গায় ঘুরাইয়া ডাক্তার সরকার নিজের বাসায় মাকে নিয়া গেলেন। তাঁর ছোট্ট পূজার ঘরটিতেও মাকে নিয়া বসাইলেন। সব ঠাকুরই সেখানে আছেন। কোন সন্ন্যাসী একটি শিবলিঙ্গ দিয়াছেন, কোন সাধুর নিকট হইতে নারায়ণচক্র পাইয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পাইয়াছেন; কাহারও নিকট হইতে একমুখী রুদ্রাক্ষ পাইয়াছেন ইত্যাদি; স্বামী-স্ত্রী এই সব নিয়া বেশ আনন্দে আছেন। পূজার

হেল্‌থ-অফিসার ডাক্তার সরকারের পূজার ঘর।

ঘরে বসিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "মার এই মূর্তি আজ ৩।৪ দিন হয় পূজার ঘরে বসিয়া দেখিয়াছি। মা যেন আমার পূজার ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। কিন্তু আমি মার এই সরু পাড়ের কাপড় দেখি নাই; বড় লাল পেড়ে শাড়ী পরা দেখিয়াছিলাম।"

আমি এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম, কেননা সত্যিই কয়েক দিন পূর্বে ডিব্রুগড়ে মাকে একজন স্ত্রীলোক বড় লাল পেড়ে শাড়ী পরাইয়া ছিলেন। আমি সেই কথা তাঁহাকে বলিলাম। এবং মা পূর্বে বড় লাল পেড়ে শাড়ীই পরিতেন তাহাও বলিলাম। মাকে দেখিয়া সে যেন কেমন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল। তখনই বড় লাল পেড়ে শাড়ী আনিয়া মাকে পরাইল। পূজার ঘরে বসাইয়া মাকে মিষ্টি খাওয়াইয়া দিল। ডাক্তার সরকারের বাসায় পূজার ঘরেই মাকে কাপড় পরাইয়া দিয়া সিন্দুর দিয়া দিল।

হেল্‌থ-অফিসারের স্ত্রীর শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিটিকে আশ্চর্য ভাবে পূর্বে এক দিন দর্শন।

সেখানে ডাক্তারের ভগ্নী ও আরও একটি স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহারা আমাকেও সিন্দুর দিতে আসায় আমি নিষেধ করিলাম। তাহারা মানিল না; বলিল, "সধবার সিন্দুর দিতে আপত্তি কি?" তখন মা বলিলেন, "শোন, এর একটু ঘটনা আছে, সকলে বুঝিবে না। তাই সকলেক বলা হয় না; তোমরা বুঝিবে, তাই তোমাদের বলিতেছি। ইহার বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সংসার করে নাই। পিতামাতার সেবাতেই শিশুকাল হইতে কাটাইয়াছে। আরও একটী মেয়ে প্রায় ১৷৷ বছর বয়স হইতেই আমাদের কাছে প্রতিপালিত হয়; তাহাকেও শিশুকাল হইতে মাছ খাইতে বা কাহারও পাতের জিনিষ খাইতে দেওয়া হয় নাই। সেই মেয়েটির ও ইহার গত বছর মাঘ মাসে ছেলেদের মত পৈতা

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আমার বর্ত্তমান ব্রহ্মচারী জীবনের ইতিহাস।

দেওয়া হইয়াছে। এখন ব্রাহ্মণদের যে অধিকার, স্ত্রীলোক হইলেও ইহাদেরও সেই সব অধিকার হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, পূর্বে ব্রাহ্মণের মেয়েদের পৈতা হইত; অবশ্য এখন প্রচলিত নাই। আমার কেমন খেয়াল হইল তাই এই কাজ হইয়াছে। সেই মেয়েটিকে পৈতার পরই বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। এবং বিবাহের সময় হইতেই পৈতার যে যজ্ঞের অগ্নি তাহা তাহাদের সঙ্গে দিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা স্বামী-স্ত্রী রোজ যজ্ঞ করে। সেই জামাইটির পিতা ও ভাই ঢাকার আশ্রমেই থাকে। সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। আর ইহাকে পৈতার পর হইতেই ব্রহ্মচারীদের নিয়মে রাখা হইয়াছে। ইহার মুণ্ডনও করা হইয়াছিল। তাই এখন ইহার অন্য ভাবের জীবন চলিতেছে বলিয়া পূর্ব সংস্কারের সিন্দুর ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করিবার দরকার নাই।" ইহা শুনিয়া, তাহারা সিন্দুর দিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, মার কাছে অপরাধের ক্ষমা চাহিল। মা বলিলেন, "তোমাদের কোন অপরাধ হয় নাই; তোমরা ত জানিতে না। সকলকে বলাও হয় না।" অনেকক্ষণ সেই বাসায় কাটিয়া গেল। পরে ডাক্তারবাবু মাকে নিয়া আরও ২।৪ বাসায় গেলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ গতকল্য রাত্রিতে মার কাছে ঁজগন্নাথের মন্দিরে গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় ১০টা কি ১১টায় মাকে নিয়া আমরা ঁজগন্নাথের মন্দিরে পৌঁছিলাম।

মার আজ খাওয়ার দিন ছিল না। আমি নিজের জন্য কিছু পাক করিয়া খাইয়া নিলাম। বাবা ও ভোলানাথ মন্দিরের প্রসাদ পাইলেন। মার সঙ্গীয় লোকদের প্রসাদ পাওয়ার জন্য, মন্দিরে সেই দিন একজন ভদ্রলোক রান্নার সব জিনিষ পাঠাইয়া ভোগ দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। মার জন্য ফলও পাঠাইয়াছিলেন। মাকে একটু দুধ জ্বাল দিয়া খাওয়াইয়া নিলাম। কুমুদিনীবাবু ভোগের জন্য অনেক দুধ পাঠাইয়াছিলেন। মার মেঝমাও

মার জন্য দুধ নিয়া আসিল। মা তাহাকে এক খানা শাড়ী দিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শিলং ত্যাগ। ১৩৪৩।২৪ অগ্রহায়ণ। (৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

আমরা মন্দিরে গিয়াই দেখি বহু স্ত্রীলোক মাকে দর্শন করিবার জন্য বসিয়া আছেন। তাঁহারা কাল সংবাদ পান নাই। শুনিলাম, সন্তদাস বাবাজীও দেহরক্ষা করিবার কয়েক দিন পূর্বেই শিলং একবার গিয়াছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলে খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। অনেকেই মার ছবি ও উপদেশ কিছু ছাপা হইয়া থাকিলে পাঠাইবার জন্য, আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। ডিব্রুগড় হইতেও সকলে এই অনুরোধ করিয়া দিয়াছেন। ডিব্রুগড়ে মার ফটো তোলা হইয়াছিল। এই ভাবে প্রায় ২৪ ঘন্টা শিলং কাটাইয়া মা মোটরে রওনা হইলেন। মোটরের কাছে অনেক স্ত্রী পুরুষ একত্র হইল। প্রায় সকলেই মাত্র এই কয়েক ঘন্টার পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যেই দেখা গেল, কোট-প্যান্ট পরিহিত ভদ্রলোকরাও কেহ কেহ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। আর সকলেই মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, মা হাসিয়া হাসিয়া নানা কথা বলিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন, অথচ কথা কিছুই নূতন নয়।

পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়

প্রায় ১টার সময় মোটর ছাড়িয়া দিল। আমরা পাণ্ডু ঘাট গিয়া স্টীমার ধরিব। বিরাজমোহিনীদিদি নওগাঁও মেয়ের বাসায় ছিলেন। কথা ছিল, পাণ্ডুঘাট আসিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিবেন। আমরা সন্ধ্যার পর পাণ্ডুঘাট পৌঁছিলাম। স্টীমারে গিয়া দেখি, বিরাজদিদি আসিয়াছেন। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "আমি যখন আসি তখন আমাকে দেখিয়া, গতবারের পাণ্ডুঘাটের ছেলেমেয়েগুলি মা আসিয়াছেন বলিয়া, ছুটিয়া আসিয়া মাকে না দেখিয়া, আমাকে মার খবর জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "আজই শিলং হইতে মোটরে মা আসিবেন।" তখন তাহারা প্রত্যেক মোটরে মার খোঁজ করিতেছে। এখনও সকলে দৌড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং বলিয়াছে, "দেখি গিয়া আর কোন মোটর আসিল কিনা?" ২।১ জন ছেলে বলিতেছিল, "দেখুন, মার কথা যখনই মনে হয়, আমাদের মার কাছে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।" তখনই ভোলানাথ ও অখণ্ডানন্দ স্বামী ছেলেমেয়েদের খোঁজে গেলেন কিন্তু ছেলেদের নামগুলি আমাদের মনে ছিল না; আর অন্ধকার, স্টীমার ছাড়িবারও বেশী বিলম্ব নাই; কাজেই আর তাহাদের পাওয়া গেল না। তাহারা আসিয়াছিল, অথচ মার সহিত দেখা হইল না ভাবিয়া, আমি খুবই দুঃখিত হইলাম।

পাণ্ডুঘাটে বালকগণের শ্রীশ্রীমাকে আকুল অনুসন্ধান।

এর মধ্যে মা একটি অল্প বয়সের ভদ্রলোককে হাত দিয়া ইসারা করিয়া ডাক দিলেন। তিনি নিকটে আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় থাক? তিনি বলিলেন, "এই খানেই রেলওয়েতে কাজ করি।" মা বলিলেন, "তুমি মুকুলকে জান?" সে বলিল, 'জানি।" মা বলিলেন,

শ্রীশ্রীমায়ের ঐ বালকগণকে স্বয়ং সংবাদ প্রেরণ।

“তাহাদের বলিও, আমি আসিয়াছিলাম, তাহাদের খোঁজ করিয়াছিলাম।” আমরা মায়ের নাম বলিয়া দিলাম। সে চলিয়া গেলে মা বলিলেন, “আমার কেমন মনে হইতেছিল এই লোকটিকে বলিলেই ছেলেমেয়েরা খবর পাইবে, তাই ডাকিয়াছিলাম।” এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে আরও ২।১ জন রেলওয়ে কর্মচারীদের সহিত পরিচয় হইল। তাহাদের নিকটও ছেলেমেয়েদের খবর দিতে বলা হইল। কিছুক্ষণ পরেই স্টীমাব ছাড়িয়া দিল। ২৪শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) শিলং ছাড়িলাম।”

২৬শে অগ্রহায়ণ সকালবেলা গিয়া, রাজসাহীতে অটলদাদার বাসায় উঠিলাম। মা উঠানে বসিলেন। অটলদাদার সেইদিন হইতেই ২০ দিনের ছুটি। মা শুনিয়াই বলিলেন, চল এবার আমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরিয়া আসিবে।” মার সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা যাওয়ার কথা হইল। অটলদাদা প্রায় কাঁদিতে বসিলেন। রান্না হইলে মার ভোগ হইল। খাওয়া দাওয়ার পরই মা হাঁটিতে বাহির হইয়া গেলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া হইল; মাও ফিরিয়া আসিলেন। অটলদাদা সঙ্গে যাইতে রাজি হইলেন। স্থির হইল, সেদিন মা যাইবেন না; কোনও কার্যবশতঃ অখণ্ডানন্দ স্বামী ও বিরাজদিদি রাত্রির গাড়ীতেই কলিকাতা চলিয়া যাইবেন। মা, ভোলানাথ ও আমি পরদিন ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় রওনা হইব কিন্তু মা বলিলেন, “তিনি হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনেই জামসেদপুরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিবেন; অন্যত্র যাইবেন না। বৈকালে অনেকেই মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন, এবং সকলে মাকে নিয়া পঞ্চবটী তলায় গেলেন। সন্ধ্যার পূর্বেই মার সহিত সকলে বাসায় ফিরিলেন। মা ঘরের ভিতরে যাইবেন না, তাই উঠানেই মা থাকিবেন। সেই বন্দোবস্তই হইয়াছে, উপায় নাই।

রাজসাহীতে শ্রীশ্রীমা।

সন্ধ্যার পরে সেখানকার নিত্যানন্দবাবু সপরিবারে আসিয়া, মাকে অল্প সময়ের জন্য নিজেদের বাড়ী নিয়া যাইতে চাহিলেন। অটলদাদা প্রথম আপত্তি করিলেন। কিন্তু মা হাসিয়া বলিলেন, "উহারা যদি বলে, আপনার বাসায় এত সময় রহিলেন, আর আধ ঘন্টার জন্য আমাদের বাসায় যাইতে আপত্তি করিবেন কেন?" এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিত্যানন্দবাবু নিজের মোটরে মাকে নিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন। প্রায় ঘন্টাখানেক মা সে বাসায় ছিলেন। সকলে মাকে মিষ্টি মুখে দিয়া দিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মাও তাদের মিষ্টি খাওয়াইয়া দিলেন। এই ভাবে আনন্দ করিয়া মা অটলদাদার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রির গাড়ীতে অখণ্ডানন্দ স্বামীজী ও বিরাজদিদি কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। কথা হইয়াছে কালই হাওড়া হইতে মা জামসেদপুর চলিয়া যাইবেন এবং মার আদেশে আমি ও বাবা বিন্ধ্যাচল রওনা হইব। কাজেই এই সময়ের মধ্যে আবার মাকে ছাড়িতে হইল বলিয়া বাবা বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইলেন। কিন্তু মার আদেশই তাঁহার শিরোধার্য্য; তাই তিনি মনে আঘাত পাইলেও কখনও মার আদেশের উপর কোন কথাই বলেন না। মার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিয়া যাওয়াই তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য। তাই প্রণাম করিবার সময় চোখের জল সম্বরণ করিয়া লইলেন।

নিত্যানন্দবাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ।

তাঁহারা রওনা হইয়া যাইবার পর অটলদাদারও যাওয়া হইবে না, শুনিলাম। নানা বাধা। আরও অনেকবার মা অটলদাদাকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু অটলদাদা যাইতে পারেন নাই। অথচ সে জন্য তিনি মহা অশান্তি ভোগ করিতেছেন। শিশুর মত তাঁহার সরল প্রাণ মার জন্যই সর্বদা কাঁদে, কিন্তু তবুও, কি জানি কেন,

অটলদাদার কথা।

তিনি বন্ধন কাটাইয়া একটু সময়ের জন্যও বাহির হইতে পারিতেছেন না। সারারাত্রি তিনি ঘুমাইলেন না। কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও মার কোলে মাথা দিয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন, কখনও চুপ করিয়া মার পাশে বসিয়াই কাটাইলেন। আমিও বাহিরে মার কাছেই শুইলাম। কিন্তু বিশ্রাম করা হইল না কেননা রাত্রি ২টা অবধি সকলেই বসিয়া রহিলেন। ৩টা হইতে অটলদাদা আসিয়া বসিলেন। আবার ৪৷৷৫টার সময়ই উঠিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ কয়দিন যাবৎই মারও বিশ্রাম নাই, খাওয়া নাই; অবিশ্রান্তই প্রায় ট্রেনে বা মোটরে চলিতে হইতেছে। আমরা সকালের ট্রেনে রওনা হইলাম। অটলদাদা সপরিবারে এবং আরও অনেকে স্টেশনে মাকে উঠাইয়া দিতে আসিলেন। আমরা ঈশ্বরদি গিয়া কিছু সময় বসিয়া রহিলাম। পরে কলিকাতার গাড়ী ধরিলাম।

শ্রীশ্রীমা কলিকাতাভিমুখে।

বেলা প্রায় ১টায় শিয়ালদহ পৌঁছিলাম। পূর্বেই মার আজ যাওয়ার খবর অখণ্ডানন্দজীর মুখে সকলে শুনিয়াছিলেন। কাজেই স্টেশনে বহু স্ত্রীলোক পুরুষ মার দর্শনে সমবেত হইয়াছেন। অনেকে মার গলায় মালা দিতেছেন। মাকে নিয়া এক জায়গায় বসান হইল। আজ মার খাওয়ার দিন ছিল না। ভোলানাথ খাইতে চলিয়া গেলেন। মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া আমিও খাইতে গেলাম না। ওখানে পৌঁছিয়াই শুনিলাম শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কুশারী মহাশয়ের শরীর বড় অসুস্থ। ভোলানাথ মাকে জানাইলেন। মা বলিলেন, "আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, স্টেশনে থাকিব; তুমি গিয়া দেখিয়া আস।" তাহাই হইল। সকলে মাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কিছু পরেই আদ্যাপীঠের ভক্তদের নিয়া, বিমলা মা ও আনন্দ ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই মাকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মা,

শিয়ালদহ স্টেশনে শ্রীশ্রীমা।

বিমলা মাকে ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। যখনই তাঁহারা আসিয়াছেন, দেখিয়াছি, মা তাঁহাদের খুবই যত্ন আদর করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নের একটু ত্রুটি হইলেই, মা আমাদের অমনোযোগিতার জন্য অনুযোগ করিতেন। বলিয়াছি, মার কোন কর্মেই ত্রুটি থাকিত না। সমস্ত খেলাই মার সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে হইয়া যাইত। প্রথম হইতেই ইহা দেখিয়া আসিতেছি, আজ কিছু নূতন নয়। মা বলিয়া দিলেন, বিরাজদিদিও আমাদের সহিত বিন্ধ্যাচল যাইবেন।

মার সঙ্গে জামসেদপুর কে যাইবে, ঠিক হয় নাই। মাত্র একবার রাস্তায় কমলের (ব্রহ্মচারী যোগেশদাদার বিধবা ভাগিনেয়ী) কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক হয় নাই। কমল, যোগেশদাদার ছোট ভাই কৃষ্ণদাদার কাছেই থাকে। এত লোক স্টেশনে আসিয়াছে, কিন্তু কমলকে বা কৃষ্ণদাদাকে দেখিতেছি না। ইহাতে আমি একটু চিন্তিত হইয়া মাকে গিয়া বলিলাম, "কৃষ্ণদাদাদের কাহাকেও দেখিতেছি না, কমলকে খবর দেওয়ারই বা কি হইবে?" মা কিছুই জবাব দিলেন না; শুধু একটু হাসিলেন মাত্র। এই কথার ১৫।২০ মিনিট পরেই দেখি, কমল এবং বাসার অন্যান্য সকলকে নিয়া কৃষ্ণদাদা আসিয়া উপস্থিত। কমল মাকে প্রণাম করিয়া কি বলিতেই মা বলিলেন, "তুমি চল আমার সঙ্গে জামসেদপুর, আবার ঘুরিয়া আসিবে।" কৃষ্ণদাদার সহিত কমল অনেক দিন জামসেদপুর ছিল। তাই মা ও কথা বলিলেন। মা আমাকে বলিলেন, "কমলকে সব বুঝাইয়া দাও।" কৃষ্ণদাদা বলিলেন, "আজ অমাবস্যা তাই কমল উপবাসী আছে। সন্ধ্যায় কিছু খাওয়াইয়া আনিয়া দিয়া যাইব কি?" মা বলিলেন, "আর যাইয়া দরকার কি? এখানেই ফল খাইয়া নিবে।" বিছানাপত্র ও কাপড়ের কথায় বলিলেন, "সব হইয়া যাইবে। আনিবার দরকার নাই।" তাই স্থির হইল। সন্ধ্যার পূর্বে মাকে একটু জল খাওয়াইতে বসিয়াছি। ভক্তেরা কত কি

আনিয়াছেন, সকলেই মার মুখে কিছু কিছু ঠেকাইয়া প্রসাদ নিতে লাগিলেন, ভয়ঙ্কর ভিড়; পুলিশ আসিয়া এতক্ষণ যাবৎ স্টেশনের ভিতরে ভিড় করার জন্য সকলকে সরাইয়া দিতে লাগিল। মারও খাওয়া হইল না, উঠিয়া পড়িলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মা ৭টার গাড়ী ধরিয়া জামসেদপুর যাইবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি করিয়া হাওড়া স্টেশনে সকলে মাকে নিয়া গেলেন। যথা সময়ে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সকলে মার চারিদিকে দাঁড়াইলেন। সঙ্গে এক ঝুড়ি ফল ছিল। ডিব্রুগড়, নওগাঁও, শিলং প্রভৃতি স্থান হইতেই জমিতে জমিতে এক ঝুড়ি হইয়াছে। তাহাও গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মা তখন আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "খুকুনি, জামসেদপুরেও হয়ত ফল পাওয়া যাইবে, এখন এগুলি বিলি করিয়া দাও ত।" তাই হইল, তখনই ফলগুলি বিলি করিয়া দেওয়া হইল। কিছু পরেই গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল। মাকে প্রণাম করিয়া একে একে সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। সকলেই মার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। কথা হইল, মা ফিরিয়া আবার কলিকাতা হইয়া, যেখানে হয় যাইবেন।

শ্রীশ্রীমা জামসেদ-পুর অভিমুখে।

গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্বেই ভোলানাথ ইসারা করিয়া বুনিকে (যতীশগুহের ছোট মেয়ে, ভাল নাম ফুল্লযূথিকা) ডাকিলেন; সে তখনই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মা বলিলেন, "উহার বাবাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার।" যতীশদাদা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন —"মার সঙ্গে যাইবে, আমার বলিবার কি আছে।" তিনি নিজের আলোয়ানখানা ছুড়িয়া গাড়ীর ভিতর ফেলিয়া দিলেন। কারণ, গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। শচীদাদা কিছু টাকা গাড়ীতে ফেলিয়া দিলেন। এই ভাবে বুনি ও কমল মার সঙ্গে জামসেদপুর রওনা হইল। আমাদের

ভাগ্যবতী ফুল্লযূথিকা (বুনি) শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে।

৯টায় গাড়ী ধরিবার কথা। আমরা স্টেশনে বসিয়া রহিলাম। শচীদাদা, যতীশদাদা, নীতীশ, মিনু, জ্ঞানদাদা প্রভৃতি কয়েকজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। শেষে কথা হইল, কাজ বাকি রাখিয়া আজ না গিয়া, আগামীকল্য বৈকালে ৪টার গাড়ী ধরিয়া ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর) ভোরে মার আদেশ মত ঁবিন্ধ্যাচল পৌঁছিব। সকলের তাহাই মত হইল।

আজ ২৭শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) রবিবার। আমরা রাত্রিতে সুরেশবাবুর বাসায় চৌতালায় মার জন্য যে স্থানটুকু রাখিয়াছেন, সেখানে গিয়া উঠিলাম। পরদিন ২৮শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর) সোমবার বৈকালে ৪টার গাড়ী ধরিয়া ২৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার (সংক্রান্তির দিন) ভোরে আসিয়া ঁবিন্ধ্যাচল পৌঁছিলাম। মার নির্দেশ মত সংক্রান্তি দিনের কাজ করা হইল। এই কাজের জন্যই আবার ঁকাশী যাওয়া দরকার। আমরা ২রা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার সকালের গাড়ীতে ঁকাশী রওনা হইলাম। এবং ঁকাশীর কাজ সারিয়া ৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) মঙ্গলবার আবার দুপুরের গাড়ীতে ঁবিন্ধ্যাচল ফিরিয়া আসিলাম। ঁকাশীতে মাণিকের মুখে শুনিলাম, সে কলিকাতায় গিয়াছিল এবং শচীবাবুর বাসায় খবর পাইয়াছে, মা ৪ঠা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর) শনিবার কলিকাতা আসিবেন এবং কলিকাতা হইতে ঁনবদ্বীপ যাইতেছেন। ঁবিন্ধ্যাচল আসিয়াই ভোলানাথের ও শচী দাদার চিঠি পাইলাম।

জামসেদপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ঁনবদ্বীপ গমনের সংবাদ প্রাপ্তি।

শচীদাদার চিঠিতে জানিলাম, (তিনি ২০শে ডিসেম্বর রবিবার ৫ই পৌষ চিঠি লিখিতেছেন) মার সহিত তাহারা প্রায় ২০।২৫ জন ঁনবদ্বীপ গিয়াছেন। সেইদিনই তাহারা কলিকাতা ফিরিবেন পুনরায় বড়দিনের সময় মার কাছে ঁনবদ্বীপ যাইবেন। ভোলানাথের পত্র পাইয়া, ঢাকা হইতে দাদামহাশয়, দিদিমা ও অতুল ব্রহ্মচারীও আসিয়াছেন। তাঁহারাও মার

সঙ্গে ঁনবদ্বীপ আছেন। ভোলানাথ লিখিতেছেন, "আমরা জামসেদপুর হইতে ঁনবদ্বীপ আসিয়াছি। ৭ই পৌষ আপনাদের দাদামহাশয়কে নিয়া আমি ঁদ্বারকা যাইব, কথা হইতেছে; আপনাদের মা ও দিদিমা এবং অতুল এখানেই থাকিবে।" ইত্যাদি।

ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়

১৩৪৩ সনের পৌষমাস (১৯৩৬, ডিসেম্বর মাস)। মার ঁনবদ্বীপ যাওয়ার খবর পাইলাম। বাবা বিন্ধ্যাচলের কুণ্ডের কাজের জন্য মার সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার বলিয়া চিঠি দেওয়ায় মা বাবাকে দেখা করিবার জন্য আদেশ দেন। আমরা তদনুসারে টেলিগ্রাম পাইয়া ১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) শনিবার ঁবিন্ধ্যাচল হইতে রওনা হইয়া ঁকাশী আসিলাম এবং পরদিন অর্থাৎ ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) রবিবার ঁনবদ্বীপ রওনা হইয়া ১৩ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) সোমবার মার চরণে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বহুলোক মার চরণে উপস্থিত হইয়াছেন। ঁআদ্যাপীঠের বিমলা মা, নির্মলা মা, আনন্দভাই, হেমভাই প্রভৃতি সকলেই মার কাছে আসিয়াছেন। আমরা আসিয়া শুনি, ঁসুরধুনীর ওপারে মা প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়াছেন। সেখানেই মায়ের ভোগ হইবে। আমরা মাকে না দেখিতে পাইয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিতেছি, কখন মা আসেন ভাবিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এর মধ্যে দেখি, ২।৩ খানা নৌকা ভরিয়া লোক আসিতেছে, এবং মধুর স্বরে "মা" নামকীর্তন হইতেছে। সন্ধ্যার সময় মাকে নিয়া ঁসুরধুনীর মধ্যে ভক্তেরা "মা" "মা", কীর্তন

ভক্ত সঙ্গে ঁগঙ্গাবক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নৌকায় বিচরণ।

করিতে করিতে আসিতেছেন, আমাদেরও সেই ধ্বনি শুনিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমাদের সঙ্গে বিনয়বাবু ও তাঁর স্ত্রী আসিয়াছেন। নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল এবং আমাদের উঠাইয়া নিয়া আবার ছাড়িয়া দিল। খানিক পরেই আমরা আসিয়া ঘাটে উঠিলাম।

মাকে নিয়া সকলে ধর্মশালায় আসিলেন। মা হেতম্‌পুরের রাজ ধর্মশালায় আছেন। মায়ের চোখের উপর দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম চোখের নীচে একটি কালো দাগ। শুনিলাম, মা একদিন রাত্রে ৩টার সময় বারান্দা হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। ভয়ানক লাগিয়াছিল। ডান চোখটায় ও কপালের ডানদিকে চোট লাগিয়া ভয়ানকভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। পাছে সকলে দেখিয়া ব্যস্ত হয়, সেই জন্য মা নিজেই হাত দিয়া ফুলা জায়গাটা চাপিয়া রাখিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া আলো নিবাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে কপাল এত ফুলিয়া উঠিয়াছিল, যে হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হইতেছিল না। পরদিন কপালের ফুলা কমিয়া গিয়া চোখের নীচে কাজলের মত কালো দাগ হয়। মা এই ব্যাপারে সকলকে দুঃখ করিতে শুনিয়া একদিন হাসিয়া বলিতেছেন, "ইহাতে দুঃখের কি আছে? এ যে শ্রীগোবিন্দ আমাকে কাজল পরাইয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ইহার ভিতর আর একটু ঘটনা রহিয়াছে। মা আঘাত পাওয়ার ৫।৬ ঘন্টা পূর্বে শচীদাদার ও ব্রজেনের ঐস্থানেই ঠিক ঐ ভাবে আছাড় পড়িয়া ভয়ানক আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাহারা একটুও আঘাত পায় নাই। তাহাদের এই আঘাতই যে মা নিজের শরীরে নিলেন কিনা, কে জানে?

মার ডান চোখের ও কপালের ডান-দিকে আঘাত; শচীদাদা ও ব্রজেনের আঘাত হইতে রক্ষা।

ভোলানাথ, দাদামহাশয় ও দিদিমাকে নিয়া দ্বারকায় রওনা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামপুর হইতে ত্রিগুণাদাদা, ঢাকা হইতে অমূল্যদাদা

সপরিবারে আসিয়াছেন। প্রাণকুমারবাবু সপরিবারে আছেন। শচীদাদা, বেবীদিদি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের স্ত্রী, সকলেই আসিয়াছেন। শুনিলাম, মা প্রায়ই সুরধুনীতে নৌকায় বেড়াইতে যান। নির্মলা মা, বিমলা মাকে নিয়া মা সর্বদাই তাঁহাদের মেয়ে সাজিয়া আনন্দ করিতেছেন। তাঁহাদের নিয়া একত্র খাইতে বসেন, সর্বদাই প্রায় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। তাঁহারাও মাকে পাইয়া মহা আনন্দে আছেন। বিমলা মা, নির্মলা মা, দুজনেরই বেশ সুন্দর ভাব। বিমলা মার স্বামী আনন্দ ভাই সর্বদাই আনন্দে আছেন। নির্মলা মার স্বামী হেম ভাই কথাই প্রায় বলেন না, অতি শান্ত, ধীর, স্থির। নিজের মনেই নিজে থাকেন।

নির্মলা মা ও বিমলা মা।

আমরা আসিবার পর মঙ্গলবার দিনও মা নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। মঙ্গলবার রাত্রিতে সকলে বসিয়াছেন, নানা কথা হইতেছিল। নবদ্বীপের লোক ও ২।৩ জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। একটি সন্ন্যাসী কৈলাস অঞ্চলের পর্যটনের বিষয় বলিতেছিলেন। মঙ্গলবার বৈকালে মা সকলকে নিয়া ললিতা সখীর কাছে গেলেন। মা গিয়াছেন শুনিয়া সখীমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মাকে দেখিয়াই মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, মাকে ধরিয়া বারান্দায় নিয়া গেলেন। মা যাওয়ায় খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বারান্দায় গিয়া সকলে বসিলেন। তাঁর বিনয় ও মিষ্ট ব্যবহার সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিল। আমাদের মধ্যেই একজন সখীমাকে বলিলেন, আমাদের কিছু বলুন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি ত যন্ত্রমাত্র আপনারা যেমন বাজাইবেন, তেমনি যন্ত্র বাজিবে। আপনারা বাজিয়ে নিন। অবশ্য একটা প্রশ্ন করিলে তার সদুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। তবে প্রভুর আলোচনা করা সব সময়ই দরকার। সেই প্রসঙ্গ করা ভাল।"

ললিতা সখীর সহিত মার সাক্ষাৎকার।

প্রাণকুমারবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীবের উপায় কি?" সখীমা উত্তর দিলেন, "সকলেরই কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। পুত্রের একরকম কর্তব্য, পিতার একরকম কর্তব্য। তবে কতগুলি আছে, যাহা সকলেরই কর্তব্য। একটি ছোট ছেলে তোমার কাছে আসিলে, যদি জিজ্ঞাসা কর, তুমি কোথায় থাক, কেন আসিয়াছ, সে তাহার উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু আমরা এমন অজ্ঞ, যে এই খবরটুকুও আমাদের কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতে পারিব না। তাই মনে হয়, প্রথম কর্তব্য এই যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কেন আসিয়াছ, জানিতে চেষ্টা করা। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই সব।" তাঁর উত্তরে সকলেই খুব আনন্দ পাইলেন। সকলে আনন্দ প্রকাশ করায় সখীমা অতি বিনীত ভাবে বলিলেন;— "ইহাতে আমার কিছুই যোগ্যতা নাই। যে বাজায়, বাহাদুরী তাঁরই।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তার ভাল না হইলে শব্দ ভাল বাহির হয় না। কাজেই তারটিও ভাল।" সখী মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তার ছেঁড়া হইলেও যিনি বাজান, তিনি জোড়া দিয়াও ভাল শব্দ বাহির করিয়া নেন।" এই সব নানা কথা নিয়া আনন্দ চলিতে লাগিল। শেষে সখীমা বলিলেন "মা, আমি শুনেছিলাম, মা চলে গিয়েছেন। শুনে আমার বড়ই অভিমান হয়েছিল। ভাবছিলাম, আমি একটা অধম মেয়ে, এইখানে পড়ে আছি, তাই মা একবার না দেখেই চলে গেলেন। তারপর খবর পেলাম, মা যান নি।" মাও হাসিয়া বলিলেন, "মাকে না দেখে কি মেয়ে চলে যেতে পারে?"

ললিতা সখীর সহিত শ্রীশ্রীমায়ের কথাবার্তা।

এই সব কথাবার্তার পর স্থানাভাবের জন্য মা ও সখীমাকে নিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়াও নানাকথা হইল। বেবীদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রদ্ধা কিসে হয়?" সখীমা বলিলেন, "গুরুবাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধার

সখীমার উপদেশ।

উপায়।" বেবীদিদি বলিলেন, "বিশ্বাসই যে হয় না, তার উপায় কি?" সখীমা বলিলেন, "বিশ্বাস আসিবার জন্যই সাধনা করিতে হয়। বিশ্বাস নাই এ কথা বলিতে পার না। দেখ, পিতা মাতা এক অপরিচিত যুবকের হাতে তোমাকে সঁপিয়া দিল। বলিয়া দিল, তুমি আজ হইতে উহারই হইলে, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি পিতামাতা সকলকে ছাড়িয়া সেই যুবকের সহিত চলিয়া গেলে; একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করিয়া লইলে; ইহা কি কম বিশ্বাসের কথা? পিতার বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই ত অপরিচিত যুবককে আপনার করিয়া লইলে? একমাত্র স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তিতেই মুক্তি, আর কিছুরই দরকার হয় না। কিন্তু আমরা একটু দোষ করিয়া ফেলি। দোষ এই যে, আমরা স্বামীর নিকট কিছু চাহিয়া বসিয়া থাকি।" এই বলিয়া একটি পতিব্রতার গল্প করিতে লাগিলেন।

সখী মায়ের মুখে জনৈকা পতিব্রতার উপাখ্যান।

একটি স্ত্রীলোকের কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ স্বামী ছিল, সেই স্বামীর দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না। সেই স্ত্রীলোক স্বামীটিকে একটি ঝুড়ির ভিতর নিয়া মাথায় করিয়া বেড়াইত। একদিন ঝুড়ি নামাইবার সময় হঠাৎ তাহার গায় স্বামীর চোখের এক ফোটা জল পড়িল। ইহাতে তাহার মনে হইল, নিশ্চয়ই আমার কোন ব্যবহারে স্বামী দেবতা মনে আঘাত পাইয়াছেন তাই তাঁর চোখ হইতে জল পড়িয়াছে। এই ভাবিয়া সে স্বামীকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি কিছু অপরাধ হইয়াছে, যাহাতে আপনার মনে আঘাত লাগিয়াছে? কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে বলুন।" স্বামী বলিল, "তোমার মত সতী যার স্ত্রী, তার আবার দুঃখ কিসের? "স্ত্রী সে কথা শুনিল না। সে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা স্বামী বলিল, "দেখ, আমার কোনই শক্তি নাই; তবুও আমার মন এত দুর্বল ও মলিন, যে আজ রাস্তায় একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট

হইয়াছিল; ইহাতে আমার মনে খুবই অনুতাপ হইল, যে আমার এমন পতিব্রতা স্ত্রী, তবুও আমার মনে এমন অপবিত্র ভাব কেন জাগিল। এই ভাবিয়াই আমার চোখে জল আসিয়াছিল। স্ত্রী আর কিছু বলিল না। সে প্রতিবাসী একজনের কাছে স্বামীর ভার দিয়া বলিয়া গেল আমি একটু কাজে স্থানান্তরে যাইতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বামীকে একটু দেখিবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

খুঁজিতে খুঁজিতে সে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং জানিতে পারিল, সে একজন বেশ্যা। স্ত্রীলোকটি গিয়া ঐ বেশ্যার সেবায় নিযুক্ত হইল। কিন্তু বেশ্যাটির অজ্ঞাতসারেই এই সেবা করিতে লাগিল। এমন কি বেশ্যাটির পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করিতে লাগিল। বেশ্যাটি আশ্চর্য হইয়া গেল; ভাবিল, কে এমন করিয়া অজ্ঞাতসারে আমার সেবা করিতেছে। দুই তিন দিনের চেষ্টায় বেশ্যাটি সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া ফেলিল, এবং বলিল, "মা তুমি কে? এমন ভাবে লুকাইয়া লুকাইয়া কেন আমার মত নারকীর সেবা করিতেছ। তুমি কি চাও? যা চাও, তাই আমি দিব।" তখন ঐ স্ত্রীলোকটি বলিল,—"সত্য বল, যাহা আমি চাই, তাহাই দিবে?" তখন বেশ্যাটি বলিল—"নিশ্চয়, তুমি যাহা চাও তাহাই আমি দিব।" তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমার স্বামী ব্যাধিগ্রস্থ, তিনি তোমায় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তোমাকে আমার স্বামীর কাছে যাইতে হইবে।" বেশ্যা বলিল,—"বেশ, আমি কত অসৎ লোকের সঙ্গ করিয়াছি, তোমার মত পতিব্রতার স্বামীর স্পর্শে ধন্য হইব।" এই বলিয়া সে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

স্বামীর তুষ্টি সাধনে সতীর আপ্রাণ চেষ্টা।

এদিকে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের আসন টলিল। নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলিলেন,— "আমি ধরণীতে একটি পতিব্রতাকে দেখিতে চলিলাম।"

লক্ষ্মী বলিলেন,— "সেত আমারই জাতি, আমিও চলিলাম।" এইরূপে কৈলাস হইতে শিবের সহিত পার্বতী আসিলেন, ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রী আসিলেন। সকলেই মর্ত্যে পতিব্রতাকে দেখিতে আসিলেন। যেই পতিব্রতা স্ত্রীলোকটি বেশ্যাকে স্বামীর নিকট নিয়া উপস্থিত করিয়াছে, অমনি বেশ্যাটিরও ভাবেরও পরিবর্তন হইয়া গেল। স্ত্রীটি মহাশ্রদ্ধার সহিত ব্যাধিগ্রস্থ স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

ফলে, দেব-দেবী দর্শন ও সর্বার্থ সিদ্ধি।

উপরের দিকে চাহিয়া দেখে, দেব দেবীগণ উপস্থিত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কেন আসিয়াছেন।" অমনি দেবদেবীরা বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমরা তোমার মত পতিব্রতাকে দেখিতে আসিয়াছি।" সে স্থান তখনই স্বর্গ হইল।

এই বলিয়া সখীমা বলিতেছেন, "দেখ, এক পতিব্রতার উপলক্ষ্যে সকলেই ধন্য হইয়া গেল।"

এই বলিয়া সখীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বিধিমত সাধন ভজন করিবে। যদি তা নাই পার, তবে (মাকে দেখাইয়া বলিলেন) এই বড় নৌকার সহিত নিজেদের ছোট নৌকাটি বাঁধিয়া দেও। যদিও পেছন হইতে সংসার টানিয়া নিতে চায়, বড় নৌকার সঙ্গে বাঁধা থাকিলে, সেও সঙ্গে

সখীমার উপদেশ সমাপ্ত।

সঙ্গে যাইবে। তবে আর ভয় কি? দেখ, এই যে বড় নৌকা, এদের রহস্য এই যে, পিছন দিকে টানিবার জন্যও এদেরি একটা অংশ থাকে, আবার এরাই টানিয়া নিয়া যায়।" এই সব নানা কথা হইল এবং মেয়েরা কীর্তন করিল। তারপর মায়ের সঙ্গে আমরা ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতেও সকলে মার কাছে বসিলেন, কত কথা হইল কত আনন্দ হইল।

সপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়

১৫ই পৌষ বুধবার (১৩৪৩ সাল) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬। মা আজ প্রাতে বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বিন্ধ্যাচলের কাজের কথা বল।" বাবা সেই সব কথা বলিয়া আদেশ শুনিয়া নিলেন। পরে অমূল্যদাদা, ত্রিগুণাদাদা এবং আরও অনেকে আসিয়া বসিলেন। মা নানা কথা বলিতেছেন। কথা উঠিল ঁকৃষ্ণলীলা প্রাকৃত কি আপ্রাকৃত? মা বলিলেন, "যখন লীলা বলা হইল, তখন সেটা অপ্রাকৃত। জীবন্মুক্তেরও উপরের অবস্থা ঋষিত্ব। জীবন্মুক্ত অবস্থা না হইলে ঁকৃষ্ণলীলা শুনিবারও অধিকার হয় না"। তারপর ঁরাধাতত্ত্ব, ঁগোপিনী তত্ত্ব আসিল। মা বলিলেন, "ঋষিরাই গোপিনী হইয়াছিলেন। এই যে লীলার অঙ্গ হইয়াছিলেন ইহাতে কোন বন্ধন নাই।" কথায় কথায় আরও বলিলেন, "ঁকৃষ্ণ ও ঁরাধা অভিন্ন এবং ঁরাধা প্রধানা গোপিনী। কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণই রাধা, কৃষ্ণই গোপিনী। বেদান্ত এইখানেই হইয়া গেল।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ঁরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ও বেদান্ত।

তারপর কর্ম ও কৃপার কথা উঠিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন; "মা, সাধন, কর্ম সাপেক্ষ না কৃপা সাপেক্ষ। মা বলিলেন, "প্রথম কর্মই চাই। কর্ম হইতেই কৃপা আসে।" অমূল্য দাদা বলিলেন, তবে কি কৃপা বলিয়া কিছু নাই?" মা বলিলেন, "সাধকের কর্ম করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সে দেখে, তাঁর কৃপা ছাড়া আরি কিছুই হইতে পারে না। যতক্ষণ অহং বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ কৃপা বুঝিতে পারে না, যখন চিত্ত শুদ্ধ হয় তখন কৃপা বুঝিতে পারা যায়; তখনই সাধক বুঝিতে পারে,

সাধন কর্ম্মসাপেক্ষ না কৃপাসাপেক্ষ।

পুরুষকারই সব। 'পুরুষকার' অর্থ, পুরুষ যাহা করেন, পরম পুরুষ যাহা করেন তাহাই হইবে।" এর মধ্যে জ্ঞানদাদা বলিলেন, "অহৈতুকী কৃপা কি?" অমূল্যদাদা ইহা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,— "অহৈতুকী কৃপা যে বলা হয়, তাহা কি তাঁর দিক হইতে না আমাদের দিক হইতে?" মা বলিলেন, "তাঁর দিক হইতে।" অমূল্যদাদা মহা মুস্কিলে পড়িলেন। পূর্বে মা যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, এ কথার সহিত তাহা মিলিল না। আসল কথা, মা কাহারও ভাব নষ্ট করেন না। জ্ঞানদাদা ও নবতরুদাদার ভাব হইল, কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না, তাই মা ঐ ভাবে বলিলেন। দেখা যাইত, যে এক এক জনের নিকট এক কথাই ভিন্ন ভিন্ন রকম উত্তর দিতেছেন।

পুরুষকার পদের অর্থ।

আজ রাত্রিতে মাকে যতীশদাদার মেয়ে ফুল্লযূথিকা (বুনী) বলিতেছিল, "মা, আমরা কেন ভোগ পাক করিতে পারিব না, ব্রাহ্মণেরা কেন পারিবে? মা বলিলেন, "তাহাদের কর্ম। এখন যে রূপেই হোক পূর্ব পুরুষের পুণ্য ফলেই তাহারা এখনও ভোগ পাক করিবার অধিকারী। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হইয়াছে, এই তাহাদের বিশেষত্ব!"

ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মই ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব।

বিমলা মা ও বিনয়বাবু মার সঙ্গে একান্তে কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মা তাহার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের নিয়া নৌকায় বাহির হইলেন। আর সকলকে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমরা নদীর ধারে ধারে সকলে ঘুরিতে লাগিলাম। শিশির থাকিতে না পারিয়া, বাচ্চুকে এক নৌকা করিয়া মার নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মা নিষেধ করিয়াছেন, তাই মার নৌকার সঙ্গে লাগিতেছে না। খানিক পরে হঠাৎ নৌকার মধ্যেই শিশির ভয়ানক একটা চোট্‌ পাইল। তখন মা বলিলেন—"তোমরা কথা

মার নিষেধ অমান্য করার ফল।

শোন না, তাই এইরকম হয়।"

১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার (১৩৪৩) ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬। আজ মা রাত্রিতে বসিয়া শিশু-কালের নানা কথা বলিতেছেন। এমন সুন্দর ভাবে বলিতেছেন, যেন সত্যই সেই সময়ই উপস্থিত। মাকে কেহ এই কথা বলায়, মা বলিলেন, "সত্যই সেই সময়ের কথা বলিতে বলিতে আমি তদ্‌ভাবাপন্নই হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই সব কথাই সেই ভাবে বলিতে পারিতেছি।" সকলে মার কথায় খুবই আনন্দ পাইতেছে। মা বলিতেছেন, "যখন প্রথমত আমাকে স্কুলে পড়িতে দিল, সেই স্কুলের যিনি মাস্টার তিনি শরীরটার ঠাকুরদাদা হইতেন। একবার আমাকে অ, আ, পড়াইয়া দিল, আর কি জানি, কেমন করিয়া আমি তাহাতেই শিখিয়া ফেলিলাম। সেইদিনই ক, খ, পড়া দিয়া দিল। পরদিন তাহাও শিখিয়া ফেলিলাম এই ভাবেই সব কেমন করিয়া হইয়া যাইত। স্কুলে আমি খুব কমই গিয়াছি কারণ স্কুল দূরে ছিল। তারপর ছোট ভাইদের অসুখও কিছুদিন চলিয়াছে। এই সব নানাকারণেই আমার স্কুলে যাওয়া প্রায় হয়ই নাই। একটা তামাসা এই যে আমি পড়িতামও না, কিন্তু মাস্টারের কাছে পড়া দেওয়ার সময় সব ঠিক ঠিক হইয়া যাইত। অপরের কাছে আবার তেমন ভাবে পারিতাম না। আর একবার একটা কাণ্ড হইল। একবার বই খুলিয়া একটু দেখিয়াই একটা পদ্য মুখস্ত হইয়া গেল। কি করিয়া কি হইত, কিছুই বলিতে পারি না। ইন্সপেক্‌টার আসিয়াছে স্কুল দেখিতে। বই খুলিয়া দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই পদ্যটাই আমাকে বলিতে বলিল। আমি ফট ফট করিয়া বলিয়া ফেলিলাম।" এই বলিয়া ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শৈশবে বিদ্যাভাসের ইতিহাস।

আবার বলিতেছেন, "তোমাদের কাছে কি বলিব, যেমন আসন মুদ্রাগুলি আপনা আপনি হইয়া গিয়াছে, তেমনি পড়াগুলি কি নামতাগুলি

সবই ঐভাবে আপনা আপনিই হইয়া গিয়াছে। যিনি শিক্ষক, তিনি স্কুলের নামের জন্য আমাদের চারজন মেয়েকে ক, খ, ক্লাশ হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই নিম্ন প্রাইমারী ক্লাশে তুলিয়া দিলেন। আমি ত স্কুলে প্রায় যাইতামই না। অনেকদিন পর স্কুলে যাইয়া দেখি, মেয়েরা অনেক পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষকটি আমাকে সকলের সমান রাখিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেখানে পড়িতেছে, আমাকেও সেই পড়া দিয়া দিল। ভগার ইচ্ছা দেখ, পড়াগুলি ঠিক ঠিক যেন কি ভাবে হইয়া যাইত। আবার একটা তামাসা এই হইত, আমাকে মা বলিয়া দিয়াছেন, যেখানে কমা বা দাঁড়ি আছে, সেখানে গিয়া থামিতে হয়। মার আদেশ, তাই আমি এক নিঃশ্বাসে পড়িতে থাকিতাম। যদি মধ্যস্থানে শ্বাস একটু পড়িয়া যাইত, আমি আবার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিতাম। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া অতি কষ্টে শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়ির কাছে গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতাম। মার যে আদেশ।" এই কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। মাও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম "তখন হইতেই বুঝি প্রাণায়াম চলিতেছিল?"

বাল্যকালের কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, "যখন দুঃখের ভাব দেখাইতে হইবে, তখন শরীর দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইত। যখন লজ্জা দেখাইতে হইবে, তখন শরীর দিয়া লজ্জার ভাবই প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, এমন সব কাণ্ড হইয়া যাইত।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আবার বলিতেছেন, "আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল না, তাই ছোট বেলায় আমাকে আটেলা বেদিশা বলিত। আমাকে সকলে সোজা সোজা বলে। একদিন আমি এক কলসী জল নিয়া কাঁখে করিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া মাকে বলিতেছি—'মা তোমরা যে আমাকে সোজা সোজা

শৈশবে মার ভাবের স্বতঃস্ফুরণ।

বলিতেছ, এই ত আমি বাঁকা হইয়াছি।" মার এই কথায় আবার সকলে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

১৭ই পৌষ, শুক্রবার (১৩৪৩ সাল) ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭। আজ মাকে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সেবাদাসী নামে এক মাতার আশ্রমে নিয়া গেলেন। নৌকায় আজ বন ভোজনেও যাওয়া হইবে, সেই সময়তেই সেবাদাসী মাতাজীর মঠে যাওয়া হইল। এই সেবাদাসী মাতাজী গতকল্য মার কাছে নিজে আসিয়াছিলেন এবং তাঁর মঠে যাইবার জন্য মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাই আজ মা প্রথমেই সেবাদাসীর প্রেরিত স্ত্রীলোকটির সহিত মঠে যাইবার জন্য বড়াল ঘাটে গিয়া নামিলেন। সঙ্গে বহু লোক আছেন। মা মঠে যাইতেই সেবাদাসী মাকে জড়াইয়া ধরিয়া গোবিন্দের মন্দিরের বারান্দায় নিয়া বসাইলেন। মন্দিরে গৌর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। সেবাদাসীর কাছে যে সব স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাদের কাছে শুনিলাম, সেবাদাসী মাতা প্রায় ২২।২৩ বৎসর যাবৎ কিছুই খান না, চরণামৃত পান না করিয়া মাত্র মাথায় নেন। বাহ্য প্রস্রাবও নাই। মধ্যে মধ্যে ভাবে ২।৩ দিনও পড়িয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীমা সেবাদাসী মাতাজীর মঠে।

মার কাছে কথায় কথায় তিনি বলিতেছেন, "একবার ঠাকুর বলিলেন, তোর বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম, তোর ভার আমি নিলাম। আমিও তাঁকে সব ভার দিয়া অবসর হইয়া বসিয়া আছি। এক দিনেই খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ হইয়া গেল। আমি মঠ হইতে কৃষ্ণের আদেশ না পাইলে কোথাও বাহির হই না। আপনি আসিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু যাই নাই। গত পরশুদিন আদেশ হইল, 'আমি যে, শরীরে বিরাজ করিতেছি, তিনি আসিয়াছেন। তুই নিজে গিয়া তাঁকে সম্মান করিয়া নিয়া আয়।' তাই কাল রাত্রিতে

শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে সেবাদাসী মাতাজীর উক্তি।

আপনার কাছে গিয়াছিলাম। আপনি স্বয়ং কৃষ্ণ! এতদিন সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন পাইয়াছি, আজ গোবিন্দ প্রকট হইয়া আসিয়াছেন। এখন তোমার মন্দিরে তুমি থাক, আমি আর তোমাকে যাইতে দিব না।"

মা এই কথা শুনিয়া ছেলেমানুষের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমার মুখে আজ একটা খবর শুনিলাম যে গোবিন্দ এই শরীরটার মধ্যে আছে। আচ্ছা, কতদিন যাবৎ গোবিন্দ এই শরীরটার মধ্যে আসিয়াছেন?" সেবাদাসী মা বলিলেন, "জন্মাবধিই আছেন। আজ গোবিন্দ আসিয়াছেন, আমি আর যাইতে দিব না।"

শ্রীশ্রীমাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সেবাদাসী মাতাজীর সঙ্গে কীর্তনানন্দ।

এ বলিয়া সজোরে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিকে মাকে গান করিয়া শুনাইতে বলিলেন। সে গান করিয়া শুনাইল। পরে আমাদের দলের সকলে কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন হইতে লাগিল। সেবাদাসী মা, মাকে এমন জোরে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, যে ছাড়ান মুস্কিল। অনেকক্ষণ কীর্তন চলিল। ধীরে ধীরে সেবাদাসীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, তিনি পড়িয়াই রহিলেন। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কীর্তনে শ্রীশ্রীমায়ের অপরূপ ভাব।

কীর্তনের তালে তালে মার প্রতি অঙ্গ নাচিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। মা সকলকে বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মার উৎসাহে ভক্তগণ কীর্তনে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অবিশ্রাম কীর্তন হইল। মা ফিরিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেই কীর্তন বন্ধ করা হইল। সেবাদাসী কিছুতেই মাকে ছাড়িয়া দিবেন না। মা তাঁকে বুঝাইলেন, "আমিত তোমার নিকট হইতে যাইবই না। শরীরটা ছাড়িয়া দাও, তুমি ত সবই বুঝিতে পার।" মার সান্ত্বনা বাক্যে তিনি মাকে ছাড়িয়া দিলেন। আমরা মাকে নিয়া বাহিরে আসিলাম।

অষ্টাপঞ্চাশৎ অধ্যায়

সেবাদাসী মাতার নিকট হইতে বাহিরে আসিয়াই মা বংশীদাস বাবাজীর কাছে চলিলেন। নিকটেই তিনি একটি ঘরে থাকেন। অনেকেই বলিতে লাগিল, এখন গেলে বাবাজীর সঙ্গে দেখা হইবে না। তিনি দরজা বন্ধ করিয়াই বেশী সময় থাকেন। সকালে গেলে দেখা হয়। কিন্তু আমরা চলিলাম; বেলা বারটায় মা বলিলেন, "চল ত। দেখা না হউক অন্ততঃ স্থানটাত দেখিয়া আসা হইবে?" এই বলিয়া মা সেইদিকে চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই চলিলাম। গিয়া শুনি, কিছু সময় হইল তিনি দরজা বন্ধ করিয়াছেন, এখন আর দরজা খুলিবেন না। মা কিছু বলিলেন না, দরজার সামনে হাঁটিতে লাগিলেন। বোধ হয় এক মিনিটও হয় নাই এমন সময়ে বংশীদাস বাবাজী হঠাৎ দরজা খুলিয়া দিলেন। স্থানীয় লোক আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আজ পর্যন্ত আমরা কেহই বাবাজীকে এত অল্প সময়ের মধ্যে দরজা খুলিতে দেখি নাই।" মা গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইলেন; আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলাম। সাধুটি কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। ঘরে ঁরাধাকৃষ্ণের ও ঁবালগোপালের বিগ্রহ আছে। সাধুটি সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। তারপর তামাক ধরাইয়া দেবতাদের কাছে ধরিলেন এবং একটু পরেই নিজে তামাক খাইতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা আস্তে আস্তে একটু নাম কর।" ভক্তেরা যেই মার আদেশে নাম আরম্ভ করিয়াছেন, অমনি সাধুটি মুখ ফিরাইয়া মার দিকে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ আবার মুখ ফিরাইয়া নিলেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হইলাম।

বংশীদাস বাবাজীর ঘরে শ্রীশ্রীমার আগমন।

মা দাঁড়াইয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। সকলে বলিতেছেন,

"আমরা বাবার কথা শুনিলাম না।" মা বলিতেছেন, "চুপ করিয়া বসিয়া থাক। কথা শুনিতে হইলে চুপ করিয়া কান পাতিয়া থাকিতে হয়।" সত্যিই একটু পরেই সাধুটি আপন মনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"হরি, হরি!" মা অমনি বলিলেন, "এখন চল, বাবা ত আসল কথাই বলিয়া দিলেন 'হরি, হরি'। আর কি বলিবেন?" এই বলিয়াই মা সকলকে নিয়া রওনা হইলেন। ব্রজেন বলিল, সে ও অটলদাদা সকাল বেলায় আসিয়াছিল; তখন বাবাজী ঠাকুরের দিকে চাহিয়াই অনেক কথা বলিয়াছিলেন এবং ঁগোপালের গান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে হইতে "সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ" এইরূপ দুইবার বলিলেন।

যাহা হউক, পূর্বের কথা মত যেখানে বন ভোজনের আয়োজন হইতেছিল, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা নদীর ধারে গেলাম। অমূল্যদাদার মেয়েদের ও স্ত্রীকে মা কি কথা গোপনে বলিবেন, তাই তাঁহারা ভিন্ন এক নৌকা করিয়াছেন। মা আমাকে নিয়া অমূল্যদাদার নৌকায় উঠিলেন। আমাকে বলিলেন, "তুমি ও অমূল্য ওদিকে গিয়া কথা বল; আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি।" মেয়েদের সহিত মার কথা হইয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম "মা অমূল্যদাদা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তুমি রোজ ঁসুরধুনীতে বেড়াইতে আস, ইহার কারণ কি? ঁসুরধুনী তোমায় ডাকে নাকি?" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কি জানি, বাবা। আমি ত কিছু জানি না; তবে তোমরা যেমন আসিয়াছ, এ শরীরটা দেখিতে ঁসুরধুনীও সেই ভাবেই যেন ডাকে। তাই আসিতে হয়।" অমূল্যদাদা বলিলেন, "আবার যে ঁসুরধুনীতে ফল দাও, তার কারণ কি?" মা অমনি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, তোমাদের বুঝি ফল দেই না? এই ও সেই রকমের আর কি।"

ঁগঙ্গা ডাকে তাই মা ঁগঙ্গায় বেড়াইতে ভালবাসেন।

আমরা বেলা প্রায় একটার সময়, যেখানে বন-ভোজনের রান্না হইতেছিল, সেই চড়ায় গিয়া পৌঁছিলাম। বিমলা মা ও আনন্দ ভাই সঙ্গেই আছেন। মা তাহাদের নিয়া সর্বদাই আনন্দ করিতেছেন। মার ভোগ হইল। পরে ভক্তেরা সব প্রসাদ লইতে বসিলেন। এক বৈষ্ণবী-মা কয়েকদিন যাবৎ মার কাছে আসা যাওয়া করিতেছেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি একতারা বাজাইয়া অতি সুন্দর নাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হিরণদিদি (প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী) মন্দিরা বাজাইয়া নামের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ইহা দেখিয়া শচীদাদা বলিলেন "মা, তোমাকে দেখিব, না তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ দেখিব?" ইনি (হিরণদিদি) বেশ লোক, কীর্তনের আনন্দেই আছেন।" মা বলিলেন, "বেশ মিঠা—না।" চড়াতে ভোজন করিতে বসিয়া এই সব কথা হইল।

ঁনবদ্বীপের এক চড়ায় বনভোজন।

বন-ভোজন শেষ করিয়া মার সঙ্গে সকলে আসিয়া আবার নৌকায় উঠিলেন। নৌকায় আসিয়াই মা হিরণ দিদির নাম "মিঠাময়ী", বাসন্তীর (অমূল্যদাদার স্ত্রী) নাম "মধুময়ী" রাখিলেন। পরে বলিলেন, "যতীনবাবুর (কবিরাজ) স্ত্রীও এখানে আসিয়াছিল তাহার নাম 'রসময়ী'।" বেবীদিদিকে বলিলেন, "তোমার নাম ত পূর্বেই গৌরী প্রিয়া রাখা হইয়াছে।" নৌকায় আসিয়া ত্রিগুণাবাবু সুন্দর কীর্তন করিতে ছিলেন। বৈষ্ণবী মাকে মা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" তিনি বলিলেন, "রাধা"। মা বলিলেন, "থাক কোথায়?" "কদম তলায়!" মা ও অন্যান্য সকলে এই উত্তর শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবীমাটি পরে বলিয়াছেন, যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ঁনবদ্বীপ ধামে বাস করিতেছেন; কিন্তু জীবনে কখনও এইরূপ আনন্দ পান নাই।

স্ত্রীভক্তদের নাম-করণ ও জনৈক বৈষ্ণবীমার সঙ্গে আনন্দ।

৭টার গাড়ীতে বিমলা মা ও আরও অনেকের চলিয়া যাওয়ার কথা। মা তাহাদের উঠাইয়া দিতে নদীর ওপারে স্টেশনের কাছে গিয়া নৌকা লাগাইলেন। সকলে মাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। অমূল্যদাদারও আজ যাওয়ার কথা; তাই তিনিও জিনিষ পত্র নিয়া স্টেশনে উঠিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষে খোঁজ করিয়া দেখা গেল, তাঁর স্ত্রী যে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকা এদিকে আসে নাই। দুই তিন খানা নৌকা ধর্মশালার ঘাটে ফিরিয়া গিয়াছিল, সেই সঙ্গে তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। এত ভীড়ের মধ্যে কাহারও কিছু ঠিক নাই। তখনই শঙ্করানন্দ স্বামী একখানা নৌকা করিয়া অমূল্যদাদার স্ত্রীকে আনিতে ধর্মশালার দিকে রওনা হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহারা আসিয়া আর গাড়ী পাইলেন না। রাত্রি ৩টায় অমূল্যদাদার যাওয়া ঠিক হইল। সেই সঙ্গে শচীদাদা, ব্রজেন প্রভৃতি কলিকাতায় যাইতেছেন। কারণ বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে। মা সকলকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিদিনই কথায় কথায় প্রায় রাত্রি ৪টার সময় শোয়া হয়। আজও সকলে রওনা হইয়া যাওয়ার পর মা ও আমরা শুইয়া পড়িলাম।

কতিপয় ভক্তের নবদ্বীপ ত্যাগ।

আজ সকাল বেলায়ই মা আমাকে বলিতেছিলেন, "দেখ! কাল রাত্রিতে শুইয়া আছি, বাসন্তীর চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল এবং দেখিলাম, একটু যেন বিমর্ষ ও ব্যস্ত ভাব" পরে দেখা গেল, শঙ্করানন্দ স্বামীকে পাঠাইয়া ট্রেন ধরিবার জন্য যখন বাসন্তীকে নেওয়া হইয়াছিল, তখন বাসন্তী হঠাৎ জলে পড়িয়া যায়! জল কম ছিল, তাই বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। এই কথা শুনিয়াই মা বলিলেন—"আমি আজ সকালেই খুকুনীকে বলিয়াছিলাম।" আর সত্যিই সকাল বেলা হইতেই বাসন্তীর একটু বিষণ্ণ চেহারা দেখা গিয়াছিল।

একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়

১৮ই পৌষ, শনিবার, (১৩৪৩ সাল) ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭। আজ প্রাতে মা বসিয়া আছেন। অনেকে দর্শনার্থ আসিয়াছেন। একটি ছোট মেয়ে মাকে ২টি গান করিয়া শুনাইল। খুব সুন্দর গায়। তারপর মা কথায় কথায় বলিলেন "এই যে আমরা বসিয়া আছি, এই যে কেহ আসিল, কেহ চলিয়া গেল, ইহাও স্বপ্ন।"

লোকের যাতায়াত ও অবস্থিতি, সব স্বপ্ন।

আবার কথায় কথায় শাহবাগের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "একবার কামলা হইল। যোগেশ ঘোষ আসিয়া বলিল, একদিন জুলাপ নেওয়া দরকার। আমি বলিলাম, আমার ত পেটে কিছু নাই— ফাঁপা। তখন যোগেশবাবু আমার ঘাড়ে হাত দিয়া চাপ দিল। চাপ দিতেই মনে হইল, যেন ফুটবলের বাতাসটা বাহির হইয়া গেল; এবং একটা বেদনা বোধ হইল।" অর্থাৎ ভিতরে যে কিছুই নাই তাহা মা বলিলেন। আবার কথায় কথায় পূর্বে যে মায়ের খাওয়ার নিয়ম ছিল, তাহাই উঠিল। মা বলিতেছেন,—"এই শরীরটার ভিতর দিয়া খাওয়ারইবা কত নিয়ম হইয়া গেল। কিছু দিন ৩টা ভাত; কিছুদিন ৯টা ভাত; কয়েক মাস, বলিতে গেলে, একেবারেই অনাহার। আবার কয়েক দিন খেয়াল হইল, কাশী— হইতে পিতলের ছোট্ট একটি কৌটা নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। শাহবাগের যজ্ঞাগ্নিতে কিছুদিন এক সিদ্ধ ভাত পাক হইত। সেই প্রসাদ কুলদা এবং ভোলানাথ নিত। সেই সময়েতে পিতলের ঐ কৌটায় সামান্য কয়েকটি চাউল এবং ছোট ছোট করিয়া একটু তরকারি কাটিয়া ঐ কৌটায় ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া যজ্ঞাগ্নিতে যে ভাত পাক হইত, সে হাঁড়িতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৌটার জিনিসগুলিও সিদ্ধ

হইয়া যাইত। সারাদিন কিছু খাওয়া হইত না, সন্ধ্যার পর ঐ কৌটার আহার্যটুকুই খাওয়া হইত। কয়েক মাস এইভাবেই চলিয়াছে। আমি যে নিজে ইচ্ছা করিয়া এই সব নিয়ম পালন করিতাম, তাহা নয়। কতকটা সময় শরীরের ভিতর দিয়া এইগুলি হইয়া গিয়াছে।"

ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ।

বেলা প্রায় ১১টায় মা মেয়েদের নিয়া দরজা বন্ধ করিয়া কীর্তনানন্দ করিলেন। সিমলার মত মা সকলকে নিয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন জমাইয়া তুলিলেন। অনেকক্ষণ কীর্তন চলিল। তারপর মা একটু বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া পড়িলেন। বৈকালে মা উঠিয়া বসিলেন। আজ ঁনবদ্বীপবাসী বহু লোক মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ঘরে জায়গা হইবে না, তাই মা সকলকে নিয়া উঠানে বসিলেন। আবার কীর্তন চলিতে লাগিল, মেয়েদের নিয়া মা মধ্যস্থানে বসিলেন। আমাকে আদেশ করিলেন, "তুমি পুরুষদের নিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধীরভাবে নাম কর। তুমিও ত পুরুষদের মধ্যেই একজন।" তাহাই হইল। মধ্যে মধ্যে মা বাম হাতখানি উঠাইয়া দোলাইয়া সকলকে নামের তালে তালে নাচিতে শিখাইতেছেন। সন্ধ্যায় কীর্তন শেষ হইল। দিন রাতই প্রায় খোল করতাল বাজিতেছে, নাম চলিতেছে। স্থান ঁনবদ্বীপ, মা গিয়াছেন, ভক্তেরা সব সঙ্গী; কাজেই কীর্তনের আনন্দ দিন রাত চলিতেছে। হিরণদিদি ও যতীশদাদা (গুহ) সপরিবারে যাওয়াতেই কীর্তনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

প্রসাদ যাকে দেওয়া হয় তারই খাওয়া উচিত।

রাত্রিতে মা জল খাইতে বসিয়াছেন। একটু খাইয়াই আমাকে বলিলেন, 'হিরণকে এই বাটিটা শুদ্ধ দিয়া দেও।' আমি তাহাই করিলাম। কিন্তু ওখানে আরও অনেক লোক ছিল, তার মধ্যে যূথিকা (বুনী) বলিয়া উঠিল "সবটা প্রসাদই হিরণদিদি খাবে?" একথায় হিরণদিদির একটু লজ্জা হইল।

তিনি সকলকে এক এক চামচ দিলেন, কিন্তু যখন যূথিকাকে দিলেন সে এক চামচ খাইয়া আবার চাহিল, হিরণদিদি যেই তাহার হাতে আবার দিতে যাইবেন, সেই সময়তেই যূথিকার মাথা দেওয়ালে এমন ভাবে ঠোকা খাইল, যে তাহার চোখে জল আসিল। মা বলিলেন, "প্রসাদ যাকে দেওয়া হয় তারই খাওয়া উচিত।" মা যূথিকার মাথায় জল দিতে বলিলেন, এবং নিজে হাত বুলাইয়া দিলেন।

জল খাওয়ার পর নিজের ছোট বিছানাটিতে গিয়া মা বসিয়াছেন। অমূল্যদাদা, যতীশদাদা প্রভৃতি মার কাছে গিয়া বসিলাম। যে কোন কথা উঠে, মা তাহাই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া বলেন। কীর্তনে যে অনেকের ভাব হয়, তাহাতে অনেকেই মনে করেন, বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কি শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মত ভাব হইল। তাহাদের ভাবে এবং এখন যে অনেকের ভাব হয়, এই ভাবে কত পার্থক্য, মা তাহা সকলকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। বলিয়া আবার বলিলেন, "ইহাও অতি সামান্যই বলা হইল। এর মধ্যে আরও অনেক কথা আছে।" গতকল্য রাত্রেও এবিষয়ে অনেক কথা হইয়াছে। সাধারণতঃ সংসারীদের ভাবের কি অবস্থা, তাহাও মা বুঝাইয়া বলিতেছেন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মা এই সব কথা কি করিয়া বুঝাইতেছেন? তবে কি মারও এই সব ভাব হইয়াছিল? যে সব ভাব মার হয় নাই, কি করিয়া তাহা বলিতেছেন? এই বিষয়ে কথা উঠিলে মা বলিলেন, "দেখ, কথা এই যে, যদি নদীর মধ্য স্থানে থাকা যায়, তবে নদীর চারিদিকের সবই দেখা যায়। আরও এক কথা। এক জন খুব কবিতা লিখিতে পারে, কি খুব ভাল লেক্‌চার দিতে পারে, অথচ সে যে বই পড়িয়াছে, তাহার মধ্যেতে সে যাহা বক্তৃতা দিতেছে তাহা পায় নাই বা যে সব কবিতা

কীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও অন্য লোকের ভাবের পার্থক্য।

লিখিতেছে, তাহাও পায় নাই। ইহাও সেই রকম আর কি।"

কথাবার্তা বলিতে বলিতে মা শুইয়া পড়িলেন। কীর্তন আরম্ভ হইল। মা শুইয়া শুইয়া গান শুনিতেছিলেন। বৈষ্ণবী মা গান ধরিলেন। হঠাৎ মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বৈষ্ণবী মার সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবী মা আত্মহারা হইয়া নামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। মাকে ঐ ভাবে নাচিতে দেখিয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। মা কখনও ছেলে মানুষের মত সকলের মধ্যে মধ্যে গিয়া লুকাইতেছেন, কখনও মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত দুলাইতেছেন। কিছুক্ষণ নানা ভাবে এই রকম লীলা করিয়া মা গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কীর্তনও থামিয়া গেল।

মা বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন "এ আবার কি কাণ্ড হইল হইয়া গেল।" এই বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। প্রবুদ্ধানন্দ স্বামী বলিলেন, "মা, আমরাও ত কেমন হইয়া গেলাম। সকলে একটু নাচিয়া নিলাম। আমরা ত সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। মা বলিলেন,— "অপরিচিত কোন লোক এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই বলিত ইহারা কিছু খাইয়াছে।" এই বলিয়া আবার হাসিতে লাগিলেন। পরে আবার কথায় কথায় বলিতেছেন—"অপরিচিত কেহ নাই বলিয়াই ত এইরূপ হইয়া গেল। এই সব নানা কথায় আনন্দ চলিতে লাগিল। মা গান ধরিলেন—

"কেরে এই নূতন যোগী এল নদের মাঝারে।
মরি কি রূপ মাধুরী পাগল করিল মোরে।।
যোগীর মুখেতে কি ওকি মধুর ধ্বনি,
আমি আর না শুনি এমন ধ্বনি,
যে ধ্বনি শুনিয়া ধনী সুরধুনী উজান ধরে।।
কিশোর বয়সে মরি ওকি রূপমাধুরী,

কৌপীন করঙ্গধারী হয়েছে রে ব্রহ্মচারী
না জানি কার প্রেমের তরে।।
(দেখলেম) 'রা' বলিতে নয়ন ঝরে
'ধা' বলিতে ধুলায় পড়ে
এমন দেখি নাই আর ত্রিসংসারে।।
(আমার) হলো একি বল বল সখি,
(যোগীর) রূপ দেখিয়ে মুগ্ধ আঁখি,
প্রাণপাখী পড়েছে বাঁধা যোগীর প্রেম পিঞ্জরে।
প্রাণপাখী আর উড়তে নারে, যোগীর প্রেম পিঞ্জরে।
আমার গৃহে যেতে পা না সরে, যোগীর প্রেম পিঞ্জরে।।

ঝুমুর

আমি যোগীর পদে প্রাণ সঁপেছি।
আর যাব না, যাবনা এই ত বাহির হয়েছি।।
যোগীর সঙ্গে যে যাব।
সঙ্গে যাব মেগে খাব, সঙ্গে যে যাব ইত্যাদি।"

গতকল্য যাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজেন ও ত্রিগুণাদাদা এবং ত্রিগুণাদাদার মা আজ আবার আসিয়াছেন। অবনীবাবু আজ তাঁহার মাকে নিয়া রওনা হইয়া গেলেন। মা বিন্ধ্যাচলে খেলায় খেলায় একটি গান রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন; ("জীবের ভাগ্যে অবৈরাগ্যে ইত্যাদি) এক ভদ্রলোককে দিয়া সেই গানটা করান হইল। পরে কথায় কথায় প্রথম বার যে জামসেদপুর গিয়াছিলেন সেই কথায় বলিতেছেন, "এই

শ্রীশ্রীমায়ের মোহিনী শক্তি।

যে অপরিচিত ব্যক্তির কথা হইল, সেই কথায় বলিতেছি জামসেদপুর ত সকলে কারখানায় কাজ করে রাত্রি প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটি লোক একটু চুপ করিয়া অন্ধকারে বসিয়াছিল; উঠিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ বেটি, তুই কি বলিতে পারিস, এই যে এতগুলি লোক সারাদিন কারখানাতে কাজ করে, ১০ মিনিটও চুপ করিয়া বসে না আর রাত্রি ৩টা অবধি এই যে চুপ করিয়া তোর কাছে বসিয়া আছে; তুই কি এদের গুলি খাওয়াইয়াছিস?" অমনি হাসিয়া বলিলাম, "বাবা তুমিও হয়ত গুলি খাইয়াছ। নতুবা তুমি কেন বসিয়া আছ"? এই কথায় সকলেই হাসিতে লাগিল। আবার এইবার জামসেদপুরে এক ভদ্রলোক নাকি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতেছেন, মা যেই ডাকিলেন, "বাবা," অমনি সেই ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, "মা, আমি যদি তোমার বাবা হইতাম, তবে মেয়ের বাড়ী পড়িয়া থাকাও অপমান বোধ করিতাম না। তোর বাপ মা কি করিয়া তোকে ছাড়িয়া আছে? এই বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। এই সব কথা হইল। পরে মেয়েরা বসিয়া মার কাছে কীর্তন ও আরতি করিল। আজও প্রায় রাত্রি ৩৷৷টায় শুইলেন।

সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইতেছে যে এই ভাবে দিন রাত্রি মা অনর্গল কত কথা বলিতেছেন, কত লীলা করিতেছেন, কিন্তু ক্লান্তি নাই। ইহার মধ্যে আরও এক ঘটনা হইয়াছে। একদিন মা মন্দিরে ঘুরিতেছেন, হঠাৎ থানায় গিয়া উপস্থিত। থানার দরজার কাছে দলবল সহ মাকে যাইতে দেখিয়াই দারোগা নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে নিয়া গেলেন। এক গাছ তলায় বাঁধান জায়গায় মাকে বসিতে দিলেন, এবং বলিলেন,—"মা, আমি কিছু পূর্বেই ভাবিতেছিলাম, মা যখন সখীমার ডাকে তাঁর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন, আমিও চিন্তা করিতেছি, দেখি মা আসেন কিনা। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনি আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছেন। নরেশবাবু নিজেকে খুব ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন।

দারোগার নীরব ব্যাকুলতায় শ্রীশ্রীমায়ের থানায় পদার্পণ।

এত লোকজন সহ মাকে থানার ভিতর যাইতে দেখিয়া রাস্তার একটি লোক বলিয়া উঠিল— "মাকে দলবল সহ থানায় ধরিয়া নিল কেন?" এই কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। মাকে এই কথা বলায় মা হাসিয়া বলিলেন— **"কয়েক মিনিটের জন্য দারোগা বাবাজীর মনটা চুরি করিয়াছিলাম তাই ধরিয়া আনিয়াছে।"** এই কথায় সকলেই আনন্দ পাইলেন। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় দারোগাবাবু সপরিবারে ফল ইত্যাদি নিয়া ধর্মশালায় আসিলেন। তারপর হইতে সর্বদাই আসিতেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়

১৯শে, পৌষ, রবিবার (১৩৪৩ সাল) ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭। আজ দাদা বেরিলী হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ হিরণদিদি মার কাছে বলিলেন— "মা, অপর্ণা দেবীর (সি, আর, দাসের মেয়ে) নিকট তাঁহার স্বপ্নের বিষয় যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শুন"।

অপর্ণা দেবীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

একবার অপর্ণা দেবীর স্বামী সুধীর রায়ের খুব অসুখ। বিধান রায় চিকিৎসা করিতেছেন। যেদিন অবস্থা খুব খারাপ সেই রাত্রে বিধান রায় সমস্ত রাত্রি সুধীর রায়ের বাড়ী থাকেন। মধ্য রাত্রে অপর্ণা দেবী তোমাকে স্বপ্নে দেখেন, তোমার মুখ যেন খুব বিমর্ষ। তারপর শেষ রাত্রে আবার স্বপ্নে

দেখেন, খুব একটা জ্যোতির মধ্যে তোমার মূর্তি খুব হাসি খুসী। তুমি তাহাকে বলিতেছ, "তোমার মায়ের যে সোনালী বুটিদার শাড়ী আছে, সকালে স্নান করিয়া সেখানি পরিয়া রোগীর সেবা করিও।" অপর্ণা দেবী তাহাই করিয়াছিলেন। এবং তারপর থেকেই অসুখ কমিতে লাগিল।

কাল রাত্রে হিরণদিদিকে ও বেবিদিদিকে মা কীর্তন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ঢাকায় মেয়েরা প্রতি রবিবারে আশ্রমে আসিয়া কীর্তন করে। মা বলিয়াছেন, "কীর্তন আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং কীর্তনের শেষে কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া ধ্যান করা ভাল। এবং কীর্তনান্তে ধ্যানের পরে বাড়ী যাইবার পূর্বে ধ্যানের সময় কাহার মনে কি ভাব আসিয়াছিল আলোচনা করা ভাল।" আরও বলিয়াছেন, "কীর্তনের সময় সকলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে গোলাকার হইয়া ধীর ভাবে ঘুরিলে শরীরের একটা বিশেষ ক্রিয়া হয়।"

কীর্তন সম্বন্ধে মার উপদেশ।

আজ প্রাতে প্রবুদ্ধানন্দ স্বামী মাকে নিয়া একান্তে কথা বলিবার জন্য দরজা বন্ধ করায়, স্থানীয় উপস্থিত লোক সকল ভয়ানক চটিয়া গেল। মাকে তাহারা এক দণ্ডও ছাড়িয়া দিতে রাজী নয়। বদ্ধ দরজার সামনে, দাঁড়াইয়া কয়েকজন স্থানীয় লোক বলিতেছিল—"শীঘ্র দরজা খুলিয়া দিন, নতুবা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। একি অন্যায় কথা, আপনি আমাদের মাকে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" বাধ্য হইয়া প্রবুদ্ধানন্দ স্বামী দরজা খুলিয়া দিলেন এবং হাত জোড় করিয়া সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাকে ধর্মশালার বারান্দায় আনিয়া বসান হইল। সামনেই প্রকাণ্ড মাঠ খোলা পড়িয়া আছে; তার পরেই সুরধুনী। অনেক লোক আসিয়া মার কাছে বসিয়াছেন, একটি লোক প্রশ্ন করিলেন—"মা নামেই কি সব হয়?" মা বলিলেন,—"যতক্ষণ নাম রূপ আছে, ততক্ষণ নামেই সব। দেখনা,

যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণ নামেই সব।

একবার গিয়া নদীতে পড়িতে পারিলে তারপর স্রোতেই সমুদ্রের দিকে ভাসাইয়া নিয়া যায়। তখন আর কিছু করিবার থাকে না। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত নাম করিতে হয়। তোমরা সব কাজ নিজের বুদ্ধিতে করিতে পার, আর এই সময় যে বলিয়া বস 'তিনি করাইলে করিব' এ কথা ঠিক নয়।" একজন বলিলেন—"মা, আমি এখন উঠি।" মা বলিলেন, "ওঠো, কিন্তু দেখিও, নামিও না। আমি ত বলি সকলেই ওঠো।" মা প্রায়ই একথাটি বলেন।

দৃশ্য ও দ্রষ্টা সম্বন্ধে মার উক্তি।

প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সহিত 'দৃশ্য' ও 'দ্রষ্টা'র কথা হইতেছে। মা বলিতেছেন,—"যদি কাহাকেও দৃশ্য শূন্য দ্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তবে বুঝিতে হইবে জাগতিক স্থূল দৃশ্যের উপরে যাইতে হইবে। কারণ, বিচার করিলেই বুঝা যায়, যে বাস্তবিক দৃশ্য ছাড়িয়া যাওয়া যায় না। কারণ, যদি কেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চায়, তবে দৃশ্য থাকিবেই। চিন্তাটা ও দ্বৈত জগতের এবং দৃশ্যও। সুতরাং দেখা যায়, যে যে ব্রহ্ম কল্পনা করে, সে অহংকার ও বুদ্ধির সাহায্যেই ব্রহ্ম কল্পনা করে।" তারপর 'ইচ্ছা' সম্বন্ধে কথা হইতেছে। মা বলিতেছেন— "ইচ্ছা শূন্য অবস্থার জন্যই সকলে চেষ্টা করে; নিজের ইচ্ছা থাকিতে শান্তি নাই। শান্তি তখনই হয়, যখন নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া যায়। তখন তাঁহার ইচ্ছাই নিজের ইচ্ছা বলিয়া মনে হয়। এবং ইচ্ছার জন্য কোন অশান্তি আসিতে পারে না।"

নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছাতে মিলাইয়া দেওয়াই শান্তি।

ত্রিগুণাদাদার কীর্তন।

ত্রিগুণা দাদা কীর্তনে বসিলেন। গাহিতেছেন "তুমি মধু, তুমি মধু," ইত্যাদি; সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন।

মা ভক্তদের নিয়া সুরধুনীর তীরে গিয়াছেন। নৌকায় বসিয়া একজন একজন করিয়া ভক্তদের ব্যক্তিগত কথা শুনিলেন। প্রাণকুমারবাবু ও তাঁর স্ত্রী যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন নৌকা প্রায় সুরধুনীর মাঝে, ঘাট হইতে বেশ দূরে চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে একখানি বড় নৌকা আসিতেছিল, তাহার উপর পুলিশও ছিল। নৌকাখানি যখন মায়ের নৌকার কাছাকাছি আসে, তখন প্রথমোক্ত নৌকার মাঝি ডাকিয়া বলিতেছিল— "তোমাদের নৌকা এক ধার কর, হাকিমের নৌকা আসিতেছে।" কিন্তু মাঝি জানিত না, যে তার আগের ছোট্ট নৌকাটিতে যিনি ছিলেন, তিনি হাকিমেরও হাকিম এবং তাহার নৌকার হাকিম সপরিবারে তাঁকেই দর্শন করিতে আসিতেছিলেন। ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরের পুলিশ সাহেব। মায়ের নাম শুনিয়া সপরিবারে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। খুব অনুরাগী ও বিনয়ী লোক। তাহাদের নৌকা ঘাটে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে মার নৌকাও আসিয়া তীরে লাগিল। ঘাটেই মার দর্শন পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা সকলকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণনগরের পুলিশ সাহেবের মাকে দর্শন।

সেদিন ত্রিগুণাদাদা মায়ের ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আজ কৃষ্ণনগরের ডেপুটী পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ও মার দর্শনে সপরিবারে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সকলে মিলিয়া আনন্দ করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। হঠাৎ মা সকলের প্রসাদ পাওয়া দেখিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ৮।৯ বৎসরের একটি বালকের সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন। বালকটি মাকে খাওয়াইয়া দিল এবং মাও তাকে খাওয়াইয়া দিলেন। পরে ভক্তেরাও সব এক এক করিয়া মার হাত হইতে প্রসাদ নিয়া খাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সাহেবটিও ছেলে মানুষের মত মায়ের কাছে খাইতে

মা অন্তর্যামিনী; ভক্তের আকাঙ্খা পূর্ণ করেন।

চাহিলে মা তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দেন, ও নিজ হইতে তাঁহার মাথায় হাত দেন। ইহাতে ভদ্রলোক উন্মাদের মত বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "আর আমি কিছু খাইতেছি না—প্রসাদ পাইয়াছি। আমি মনে মনে খুব আকাঙ্খা করিতেছিলাম, যে মা আমার মাথায় একটু হাত দেন। অন্তর্যামিনী মা আমার অন্তরের ভাব বুঝিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। পূর্ণবাবুর স্ত্রীর সুন্দর ভাবটুকু দেখিয়া, মা তাঁহাকে 'পাগলী মা' বলিয়া ডাকিলেন।

আহারাদির পর বৈষ্ণবী মার বাড়ীতে যাওয়ার কথা পূর্বেই হইয়াছিল। বেলা ৩টা কি ৪টা হইবে; মা সকলকে নিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সুরধুনীর তীরে নগর সংকীর্তন। মার অপূর্ব্ব ভাবময় রূপ।

সুরধুনীর তীরে তীরে ভক্তদের নিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে নিতাই নামে একটি বালক ছিল। ছেলেটি সুন্দর খোল বাজাইতে পারে, সে খোলটি সঙ্গে নিয়াই চলিয়াছে। রাস্তায় সে খোল বাজাইতে আরম্ভ করিতেই যতীশদা, অবনীদা, ত্রিগুণাদাদা, ব্রজেন, নীতীশ প্রভৃতি নাম ধরিল। "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম চলিতে লাগিল। মা মেয়েদের বলিলেন, "তোমরা চুপ করিয়া আছ কেন, উহাদের সঙ্গে সঙ্গে নাম কর।" মার আদেশে মহা আনন্দে মেয়েরাও যোগ দিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলা পড়িয়া আসিল। মার সঙ্গে বহু লোক চলিয়াছে —স্থান কাল পাত্র সবই অনুকূল মিলিয়াছে। মহা আনন্দে ভক্তেরা গাহিয়া চলিয়াছেন। মা বাম হাতখানি ঊর্ধ্বে উঠাইয়া নামের তালে তালে দোলাইতেছেন। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ আভাটুকু মার মুখে পড়িয়াছে। একেই অনবরত কীর্তনে মার মুখের অপরূপ মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তার মধ্যে সূর্যের আলোক পড়িয়া সে রূপ যেন শতগুণে বাড়িয়া গেল। ভক্তেরা মায়ের এই অপূর্ব ভাবময় রূপ দেখিয়া নামে মাতিয়া উঠিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা দলে দলে আসিয়া কীর্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিরাট এক সংকীর্তনের দল গঠন হইয়া গেল। অনেকের প্রাণেই, প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নগর সংকীর্তনের লীলার কথা জাগিয়া উঠিল। এই ভাবে সংকীর্তন করিতে করিতে সকলে মার সঙ্গে প্রথমে বৈষ্ণবী মার বাড়ী, পরে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গেলেন। মহাপ্রভুর বাড়ী যাওয়ার পথে মার ইঙ্গিতে এক কমলালেবু বিক্রেতার নিকট হইতে তাহার ঝুড়ির সমস্ত কমলালেবু কিনিয়া রাস্তায় লুট দেওয়া হইল। রাস্তায় অনেকেই বাতাসা লুট দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কীর্তন হইল।

ব্রজেন নবদ্বীপ ধামে পৌঁছিয়াই মাকে বলিয়াছিল—"গৌরের দেশে আনিলে, গৌর দেখাইবে না?" ব্রজেনের সেই কথা খেয়াল ছিল না কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যেও মা ব্রজেনকে কাছে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি না গৌর দেখিতে চাহিয়াছিলে?" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ গৌরাঙ্গ।" এই কথায় ব্রজেনের আনন্দ আর ধরে না।

শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন।

মা মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথ কতকটা অন্ধকার। এবার মা দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাহাতে এমন একটা ভাবের সমাবেশ হইল, যে মেয়েদের দলও তাহাদের স্বাভাবিক লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া গিয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। একটু পরেই মা তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুত গতিতে চলিলেন। অন্ধকার থাকায় এ দৃশ্য বাহিরের লোকে বিশেষ দেখিতে পাইল না কিন্তু উপস্থিত ভক্তদের কাছে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিল। সোনার গৌরাঙ্গের বাড়ীতে

সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ীতে সংকীর্তন।

মা আসিয়া পৌঁছিলেন। বৃহৎ আঙ্গিনায় কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। মাও মধ্যে মধ্যে কীর্তনে যোগ দিতেছেন আবার হঠাৎ উপরের সিঁড়িতে গিয়া স্থির ও শান্তভাবে দাঁড়াইয়া যেন কীর্তন দেখিতেছেন। আবার আসিয়া কীর্তনের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ভাবাবেশে দুই বাহু তুলিয়া এমনভাবে টলিতে টলিতে ঘুরিতেছেন, ভয় হইতেছিল মায়ের দেহ বুঝি মাটিতে পড়িয়া যায়। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হইবার পর মা হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সকলের খেয়াল হইল, মা বাহির হইয়া গিয়াছেন। সকলে ছুটাছুটি করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সকলেই আগে মায়ের কাছে যাইতে চায়, কাজেই দরজার নিকটে ভয়ানক ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। রাস্তায় সকলে আবার মায়ের সঙ্গে মিলিলেন।

শ্রীবাস অঙ্গনেও কিছু সময় কীর্তন হওয়ার পর মা সকলকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিবার পথে এক কাঁসারির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীমায়ের নানা লীলা।

দোকানদারকে বলিলেন—"বাবা, আমাকে ছোট ছোট দুটি কলসী দেবে?" তাহারা অবাক হইয়া তখনই দুটি কলসী মায়ের হাতে দিল। মা তাহা কাঁখে নিয়া বলিলেন,— "আমরা গোপিনী।" কিছুদূর গিয়াই পথে দুইটি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া মা বলিলেন, "বাবা, এই কলসী দুটি তোমরা নাও, খাবার জল রাখিও।" এই বলিয়া কলসী দুইটি তাহাদের হাতে দিলেন। তাহারাও অবাক হইয়া রহিল। মা—"বাবা, বাবা" বলিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিলেন। এই ভাবে নানা লীলা করিতে করিতে মা সকলকে নিয়া ধর্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কীর্তন বন্ধ হইল—সকলকে বলিলেন, "তোমরা আজ কি কাণ্ডটাই করিলে! এই ভাবে কীর্তন হইবে বলিয়া ত বাহির হওয়া হয় নাই? ঘটনাচক্রে হইয়া

গেল।" একজন বলিল, "এমন ভাবে স্ত্রী, পুরুষ মিলিয়া নগর কীর্তন হইবে কেহ স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

পরে মা বারান্দায় গিয়া একা একা ব্রজেনকে পায়চারি করিতে দেখিয়া বলিলেন—"তোমার আশা পূর্ণ হইল ত? তুমি না আমার সঙ্গে মহাপ্রভুর বাড়ী এবং অন্যান্য ঠাকুর বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলে? সেই উপলক্ষে তোমার জন্যই আজ এত কাণ্ড হইয়া গেল। ইহার পূর্বেও একদিন সকলকে নিয়া মন্দিরে মন্দিরে যাওয়া হইয়াছিল, তখন তুমি কলিকাতায় ছিলে।

মা স্বেচ্ছায় কিছু করেন না; ভক্তদের ভাবের অনুরূপ কার্য হইয়া যায়।

প্রত্যেক মন্দিরে গিয়াই তোমার কথা খেয়াল হইয়াছিল। খুকুনিকে বলিয়াছি, ব্রজেনের আমার সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই তাহার কথা খেয়াল হইতেছে। ব্রজেন আসিলে মনে করিও তাহাকে এই কথা বলিতে হইবে। আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না, তোমাদের ভাবে যেমন করাইয়া লও তেমনই হইয়া যায়।" ব্রজেন এই সব কথা শুনিয়া আনন্দে ভক্তিভাবে মায়ের চরণে প্রণাম করিল। মা হাসিয়া বলিলেন, "আর একটা প্রণাম পাওয়া গেল।"

একষষ্টিতম অধ্যায়

২০শে, পৌষ, সোমবার (১৩৪৩ সাল) ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৭। আজ প্রাতে মা উঠিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা গিয়া মার কাছে বসিলেন। কাল রাস্তার যে সন্ন্যাসী দুইটিকে মা কলসী দিয়াছিলেন, তাহাদের কথা হঠাৎ মার খেয়াল হইল। একটু পরেই সন্ন্যাসী দুইটি আসিয়া উপস্থিত হইল। আজও মা বৈকালে সকলকে নিয়া নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী মেয়েদের লইয়া নাম ধরিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত মা নৌকায় বেড়াইয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন। অনেকে আসিয়াছেন। কথাবার্তা হইতেছে। আবার কীর্তন আরম্ভ হইল। হিরণদিদি নাম উঠাইলেন সঙ্গে সঙ্গে লতিকা, যূথিকা, শেফালি, বিজলী, অনু প্রভৃতি মেয়েরাও যোগ দিল।

ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন।

সেই বৈষ্ণবী মাও আসিয়াছেন। নাম চলিতে লাগিল। মা ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বৈষ্ণবী মা আসিয়া মাকে মুকুট ও মালা দিয়া সাজাইয়াছেন। মা খানিক পরে সব খুলিয়া ফেলিলেন। মালা গলায় রহিল। মা হাততালি দিয়া নাম করাইতে লাগিলেন। সকলেই প্রাণ খুলিয়া নাম করিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলেই আরও আনন্দে নাম করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষদাদা অপর কোঠায় বসিয়াছিলেন, মা তাঁহাকেও ডাকাইয়া কীর্তনে বসাইলেন। রাত্রি প্রায় ১১টা। অনেকক্ষণ নাম চলিল। এর মধ্যে একটি পাগলীর সহিত তুরীয়ানন্দের কি একটু গোলমাল লাগিতেই মা সেই পাগলীর গলায় নিজের গলার মালা পরাইয়া দিলেন ও তাহাকে খুব আদর করিয়া নাম করিতে বলিলেন। পাগলী খুব চটিয়াছিল, কিন্তু মার এই ব্যবহারে সেও মহানন্দে নাচিতে লাগিল। খানিক পরে কীর্তন বন্ধ হইল। কথাবার্তায় রাত্রি প্রায় ২টা বাজিল।

আজ ত্রিগুণা দাদা তার মাকে লইয়া রাত্রি ৩টার গাড়ীতে রওনা হইয়া গেলেন। মা শুইয়া ছিলেন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় মা হিরণদিদিকে নিয়া সুরধুনীর দিকে গিয়া একটু বেড়াইয়া আসিলেন। পরে ধর্মশালায় ফিরিয়া সকল ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন। রাত্রি প্রায় ৪টায় বিছানায় আসিয়া বসিলেন; কিন্তু শুইতে পারিলেন না। প্রায় ৫টার সময় একটু শুইলেন। এর মধ্যে একদিন বলিয়াছিলেন, "খুব ফরসা রং একটি লোকের রক্ত পড়িতেছে দেখিতেছি।" ২১শে মঙ্গলবার প্রাতে মা উঠিয়া সুরধুনীতে নৌকায় গেলেন। জ্যোতিষদাদা ও প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীর কি কথা গোপনে বলিবার ছিল, তাহা শুনিলেন। পরে উঠিয়া আসিয়া একটু জল খাইলেন। দিন দিনই লোকের এত ভীড় যে, মার কাছে যাওয়াই মুস্কিল। নৌকায় গেলেও দলে দলে লোক পারে পারে ঘুরিতে থাকে; কতই আগ্রহে তাহারা মার অপেক্ষা করিতে থাকে। মাকে কোথায় দাঁড়াইলে একটু দেখা যাইবে, তাহারা তাহাই বলাবলি করিতে থাকে। মা ফিরিয়া আসিয়া একটু শুইলেন। জ্যোতিষদাদা মার আদেশে আজই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। শরীর ভাল নয়, একবার ভাল করিয়া ডাক্তার দেখাইয়া আসিবেন। হরিসভার কর্ত্রী আসিয়া মাকে সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। সারাদিনই প্রায় কীর্তন চলিল। মার ভোগ হইল। নানাস্থান হইতে লোক আসিয়াছে, ঘরে ভয়ানক ভীড় হইতেছে। আজ অনেকে মাকে নিয়া ফটো তুলিল। মা প্রাণকুমারবাবুর স্ত্রীর কোলে বসিয়া ফটো তুলাইলেন। মা তাঁহার নাম দিয়াছেন, "যোগিনী মা"। সন্ধ্যায় আর জায়গা না হওয়ায় মা বারান্দায় গিয়া বসিয়াছেন। বলিতেছেন "নাম কর। শুধুমুখে বসিয়া থাকিতে নাই"; আবার মেয়েরা নাম ধরিল।

মার দর্শন আশায় লোকের ভিড়।

এর মধ্যে একটি পণ্ডিত লোক মার সঙ্গে কথা বলিতে আসিলেন।

প্রশ্ন করিলেন, তাহার মোট কথা এই যে, "আপনি কোন সম্প্রদায়ের? সকলেরইত একটা নিয়ম পদ্ধতি আছে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "সকলেরই গুরু থাকে, কাজেই সম্প্রদায় থাকে। আমার কথা এই যে ছোট বেলায় পিতা মাতা গুরু ছিল। পরে এক জনের হাতে গোত্রান্তর করিয়াছিল, সেই গুরু। তারপর এখন দেখিতেছি তোমরা সকলেই, এমন কি গাছ, লতা, পাতা পর্যন্ত সকলেই গুরু।" সেই পণ্ডিতটি বলিলেন, "কিন্তু সকলেরই পূর্বজন্মের সাধনার একটা সঙ্কল্প থাকে, সেই অনুসারেই তাহার সাধন ভজনের পদ্ধতি হয়।" মা বলিলেন, "ইহা অতি সত্যকথা, কিন্তু এই শরীরটার কথা এই যে আমি শিশুকালেও যেমন ছিলাম এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছি। কোনই পার্থক্য বুঝিনা। তোমায় কি বলিব বল বাবা! এখন আমি কোন সম্প্রদায়ের তুমি বুঝিয়া নেওত।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। আরও কিছু সময় আলাপ করিয়া পণ্ডিতটি চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি মার এই ভাবটি ধরিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। কিছু সময় পরেই হরিসভার কর্ত্রী আসিয়া মাকে তথায় নিয়া গেলেন। বহু লোক সঙ্গে চলিল। সেখানে ৺গৌরাঙ্গের ও ৺শিব পার্বতীর মূর্তি। সকলে মিলিয়া সেখানে কিছু সময় কীর্তন হইল। পরে মা সকলকে নিয়া ধর্মশালায় ফিরিলেন।

মা কোন সম্প্রদায়ের।

আজ বৈকাল ৪টার গাড়ীতে কলিকাতায় সকলের ফিরিবার কথা ছিল। শেষে নানা কথার পর মা বলিলেন "রাত্রি ৩টার গাড়ীতে সকলে যাইও।" তাহারা বলিল, রাত্রি ৩টার গাড়ীতে যাওয়ার কি দরকার? তবে আগামী কল্যই বেলা ১২টার গাড়ীতে যাওয়া যাইবে। এদিকে মা আজ দুইদিন হইতেই এমন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যে ভোলানাথ আসিলেই রওনা হইবেন। অথচ যাহা খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভোলানাথের আসার দেরী আছে।

৺নবদ্বীপ পরিত্যাগ।

কিন্তু মা বলিতেছেন, "ভোলানাথের আসিবার গাড়ীর সময় কি আজ চলিয়া গিয়াছে," ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যই আজ সন্ধ্যার পরেই ভোলানাথ আসিয়া উপস্থিত। তিনি খুব তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়াছেন। শরীর ভাল নয়। কিন্তু মা একটু পরেই গিয়া ভোলানাথকে বলিলেন—"চল না আজই ৩টার গাড়ীতে আমরা কলিকাতায় যাই পরে যাহা হয় হইবে।" এই বলিয়া ভোলানাথকে রাজি করাইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার বাবা এইমাত্র আসিয়াছেন। তিনি বুড়া মানুষ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।" অমনি মা এমনি শিশু মেয়েটির মত বাবাকে গিয়া ধরিলেন, "বাবা, ভোলানাথের মত হইয়াছে, এখন আপনার মত হইলেই যাওয়া হয়।" এই বলিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে দাদামহাশয় মত না দিয়া পারিলেন না। অমনি সকলকে বলিলেন—"সব প্রস্তুত হও, আজই রাত্রি ৩টার গাড়ীতে যাওয়া হইবে।"

আর কি, হাট ভাঙ্গিল। প্রায় ৩৫ জন লোক সঙ্গে। সকলেই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাত্রি ৩টার গাড়ীতে মা সকলকে নিয়া রওনা হইলেন। "নবদ্বীপবাসীরা ২।১ জন মাত্র এই খবর পাইল; আর কেহই জানিল না। হঠাৎ মা চলিয়া আসিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

২২শে, পৌষ, ১৩৪৩ (৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ প্রাতে আসিয়া মা সকলকে নিয়া কলিকাতা পৌছিয়াছেন। একটি শিবমন্দিরে উঠিয়াই মা কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। কলিকাতার কেহই জানে না, তাই স্টেশনে এবার কেহই ছিলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা খবর পাইয়া আসিতে লাগিলেন। মা আজই রাত্রির গাড়ীতে অন্যত্র যাইবেন।

কলিকাতায় আগমন।

আসিবার সময় রাস্তায় কথা হইতেছিল; দিদিমা সঙ্গে ছিলেন তাই মার ছোট বেলার কথা আবার উঠিয়াছে। মার প্রতি কাজটিই সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে হইয়া যাইত, কাপড়খানা পরা পর্যন্ত নিখুঁত। কেহ যেন শরীর না দেখে আবার তাহার মধ্যে যেন একটা সৌন্দর্য থাকিত।

শ্রীশ্রীমার ছোট বেলার কথা।

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন "ছোট বেলায় যেমন সোজা সরল থাকিতে হয় শরীরটা দিয়া সেইরূপই হইয়া গিয়াছে। আবার বউ সাজিলে যেমন হওয়া দরকার তেমনই হইয়া গিয়াছে। আমি যেন সব দেখিয়া যাইতাম। দেখিতাম, যখন যাহা হওয়া দরকার শরীরটা দিয়া হইয়া যাইতেছে। কীর্তনের সময় যখন শরীরটা পড়িয়া থাকিত, আমি দেখিতাম শরীরটা পড়িয়া আছে। কীর্তনে যাহারা বসিয়া আছে দেখিতাম সবই যেন আমি। এমন কি তাহাদের ভাবগুলিও যেন আমি, খোল, করতালও যেন আমি। গানের শব্দ যতদূর যাইত মনে হইত সেই শব্দও যেন আমি। এমনই একটা অবস্থা হইয়া যাইত।"

আবার বলিতেছেন ঃ "এই যে, যে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করে তখনই তাহার উত্তর হইয়া যায়; সংসারী বিষয় ও সব তন্ন তন্ন করিয়া উত্তর

হইয়া যায়, যে সব সংসারী ব্যবহার এই শরীরটা দিয়া হয় নাই কিন্তু বুঝাইবার সময় সব উত্তর হইয়া যাইত। শরীরটা দিয়া যতটুকু দরকার ততটুকুই হইয়া গিয়াছে। হয়ত তোমাদের সাধনার বিষয়গুলিই বিশেষ দরকার ছিল, তাই এই শরীরটার ভিতর দিয়া সাধনার ভাবগুলি ও কার্যগুলিই বিশেষভাবে হইয়া গিয়াছে। আমার ত কিছুই দরকার ছিল না। আমার মনে হয় ছোটবেলায় যে খেলাধূলা করিয়াছি, এই যে যৌগিক ক্রিয়াগুলি শরীরের ভিতর দিয়া হইয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক তেমনই। তাই বলিতেছি হয়ত তোমাদের আবশ্যক ছিল তাই একটার পর একটা খেলা এই শরীরের ভিতর দিয়া হইয়া গিয়াছে। যেটুকু প্রয়োজন শরীর দিয়া তাহা হইয়া গেলেও এমন একটা অবস্থা আছে যে, কোন বিষয়ই অজানা থাকে না, তাই সব বিষয়ই বুঝান সম্ভব হয়। যেমন সব ভাষা, যে ভাষা জীবনে কখনও শুনি নাই, সে সব ভাষায়ও সূক্ষ্ম শরীরীদের সহিত কথা হইয়া যায়। যেমন তোমার কাছে একজন হিন্দুস্থানী আসিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দিতেই জবাব দেও সেই রকম হয়ত পাহাড়ে গিয়াছি, তথাকার কোন সূক্ষ্ম শরীরীদের পাহাড়ী ভাষায়ই জবাব হইয়া যাইত।"

আরও একটি ঘটনার কথা উঠিল। ইহা ঢাকেশ্বরী বাড়ীর প্রণামের ঘটনার অনেক পূর্বের ঘটনা। একবার অষ্টগ্রাম হইতে মা কসবার কালীবাড়ী গিয়াছেন, সেখানেও প্রণাম প্রদক্ষিণ করিবার পর মার মুখ চোখের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়া গিয়াছিল যে শত চেষ্টায়ও তাহা সম্পূর্ণভাবে গোপন করিতে পারিতেছিলেন না। এই ঘটনার কথায় মা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কেমন ভাব হইত জান? এই প্রণামাদি করিতে গেলেই, যে দেবতার সন্মুখে প্রণাম করা হইত, সেই দেবতার সঙ্গে যেন একত্ব ভাব হইয়া যাইত। আর শরীরের মধ্যেও কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসিয়া পড়িত।" আবার বলিতেছেন, "দেখ, ঠাকুর ঘরে যখন

ছোটবেলায় কাজ করিতে যাইতাম, মা বলিয়া দিতেন, 'সাবধান, ঠাকুরের চৌকী যেন ছোঁয়া না যায়,' কিন্তু কি আশ্চর্য আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতাম না, বিশেষতঃ মার আদেশ এই অবস্থায় কি করিয়া বলিতে পারি না ঠাকুর ছোঁয়া হইয়াই যাইত, হাত লাগিয়া যাইত। তখনই ভাবিতাম এ কি হইল? আবার তখনই নিজের মনে মীমাংসা আসিত আমি ত ইচ্ছা করিয়া করি নাই। কিন্তু ঠাকুর ঘরের কাজ করিয়া যখন বাহির হইতাম, তখন এই ছোঁয়ার কথা আর মনেই থাকিত না। তাই কাহাকেও বলিতে পারিতাম না।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "মা যাহা, আবশ্যক তাহাই তোমার শরীরে হইয়া গিয়াছে। তুমি এ কথা বলিলে যে আবার ঠাকুরের অভিষেক করাইতে হইত; কিন্তু তাহার ত কোন দরকার নাই, তাই বলিতে পার নাই।"

আজ নেপাল রাজার বাড়ীর মেয়েরা ও ত্রিপুরা রাজার রানী ও পরিবারস্থ অনেকে মার দর্শনে আসিয়াছেন। মা লেকের নিকটে শিবমন্দিরে আছেন। আজই রাত্রির গাড়ীতে মা ও ভোলানাথ আমাদের নিয়া ঢাকা রওনা হইলেন। অখণ্ডানন্দজীকে বিন্ধ্যাচল ও জ্যোতিষদাদাকে বেরিলি পাঠাইলেন। অতুল ও শিশির আমাদের সঙ্গে আছে। স্টেশন হইতে গ্রেস্ট্রীটের উপেন্দ্র ঘোষ উকিলের মেয়ে অমলা আমাদের সঙ্গে চলিল। সে ট্রেনে উঠিয়া মার মুখের দিকে এমনভাবে চাহিয়া আছে যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া মা বলিলেন, "কি দেখ"? সে বলিল, "তোমায় দেখিতেছি" এমন মৃদু হাসিয়া ছলছল চোখে সে এই কথাটি বলিল যে শচীদাদা শুনিয়া বলিলেন, "তুই মার সঙ্গে যাবি?" উপেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি বলিলেন "মার সঙ্গে যাইবে, তার আর জিজ্ঞাসা কি?" তখনই টিকিট কিনিয়া আনা হইল। অমলা মার সঙ্গে চলিল। খুবই আনন্দের সহিত সে মার দিকে চাহিয়া

ঢাকায় গমন।

ধীরে ধীরে বলিল, "এই কথা মনে খুব জাগিয়াছিল, তুমি বাসনা পূর্ণ করিলে।" মেয়েটির ভাব অতি চমৎকার।

২৩শে পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ আমরা ঢাকা পৌঁছিলাম। নারায়ণগঞ্জ স্টীমার আসিতেই দেখি, ভূপতিদাদা, অমূল্যদাদা, নগেনদাদা, যতীনদাদা প্রভৃতি অনেকেই মাকে নিতে আসিয়াছেন। সকলে মাকে নিয়া ঢাকা পৌঁছিলেন। স্টেশনেও অনেকেই আসিয়াছেন। রমনা আশ্রমে পৌঁছিতেই কেহ ফুল, কেহ খই ছিটাইতে লাগিল। আশ্রমের দরজায় কলাগাছ ও মঙ্গল কলসী স্থাপিত করা হইয়াছে। মা গিয়া কীর্তনের ঘরে বসিলেন। খবর পাইয়া দলে দলে লোক মার দর্শনে আসিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১২টায় মাকে বিশ্রাম করিবার জন্য শোয়াইয়া দেওয়া হইল। মা সকলকে নিয়া কীর্তনের ঘরেই শুইলেন।

২৪শে পৌষ শুক্রবার, ১৩৪৩ (৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজও সকালে মা উঠিয়াছেন; ভক্তেরা আসিয়া বসিয়া আছে। মা সকলকে নিয়া একবার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া কিছু সময় থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। রাত্রি ১২টা অবধি সকলে মাকে ঘেরিয়া রহিল, মার অমৃত বাণী সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। মার মুখখানা দেখিয়া যেন কাহারও তৃপ্তি হইতেছে না। রাত্রি ১২টার পর মা মেয়েদের নিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। ঢাকার মেয়েদের দুঃখ ছিল যে মা সিমলাতে মেয়েদের নিয়া যে ভাবে কীর্তন করিয়াছেন ঢাকায় তেমন ভাবে করেন নাই। আজ তাহাই হইল। মহানন্দে মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিতেছেন। মাও দুই হাত তুলিয়া কখনও তালে তালে বাম হাতখানি দুলাইয়া দুলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। কখনও কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া তালে তালে নাচিতেছেন। অমলা কিন্তু কীর্তন সাঙ্গ হইবার সঙ্গেই শুইয়া পড়িয়াছে,

ঢাকায় মেয়েদের নিয়া কীর্তন।

মা তাহার গায় হাত বুলাইয়া দিলেন। বলিলেন উপস্থিত যে ভাব এমন সুন্দর ভাব বড় দেখা যায় না। এই সব মেয়েরা যদি সহায়তা পায় তবে খুব সুন্দর ভাব ফুটিতে পারে। বাস্তবিকই মেয়েটির চক্ষু দুইটিই যেন ভাবে ভরা। সারা রাত্রি কীর্তন হইল। ভোরে প্রভাতী কীর্তন করিয়া কীর্তন শেষ করা হইল।

২৫শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৩ (৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ ১১টায় মা ঢাকা হইতে রওনা হইবেন, কাজেই মেয়েরা প্রায় সকলেই আশ্রমে রহিয়া গেলেন। দাদামহাশয়ের শরীর ভাল নয়। মা একবার তথায় গিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। রমনার কালীবাড়িতেও গেলেন। এই করিতে করিতে যাইবার সময় হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মাকে খাওয়াইয়া দিলাম। সময় অল্প, অতিব্যস্তভাবে মা সকলকে নিয়া মোটরে বসিলেন। স্টেসনে বিষণ্ণ বদনে সকলে মাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। এত অল্প সময়ে ঢাকায় থাকাতে কাহারও তৃপ্তি হইতেছে না। কিন্তু মা বলিলেন ২৯শে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিতে হইবে, তাই দেরী করা চলে না।

ঢাকা হইতে বহরমপুর।

মা ঢাকা হইতে রওনা হইয়া বহরমপুর চলিলেন, অবনীবাবু ও সুধাংশু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তের আহ্বানে তথায় যাওয়া হইতেছে।

২৬শে পৌষ, রবিবার, (১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৭) বহরমপুর যাওয়ার পথে আজ প্রাতে কৃষ্ণনগরে পৌঁছিলাম। এখানকার কয়েকজন ভদ্রলোক নবদ্বীপ গিয়া মাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। সকলেই একবার মাকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মা তাই কৃষ্ণনগর নামিলেন। ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট ও বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এবং মোহিনী বাবুই (ইনিও পুলিশে কাজ করেন) বিশেষভাবে মাকে অনুরোধ

পথে কৃষ্ণনগরে।

করিয়াছিলেন। স্টেশনে আসিয়া শিশিরকে তাঁহাদের খবর দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে মাকে মুখ ধোয়াইবার জন্য জল আনিতে গিয়াছি, দেখি, মফঃস্বল যাইবার জন্য ডেপুটী পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। মাকে দেখিয়া তিনি দৌঁড়িয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন ও নিজের লোক দিয়া মাকে মঠিয়াতে পাঠাইলেন। তিনিও শীঘ্রই আসিতেছেন বলিয়া গেলেন। আমরা মঠিয়াতে যাওয়ার পরই মোহিনীবাবু ও পূর্ণবাবু সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত। আরও বহুলোক দেখিতে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ানক ভিড় হইল। কয়েকজন সেখানে ভোলানাথের কাছে দীক্ষা নিলেন। বেলা প্রায় ৮।৯ টায় আমরা তথায় পৌঁছিয়াছিলাম আবার ৪টার গাড়ীতে মা বহরমপুর রওনা হইলেন। এই সময়ের মধ্যেই লোকের অসম্ভব ভিড়। সকলেই মাকে ভগবতীরূপে পূজা করিতে ব্যস্ত। কেহ খবর দিল না, কিন্তু শুনিলাম কৃষ্ণনগরের লোক মার কাছে আসে নাই এমন আর বেশী বাকী নাই। মাকে এর মধ্যেই ২।৪ বাসায় নিয়া গেল। এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ী নিয়া গেলেন। শুনিলাম তাঁহার বাড়ী মনসা আপনিই আসিয়াছেন; তাঁর স্ত্রীর উপর আবেশ হয়। কেহ সেই মনসার ঘটের কাছে হত্যা দিলে ব্যারামের ঔষধ পাওয়া যায় এবং তাঁর স্ত্রী আবেশ অবস্থায় সেই ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম বলিয়া দেন। টাকা পয়সা নাকি অনেক সময়েই সেই বাসায় পড়ে, অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই টাকা মাকে আনিয়া দেখাইল। একটা বাটির ভিতর জমা করা হইতেছে। মনসার ঘট-স্থাপন যে স্থানে আছে সেই স্থানেই রাখা হইয়াছে। আরও ৩।৪ বাসায় মাকে নিয়া গেল। পূর্ণবাবু মা ও ভোলানাথকে সস্ত্রীক বসিয়া পূজা করিলেন। ফল স্তূপাকার হইল, সব লুট বিলাইয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ কীর্তনও হইল। বেলা ৪টায় মা বহরমপুর রওনা হইলেন। সন্ধ্যা ৭টায় বহরমপুর পৌঁছিলাম। অবনীদাদা

প্রভৃতি অনেকেই স্টেশনে ছিলেন। মাকে নিয়া সেরিকাল্‌চার ডিপার্টমেন্টের একটি বাংলায় উঠান হইল। এই সব ঘরে রেশমের পোকা থাকে; এখন কয়েকটি খালি ছিল। সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণ কীর্তনাদি হইল। পরে খাওয়া দাওয়ার পর সকলে বিশ্রাম করিলেন।

বহরমপুর হইতে কলিকাতা আগমন।

২৭শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৩ (১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ প্রাতে মা উঠিয়াছেন, আজই ৫টার গাড়ীতে মা রওনা হইবেন। মাকে সুধাংশুদের বাসায় এবং একটি আশ্রমে নিয়া যাওয়া হইল। শুনিলাম, এই আশ্রমে মেয়েরা একত্র কীর্তন ও পাঠ ইত্যাদি করেন। মাকে তথায় নিয়া মেয়েরা সব বসিলেন। পরে মাকে জল খাইতে দেওয়া হইল। মা গিয়াই কিছু সময় শুইয়া রহিলেন। মাটিতেই কোলের উপর মা শুইয়া পড়িলেন। উঠিলে তাঁহাকে একটু জল খাওয়ান হইল। অমলা প্রায়ই আপন মনে বসিয়া থাকে, এখনও প্রসাদ নিতে ডাক হইল কি জানি কি ভাবে তাহার একটু কান্নার ভাব আসিল ও মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। মা বলিলেন, **“দেখ, এখনত কীর্তনও নয় কিন্তু ওর ভিতরের ভাবেই ও ডুবিয়া আছে।”** মা একটু গায়ে হাত বুলাইলেন আমরা একটু চেষ্টা করায় সে উঠিয়া মার সঙ্গে সঙ্গে চলিল কিন্তু কেমন যেন উদাস ভাব, অন্যমনস্ক দৃষ্টি। মা ফিরিয়া আসিয়া একটু জল খাইয়াই সকলকে নিয়া বসিলেন। যাওয়ার সময় হইয়া আসিল, মা সকলকে নিয়া স্টেশনে গেলেন। এত অল্প সময়ে সকলেই অপরিতৃপ্ত। কিন্তু মা রওনা হইয়া আসিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম। শচীদাদাকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। অনেকেই স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সকলে মাকে বিড়লার শিব মন্দিরে নিয়া আসিলেন। প্রাণকুমারবাবুর ও শচীদাদার এবং যতীশদাদার বাসার অনেকেই আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত কথাবার্তা চলিতে লাগিল।

রাত্রিতে পুরান কথা উঠিল। মা বলিতেছিলেন যে তাঁহার বিবাহ ১২ বৎসর ১০ মাস বয়সে (মাঘ মাসে) হয়, তারপর ৪ বৎসর তিনি ভাসুরের কাছে থাকেন। ভাসুরের মৃত্যুর পর ৬ মাস আটপাড়ায়, পরে ৬ মাস বিদ্যাকূটে থাকেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে অষ্টগ্রামে যান তথায় এক বৎসর চারি মাস থাকেন। পরে প্রায় ৩ বৎসর বিদ্যাকূটে থাকেন (অষ্টগ্রাম ও বিদ্যাকূট মিলাইয়া ৪ বৎসর হয়); পরে প্রায় ২২ বৎসর বয়সে বাজিতপুর যান, তথায় ৬ বৎসর থাকেন পরে প্রায় ২৯ বৎসর বয়সে ঢাকা আসেন। রাত্রি ৩টায় শচীবাবু বাসায় গেলেন। অন্যান্য প্রায় সকলেই মার কাছে কম্বল বিছাইয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলেন।

পুরান কথা।

২৮শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ (১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ সকালে মা উঠিয়াছেন, আজও ত্রিপুরার রাজ পরিবারের মেয়েরা ও অন্যান্য অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কথা হইয়াছে যে আজ মেয়েরা মার কাছে কীর্তন করিবে। বেলা প্রায় ১১টায় শচীবাবু উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা এবং উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও যতীশ দাদার মেয়েরা অনু ও আমি মাকে নিয়া ফটো তুলিতে গেলাম। একটি স্টুডিওতে মাকে শচীবাবু নিয়ে গেলেন। ফটোগ্রাফারটির পূর্ব হইতেই বাসনা ছিল একবার মাকে পাইলে ইচ্ছামত ফটো তুলিবেন। তাহাই হইল, ভদ্রলোক যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। অনবরত ফটোই তুলিতেছেন, যেন তাঁহার আশা মিটিতেছে না। মার সঙ্গে আরও অনেকে ফটো তুলিলেন।

কলিকাতার বিড়লার শিব মন্দিরে শ্রীশ্রীমার মেয়েদের ও পুরুষদের নিয়া কীর্তন। বিন্ধ্যাচল যাত্রা।

বেলা প্রায় ২টায় মন্দিরে ফিরিয়া গিয়া দেখি, এতক্ষণ মাকে বাহিরে রাখার দরুণ সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, লোকে লোকারণ্য। মা গিয়া

মেয়েদের নিয়া কীর্তন আরম্ভ করাইলেন। মেয়েরা বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিল, পরে মাও গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাকে মা বলিলেন, "মালা চন্দন কৈ?" মালা কিছু কিনিয়া লওয়া হইয়াছিল, চন্দন ঘষিয়া দিলাম। সকলে মালা চন্দনে সাজিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা সেই ভাবে বাম হাতখানি তালে তালে দুলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। কখনও কখনও নামের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরখানি যেন নাচিতেছে। সেই অপরূপ মূর্তি যে দেখিতেছে সেই মুগ্ধ হইতেছে। একটা আনন্দের ঢেউ যেন বহিয়া যাইতেছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় মায়ের লীলার একটা ফিলিম উঠাইয়া লইলেন। অনেকক্ষণ পর মেয়েদের সরাইয়া দিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইলেন। ছেলেরাই মাকে নিয়া কীর্তন করিতে লাগিল। সকলে যেন কি এক নেশায় মত্ত। কাহারও সঙ্কোচ নাই, ভয় নাই। পরে মা একধারে গিয়া বসিলেন। ভোলানাথ কীর্তনে যোগ দিলে তাঁহার সহিতও কীর্তন খুব জমিয়া উঠিল। তিনি কীর্তনে মাতিয়া যান, তাই সকলে খুবই আনন্দ পায়। এই ভাবে কীর্তন চলিতেছে ইহার মধ্যেই রামদাস বাবাজী কীর্তন করিতে আসিলেন। পূর্বেই কথা ছিল। তিনি কীর্তনে বসিলেন, পূর্বের কীর্তন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত তিনি কীর্তন করিলেন। পরে মা স্টেশন রওনা হইলেন। পথে রায় বাহাদুর যোগেশ-বাবুকে দেখিয়া যাওয়া হইল। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মা রাস্তায় দাঁড়াইলেন, পথের দিকের জানালা দিয়া বৃদ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে মাকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মা স্টেশনে চলিলেন। সঙ্গে বহু লোক গিয়াছেন। ৯টার গাড়ীতে মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। অখণ্ডানন্দ স্বামীকে টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪৩ (১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ বেলা প্রায় ৭টায় মা সকলকে নিয়া মিরজাপুর পৌঁছিলেন, সেখানে অখণ্ডানন্দ স্বামী উপস্থিত ছিলেন। খবর পাইয়া কাশী হইতে নেপাল দাদা, বাচ্চু ও বাচ্চুর মা আসিয়াছেন। সকলেই স্টেশনে আছেন। মিরজাপুর হইতে বাসে বিন্ধ্যাচল যাওয়া হইল। মুখ হাত ধুইয়া মা সকলকে লইয়া যজ্ঞের ঘরে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "চল এত করিয়া এখানে যে জন্য আসা সেই যজ্ঞ দেখি গিয়া।" তাহাই হইল। আজ ১২টার সময় নূতন কুণ্ড সংস্কার করিয়া তাহাতে অগ্নিস্থাপন করিয়া যজ্ঞ করা হইল। আজই ৪টার গাড়ীতে দিল্লী যাওয়ার কথা।

বিন্ধ্যাচলে নূতন কুণ্ড সংস্কার ও অগ্নি স্থাপন। তথাকার এক ঘটনা।

বাচ্চুর মা কাশী হইতে দুইখানা গায়ের কাপড় ও জলখাবার লইয়া আসিয়াছেন। মা ও ভোলানাথকে জল খাইতে বসাইয়া বাচ্চুর মা আলোয়ান দুইখানি মায়ের ও ভোলানাথের গায়ে জড়াইয়া দিয়া দিলেন। তখনই মা হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন "আমারটা ছোট", এই বলিয়া মা ছেলেমানুষের মত হুঁহুঁ করিতে লাগিলেন। দিদি ও নেপালদাদা হাসিয়া বলিলেন, "তা বলিতে পারিবেন না দুইখানিই এক মাপের।" মা বলিলেন, "আচ্ছা মাপিয়া দেখ" কিন্তু এ কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, কারণ মা'র একথা ঠিক হইবে না সকলেরই বিশ্বাস। মা তামাসা করিতেছেন বলিয়া সকলেই মনে করিলেন, তাই কেহই মাপিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু মা ছেলেমানুষের মত মাপিবার জন্য ব্যস্ত। অগত্যা সকলে মাপিয়া দেখিলেন মার আলোয়ানটা চারি আঙ্গুল ছোট। এ ঘটনায় সকলেই আশ্চর্য হইল।

খাওয়া দাওয়ার পর মা সকলকে নিয়া ছাতে বসিলেন। দুপুরে ভোগ হইল। জিতেনদাদাও এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় মার ছোট বেলার কথা উঠিয়াছে। এক দিন নাকি মা সকাল বেলা একটি পাথর বাটিতে ভাত খাইয়াছেন, সেটা মাজিবার জন্য ঘাটে নিয়া যাইবেন। দিদিমা বলিলেন, "পারত ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিও" যেমন ছেলেদের বলে। মা সেটা ধুইতে নিয়া যাইবার সময় মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গাছ পালা কি অন্য কোনও সাধারণের অদৃশ্য কাহারও সহিত কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। মা বলিলেন, "এখন যেমন তোমরা দেখ হঠাৎ কাহারও সহিত কথা হইয়া যায়, কাহার সহিত কথা হইল তাহা তোমরা বুঝিতে পার না সেই সময়ও সেইরূপই হইত, এই ভাবে চলিয়া যাইতেই বাটিটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মা বলিয়াছিলেন 'ভাঙ্গিয়া নিয়া আসিও' তাই আমি বাটিটির প্রত্যেকটি টুকরা কুড়াইয়া মার কাছে নিয়া আসিলাম। বলিলাম তুমি ভাঙ্গিয়া নিয়া আসিতে বলিয়াছিলে তাই কুড়াইয়া সব নিয়া আসিয়াছি। মা কিন্তু হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, অথচ মুখে রাগ দেখাইতে হইবে, আমি কিন্তু তাহা দেখিতেছি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমার ঘোরা ও এক স্থান থাকা দুইই সমান।

আবার কথা হইল মা এত ঘোরেন কেন? তাহার উত্তরে মা বলিলেন, "এক জায়গায় বসিয়া থাকিলেও তোমরা বলিবে এক জায়গায় বসিয়া থাকেন কেন? আর সত্য কথা বলিতে কি আমার কিন্তু একটুও মনে হয় না যে আমি ঘুরিতেছি। এক বাসার ভিতরেই যেন এঘর ওঘর করিতেছি অথবা এক জায়গায়ই বসিয়া আছি।"

ঢাকায় একটি ঘটনা হইয়াছিল। শচীনবাবুর বাসায় (অনেক বছর পূর্বের কথা) মা ভোগে গিয়াছিলেন, তাহার ছেলের সন্তান হয় না, মাকে জানাইতেছেন; মা কিছুই বলিলেন না। অল্পক্ষণ পরে দেখা গেল একটি

পোকা মার কাছে যাইতেছে, মা আঙ্গুল দিয়া ঠেলিয়া দিতেছেন কিন্তু পোকাটা বার বার মার দিকে যাইতেছে। তখন মা বাম হাতে পোকাটিকে তুলিয়া নিলেন। একটু পরে হাসিতে হাসিতে পোকাটি শচীনবাবুর স্ত্রীর হাতে দিলেন। তিনি অতি যত্নে পোকাটি পালন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার মাস খানেকের মধ্যেই তাহার পুত্রবধূর গর্ভ হইল। সেই সন্তানটি এখনও বাঁচিয়া আছে। এবার মা ঢাকায় গেলে সেই ছেলেটিকে আনিয়া মাকে দেখাইয়াছিল ও সেই গল্প পুনরায় এখন উঠিল।

ঢাকায় একটি ঘটনা

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

৩০শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪৩ (১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। বিন্ধ্যাচলে অতুলকে ও বিরাজ-মোহিনীকে রাখিয়া আমরা সকলে মার সহিত ৺কাশী রওনা হইলাম। সন্ধ্যা ৭টার সময় রওনা হইয়া ১০টার সময় ৺কাশী পৌঁছিয়া বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্মশালায় উঠিলেন। বিন্ধ্যাচল হইতে দিল্লী যাওয়ার কথা স্থির ছিল, এমন কি টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছে ইহার মধ্যে সে মত ফিরিয়া গেল। কথা ছিল দিল্লীতে ১লা মাঘ অহোরাত্র কীর্তন হইবে। সিমলার ভক্তের দল দিল্লীতে আসিয়াছেন। তাহারা মাকে পাইবার জন্য মহা ব্যাকুল; কত টেলিগ্রাম করিতেছেন। কিন্তু এখন আর দিল্লী যাওয়া হইল না। মা বলিলেন, "কাল যখন অহোরাত্র কীর্তনের কথা ছিল, তোমরা কাশীতে উদয়াস্ত করিতে চেষ্টা কর।" বাচ্চুর মাকে বলিলেন, "তুমিই ভোরে আরম্ভ

৺কাশী গমন।

করিও"। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন।

১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩ (১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ ভোর হইতেই বাচ্চুর মা নাম আরম্ভ করিয়াছেন। সারাদিন নাম রক্ষা করিবার জন্য নেপালদাদা প্রভৃতি লোক যোগাড় করিতে গিয়াছেন। ধীরে ধীরে যোগেন রায় প্রভৃতি সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুন্দর কীর্তন চলিল। লোক বেশী হওয়ায় মাকে ঘর হইতে ছাতে নিয়া বসান হইল। মালা চন্দন সকলকে দেওয়া হইল। থিওসফিকেল সোসাইটির বৈজনাথ পাণ্ডা ও ভার্গব সাহেব সপরিবারে আসিয়াছেন। তাঁহারা মাকে এই প্রথম দেখিলেন; দেখিয়া খুবই সুখী হইয়াছেন। খানিকটা রাত্রি হওয়ার পর কীর্তন শেষ হইল। ভক্তেরা মাকে প্রণাম করিয়া একে একে বিদায় হইল।

কাশীতে কীর্তনানন্দ।

২রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৩ (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজও বহু লোক মার দর্শনে আসিয়াছেন। মা বিছানায় বসিয়াই সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ইয়াগ্নিক আসিয়াছেন; তাঁর সঙ্গে মার কথা হইতেছে। মা তাঁহাকে বলিতেছেন, "ঐদিকের পড়াও একটু পড়িও। এদিকে যেমন বি, এ, এম, এ পাশ করিয়া প্রফেসর হইয়াছ, ওদিকেও তেমন হও।" ইয়াগ্নিক বলিলেন, "মন ত স্থির হয় না, মনে যদি আনন্দ পাইতাম তবে বসিতে পারিতাম।" মা বলিলেন, "জীবনে লেখাপড়ার জন্য কতটা সময় দিয়াছ ভাবিয়া দেখত? আর দেখ, তপস্যা বলে কেন? আমি ত উল্টা কথা বলি, আমি বলি" এই বলিয়াই হাত যোড় করিয়া আবার বলিতেছেন "আমি বলি না বাবা, তোমরা যা বলাও তাই বলিতেছি, তপস্যা অর্থ তাপ সহা; মন চায় না তবুও চেষ্টা করা; এই যে তাপটা সহিতে হয়, ইহারই নাম তপস্যা। যদি এ তাপ না থাকিত তবে তপস্যা কথাটির কোন মূল্যই থাকিত না। যখন এই তাপটা থাকিবে

না মনটা স্বভাবতই এদিকে আনন্দ পাইবে, তখন ত আর তপস্যা বলিয়া কোন কথা থাকেনা। তখন তপস্যার শেষ। আরও দেখ, শিশুদের যেমন খেলার দিকেই মন থাকে, তাহাদের জোর করিয়া পড়াইতে বসাও, কিন্তু মনটা তাহার খেলার দিকেই থাকে; এইরূপে নিত্য নিয়মিত ভাবে সময় মত পড়িতে পড়িতে ক্রমে সে এই পড়ার আনন্দ পায়, তখন আর তাহাকে জোর করিয়া বসাইতে হয় না, সে নিজেই নিয়ম মত পড়িতে বসে, কারণ তখন না পড়িয়া সে থাকিতে পারে না। আর সে তখন জানিয়াছে যে না পড়িলে সে ফেল হইয়া যাইবে, তাহা সে চায় না।" শেষে মা হাত যোড় করিয়া বলিতেছেন, "দেখ বাবা, এই মেয়েটির অনুরোধ যে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া তাঁর জন্য সময় দিও। ক্রমশঃ সময় বাড়াইয়া নিও।" মার কথায় ইয়াগ্নিক খুব আনন্দ পাইলেন। যাইবার সময় পায় ধরিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন।

ভগবানের নাম করিয়া আনন্দ না পাইলে যে তাপ সহা যায় তাহাই "তপস্যা।"

আর একটি বিশেষ ঘটনা—নেপাল দাদা এবার বিন্ধ্যাচল গিয়াই বলিলেন, কাশীর গোপাল দাসগুপ্ত (ডাক্তার) আজ ২ দিন হঠাৎ আমাকে আসিয়া বলেন, "আনন্দময়ী মা কবে এদিকে আসিবেন বলিতে পারেন।" আমি বলিলাম কেন বলুন দেখি। তিনি বলিলেন গতকল্য রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি আনন্দময়ী মা আসিয়া আমার বিছানায় পা খানা বাঁকা করিয়া বসিয়া আছেন এবং বলিতেছেন "আমি এত নিকট আসিলাম তবুও তুই আমাকে দেখিতে আসিলি না।" নেপালদাদা তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলেন, "আমি কল্যই বহরমপুর হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি যে মা ২৯এ পৌষ (১৩ই জানুয়ারী) বিন্ধ্যাচল আসিতেছেন, আপনিও চলুন।" কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিলেন,

কাঁশীর এক ডাক্তারের স্বপ্নে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও মার কাঁশী আগমন।

"আমি যাইব না। আমি ত মাকে চিনিওনা; তিনিই যখন নিজে দেখা দিয়াছেন তখন দরকার হইলে তিনি নিজেই আসিবেন।" ঘটনাচক্রে সত্য সত্যই মা ৺কাশী আসিলেন। নেপালদাদা যখন গতকল্য ভোরে ডাক্তারবাবুকে ফোনে মার ৺কাশী আসিবার সংবাদ দিলেন তখন ডাক্তারবাবু মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "কি বাবা কেমন আছ? এবার তুমিই বোধ হয় এই শরীরটাকে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এইদিকে টানিয়া আনিয়াছ। তাই বাবাকে দর্শন করিতে আসিলাম। তুমি বাবা শরীরের ডাক্তারি কর, মনটারও একটু করিও"। ডাক্তারবাবু স্থির দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আরও অনেকে আসিয়াছেন, গোপীনাথ বাবু আসিয়াছেন।

নানা কথা উঠিয়াছে। একটি ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুলসীদাস ত মহাজ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন।" মা উত্তরে বলিলেন, "হাঁ ছিলেন নিশ্চয়ই।" ছেলেটি বলিল, "আচ্ছা, তবে যখন তাঁহাকে ভগবান্ কৃষ্ণরূপে দর্শন দিলেন তখন তিনি কেন বলিলেন আমি তোমাকে এরূপে দেখিতে চাহি না। আমাকে রামরূপে দেখা দাও। ইহা কি জ্ঞানের কথা হইল? সবই ত এক, তিনি এরূপ ভিন্ন ভাবিলেন কেন?"

তুলসীদাসের উক্তির মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির শ্রীশ্রীমা কৃত সমন্বয়।

মা অমনি বলিলেন! "তুমিই বলিলে তিনি জ্ঞানীও ছিলেন ভক্তও ছিলেন; জ্ঞানের কথাই ত বলিলেন। এই যে বলিলেন তুমি আমাকে রামরূপে দেখা দাও, তোমার এইরূপ আমি দেখিতে চাই না রামরূপ দেখিতে চাই ইহাতে প্রমাণ হইল তিনি জানিতেন যে রাম ও কৃষ্ণ এক জনই। 'তুমি আমাকে রামরূপে দেখা দাও' এই বলিতেছেন; শুধু রূপ ভিন্ন, মূলে এক জনই; এই ভাবই ত তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইল ইহা জ্ঞানের কথা। আর ভক্তির কথা বলিতেছেন 'আমি আমার উপাস্য রামরূপেই

তোমাকে দেখিতে চাই কারণ তাহাই আমার প্রিয়।' এই ত জ্ঞান ও ভক্তি, দুইটি ভাবই প্রকাশ পাইল।" শ্রীযুত গোপীনাথ বাবু বলিলেন, "কোন কথার জবাব দিতেই মার ভাবিতে হয় না। যখন যে যে ভাবের কথা বলিতেছে তখনই মার ভিতর হইতে সেই ভাবের জবাব বাহির হইতেছে।" তারপর আবার কথায় কথায় শ্রীযুত গোপীনাথবাবু উপস্থিত সকলকে বলিতেছেন, "মা যে বার দাদামহাশয়কে নিয়া বাহির হইয়াছিলেন সেই বার যখন নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া গিরীনবাবুর বাসায় কলিকাতা ছিলেন তখন আমরা ২।৩ জন মার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ভয়ানক বৃষ্টি ছিল আমরা পথে ২।৩ জায়গায় দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে মার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা হঠাৎ কথায় কথায় বলিলেন 'তোমরা যে আসিতেছ ইহা আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভাসিয়া উঠিয়াছিল', এই বলিয়া আমরা যেখানে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেই সব জায়গা পর্যন্ত যেরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া দিলেন। সেদিন ইচ্ছা শক্তির ও মহাশক্তির কথাও অনেক বলিয়াছিলেন। একবার হরিদ্বারে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিয়াছিল, মা এমন সরল ও সুন্দর ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দিলেন যে অতি চমৎকার।"

কাশী ছাড়িবার কথা উঠিয়াছে। চট্টগ্রামের দিকে যাওয়ার কথা হইয়াছে; প্রাতে জিতেনদাদার সঙ্গে মার কথা হইল। হৃষীকেশের পূর্ণানন্দ স্বামীর কথায় মা বলিতেছেন, "যখন হৃষীকেশ গিয়াছিলাম তখন একবার পূর্ণানন্দ স্বামী তাঁহার এক শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, সে আসিয়া বলিল, 'আমি একান্তে মার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলিব, আমাদের গুরুদেব বলিয়া পাঠাইয়াছেন'। জ্যোতিষকেও থাকিতে নিষেধ করিলেন। সে আমাকে বলিল, 'আমার গুরুদেব আপনাকে জিজ্ঞাসা

মার স্বপ্ন দর্শন হয় কি না শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামীর এই প্রশ্নের উত্তর।

করিতে বলিয়া দিলেন আপনার স্বপ্ন দর্শন হয় কিনা? কি স্বপ্ন দেখেন?' আমি বলিলাম স্বপ্ন যদি বল তবে ত তোমার সঙ্গে যে কথা বলিতেছি ইহাও স্বপ্ন। আর তা না হইলে যাহারা বাস্তবিক জ্ঞানী তাহাদের নিদ্রাও নাই সে চিরজাগ্রত, ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ণানন্দ স্বামী আমাকে খুব আদর করিতেন, ধীরে ধীরে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার অসুখ ছিল, আমি তাঁর আশ্রমে গেলাম। এমন সুন্দর তাঁহার স্বভাব ছিল, যে আমি নীচে গিয়াছি শুনিলেই অসুখ নিয়াই তিনি নামিয়া আসিতেন, এত আসবাব থাকিতেও মাটিতে আমার কাছেই বসিতেন। আমি বাবা বলিয়া ডাকিতাম। আমাকে কত রকম রান্না করিয়া খাওয়াইতেন। সুস্থ হইয়া তিনিও আমাদের গঙ্গার ধারে কুঠিয়ায় আসিয়া ছিলেন। সেই বার আমি প্রায় ৪ মাস হৃষীকেশে ছিলাম।" আজ প্রাতে উঠিয়াই জিতেনদাদাকে ও আমাকে নিয়া মা গঙ্গার ধারে গিয়াছিলেন, তখনই সেখানে বসিয়া বসিয়া এসব কথা হইল। আজ ৩টার গাড়ীতে চট্টগ্রাম রওনা হইবার কথা। শ্রীযুত মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ধর্মশালায় আজ মার ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১টার সময় মা সকলকে নিয়া তথায় গেলেন এবং শ্রীযুত মহেশ ভট্টাচার্যকে দেখিতে গিয়া বসিলেন। সকলকে সরাইয়া দিয়া কানাইদাদাকে বলিলেন, "দেখ, বাবাজী এতদিন বিচার করিয়া দান করিয়াছেন, এখন বিচারশূন্য ভাবে একটু দান করাও। বাবাজী (মহেশবাবু) একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন 'একদিন আমি ও আমার স্ত্রী বৈদ্যনাথে আছি, একটি ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু আমি বলিলাম, "তুমি খাটিয়া খাও আমি ভিক্ষা দিব না।" এই বলিয়া আর ভিক্ষা দিলাম না। আমি সারা জীবনই এইভাবে বিচার করিয়া ভিক্ষা দিয়াছি।' এ কথাটি বাবাজীর মনে আছে, তাই বলিতেছি এখন একটু বিচারশূন্য ভাবে তোমরা তাঁহার হইয়া দান কর।" মার আদেশে তাহাই করা হইল।

চট্টগ্রাম যাত্রা। অগ্নি রক্ষার ব্যাপারের মর্ম ব্যাখ্যা।

এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, মা ঐশ্বর্যটা কি? তোমার ঐশ্বর্য আছে কিনা? মা হাসিয়া বলিলেন, "ঐশ্বর্য আবার কি ভিন্ন। কিছু হইলেই ত ঐশ্বর্য, যেখানে ঐশ্বর্য সেখানেই ভিন্ন, ঐশ্বর্য হইলেই ভিন্ন হইল। মা সকলকে নিয়া ভোগের পর ৩টার গাড়িতে চট্টগ্রাম রওনা হইলেন। গাড়ীতে বসিয়া যজ্ঞের আগুন রক্ষার কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আগুন রক্ষার ব্যাপারটা কি? মা বলিলেন, "১৩৩২ সনের (১৯২৬ সালের) ৺কালী পূজার দিন যে যজ্ঞের আগুন রক্ষা করা হইয়াছে সেই সময় আমার খেয়াল হইল ৺কালী যেমন জীবন্তভাবে খেলিয়াছিলেন এবং বিসর্জনের সময় বাধা পড়িয়াছিল তেমনি আগুনটাও বিসর্জন দিবার খেয়াল হইল না। ৺কালী বিসর্জনেও যেমন কোনও ভাবই জাগে নাই সেইরূপ আগুনও নিবাইবার ভাব জাগিল না, তাই রক্ষা হইতে লাগিল। পরে যখন কুম্ভ মেলার সময় হরিদ্বার যাওয়া হয় তখন শাহবাগের পুকুরের ধারে কুণ্ড করিয়া তথায় অগ্নি রক্ষা করা হইল। সেই সময়ে কুণ্ড তৈয়ার হইলে, তোমরা দেখিয়াছ আমি ভোলানাথকে নিয়া তথায় যাই অন্য কাহাকেও যাইতে নিষেধ করা হইল। তথায় গিয়া ভোলানাথকে তিনটি বটপাতা আনিতে বলা হইল। পাতা তিনটি আনিলে যজ্ঞের অগ্নিরই একটা কয়লা নিয়া লিখিতে লাগিলাম। ইহা কিন্তু আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে; যেমন স্তোত্রাদি আপনা হইতেই হইয়া যায়, ইহাও সেই রকমই। তিনটি পাতায় তিন রকমের ভাষা লেখা হইল।" কি ভাষা লেখা হইল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "ধর না, সকলেরই প্রথম তিনটি, পরে বহু হয়, যেমন সত্ত্ব, রজ, তমঃ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। বাসনা সৃষ্টি, বাসনায় স্থিতি, কর্মেতে লয়। আবার বাসনার ক্ষয়ই লয়। যেমন তোমরা আদি একটি অক্ষর ধরিয়া থাক, একটি ভাঙ্গিয়া তিন; তিন হইতে আবার বহু হয়। আবার একে

যাইতে সব ভাঙ্গিয়া তিন, তিন ভাঙ্গিয়া এক। শব্দেতে, অক্ষরেও তাই. তেমন মূল ভাষাও এক হইতে তিন, আবার সেইগুলিই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বহু হইয়াছে। এই ভাষা তিনটিও ধর না তাই। মূল ভাষা হইতে তিনটি ভাষা, সময়োপযোগী লিখা হইয়া গেল। তারপর বলিয়া যাইতেছেন, "পরে সেই পাতা তিনটি একটি নারিকেলের মালার ভিতর রাখিয়া কি দিয়া যেন ঢাকিয়া রাখা হইল। পরে তার উপর ধুনচি বসান হইল এবং তার উপর মাটি দিয়া কুণ্ড তৈয়ার করা হইল, এই কথা এতদিন গোপনই ছিল।" ইহার পর হইতেই কুলদাদাদার কাছে যজ্ঞাদির ভার দেওয়া হইল। যাইবার সময় মা বলিয়া গিয়াছিলেন, "যদি আগুনের কিছু গোলমাল হয়, তবে এই ভাবে প্রজ্বলিত করিও।" সেই নিয়মটা কুলদাদাদাকে বলিয়া দিলেন। পরে যখন মা দাদামহাশয়কে নিয়া আদিনাথ যান, তখন সেখানে একদিন দাদামহাশয়কে বলিলেন, "আগুনটার গোলমাল হইল"। শেষে যখন ঢাকা ফিরিয়া আসিলেন তখন সময় মিলাইয়া দেখা গেল সত্যই আগুনের গোলমাল হইয়াছিল। আরও একবার কীর্তনের পর সালকিয়ায় বসিয়া বীরেনদাদার সহিত কথা হইতেছিল, হঠাৎ মা বলিয়া উঠিলেন, "আগুনটার গোলমাল হইল।" সেই বারও ঢাকায় ফিরিয়া গিয়া দেখা গেল সত্যই আগুনের গোলমাল হইয়াছিল। আরও কয়েকবার এই জাতীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল আমরা শুনিয়াছি। বিন্ধ্যাচলের আশ্রমে মা যে কুণ্ড তৈয়ার করেন তাহার প্রস্থ ও গভীরতা মার শরীরের মাপে করাইয়াছেন। এই সব ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বলিতেছেন, "একবার দেরাদুনে আছি বিন্ধ্যাচলের আশ্রমের জায়গাটা পরিষ্কার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। যেমন তোমাদের দেখি ঠিক তেমনিই দেখিতেছি, সেখানেও একজন যজ্ঞ করিতেছে, যজ্ঞ হইতেছে এই রকম সব ভাসিয়া উঠিল। যে যজ্ঞ করিতেছিল সে তাহার বাসনা জানাইতেছে সেই কথাতেই ঐখানে

যজ্ঞকুণ্ড করিতে বলা হইয়াছে। আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই করিনা। তবে যে যজ্ঞ করিতেছিল তাহার অখণ্ডানন্দের সঙ্গে কোন সংযোগ আছে, তাই তাহাকে দিয়াই কুণ্ড তৈয়ার করান হইল।" তারপর নিজ শরীরের মাপ দেওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তোমরা মাপ চাহিয়াছিলে। তোমরা ত শরীরের খণ্ডভাবে হাতের মাপ দাও, আমার খেয়াল হইল সাবিত্রী যজ্ঞ ত ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্ম ত অখণ্ড তাই সম্পূর্ণ শরীরটাই মাপ দেওয়া হইল। মূর্তরূপে কোন কাজ করিতে হইলেই একটা সীমা থাকিবেই তাই শরীরেও সীমা আছে সত্য। কিন্তু তোমাদের ভাবটা হওয়া উচিত পূর্ণ ও অখণ্ড। আবার তোমাদের মতে হাতের মাপ মত ভিতরে কুণ্ডও তৈয়ার করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপেই রমনার আশ্রমও হইল। আমি ত ঐ শাহবাগ হইতেই ঐ জায়গাটায় যাওয়া আসা করিতাম। ধর, যেমন তোমরা তোমাদের বাসায় নিয়া যাইতে, ইহাও ঠিক তেমনই। সেখানে যাহারা ছিল তাহারা তাহাদের বাসনা জানাইল, আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই, কারণ তাহাদের যখন দরকার তখন নির্দিষ্ট কর্ম হইয়া যাইবেই। কিছুদিন পর যখন তোমরা আশ্রমের চেষ্টা করিতেছ তখন একদিন নিরঞ্জন আসিয়া বলিল, 'মা আমরা আশ্রমের জন্য জমী দেখিতে যাইতে লজ্জা পাই, কারণ যে জমীই ঠিক করি কোনও না কোনও কারণে তাহা লওয়া হয় না, গোলমাল হইয়া যায় কিছুতেই একটা স্থান করিতে পারিতেছিনা।" নিরঞ্জন বাবুর এই কথার পরই আমাদের মনে হইল মার একটু ইঙ্গিত পাইয়া আশ্রমের এই স্থানটা হইয়া গেল। মা বলিলেন, "পূর্বে যাহারা ঐস্থানে থাকিত তাহাদের ইচ্ছাতেই ঐ স্থানে মন্দিরাদি সব হইয়াছে।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

৩রা মাঘ, শনিবার ১৩৪৩ (১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ আমরা রাস্তায়, গোয়ালন্দে আসিয়াছি, সন্ধ্যায় চাঁদপুর পৌঁছিব। মা স্টীমারে আসিয়াই শুইয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেল হইতে যে গাড়ীতে গোয়ালন্দ আসিলাম সেই গাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক রাণাঘাট হইতে উঠিয়াছিল। তাহারা মাকে দেখিয়াই প্রণাম করিল ও মাকে এই ভাবে দর্শন করিতে পারিল বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। মার কিছু প্রসাদ ছিল তাহারা ৪।৫ জনে বসিয়া মহানন্দে গ্রহণ করিল। তাহাদের দলের আরও কয়েকটি ভদ্রলোক একটু দূরে বসিয়া ইহাদের খাওয়া দেখিয়া হাসিতেছিল, কিন্তু কাছে আসে নাই। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে কিছু ফল তাহাদের জন্য পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। যাহারা প্রসাদ পাইল তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে আমি কিছু কমলা দিয়া দিলাম। কমলা পাইয়া তাহারা হাসিয়া উঠিল।

চট্টগ্রাম গমনের পথে। "ভগবানের উপর নির্ভর করিলে তিনিই আহার দেন" এই বিষয়ক শ্রীশ্রীমা কথিত গল্প।

এদিকে মা বলিতেছিলেন, "তোমাদের কাছে একটা গল্প বলি শোন। দুইটী সাধক সাধনা করিতে বসিয়াছে। তাহাদের সংকল্প সাধনা ছাড়িয়া উঠিবে না, ভগবান্ দিলে এখানে বসিয়াই খাওয়ার মিলিবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটি সাধকের ক্ষুধার উদ্রেক হইল ও সংশয় লাগিল যে ভগবান্ কি আর এই জঙ্গলে আসিয়া খাবার দিয়া যাইবেন? এই ভাবিয়া সে সঙ্গীকে বলিল— 'চল ভাই আমরা গিয়া খাইয়া আসিয়া আবার ভগবানের নাম করিতে বসি।' সঙ্গী উত্তর দিল—'না ভাই, আমি যখন তাঁর নামে বসিয়াছি, তিনি যাহা জুটাইবেন তাহাই খাইব, নতুবা না খাইয়া থাকিব

তবুও আমি উঠিব না।' এই কথায় সাধকটি চলিয়া গেল। এক জায়গায় গিয়া সে নিজে খাইয়া আসিল। আসিবার সময় তাহার মনে হইল—আমার সঙ্গী ত সেই জঙ্গলেই বসিয়া রহিল, তাহার জন্যও কিছু নিয়া যাই। এই ভাবিয়া সঙ্গীর জন্য খাবার নিয়া আসিল। সঙ্গীর আসনের কাছে খাবার রাখিয়া দিল। তখন সঙ্গীটি হাসিয়া বলিল, 'দেখিলে ভাই, তাঁহার নামে বসিয়া থাকিতে পারিলে জঙ্গলেও তিনি খাবার আনিয়া দেন।' মা এই গল্প বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, **"তোমরাও সঙ্গীদের খাবার নিয়া দিতে আমার এই গল্পটি মনে পড়িল।"**

সেই ট্রেনে বসিয়াই মা বলিলেন—"সিদ্ধেশ্বরী যখন প্রথম প্রথম যাই একদিন ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরী হইতে ফিরিবার পথে তিরস্কারের ভাবেই কয়েকটি কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছিলেন — তুমি কি সাধন ভজন কর, আমার চাকুরীর অধীনতা যাইতেছে না। যার ঘরে এমন অবস্থা তার এত দুঃখ থাকে কেন? এই কথায় আমার একটা কান্নার ভাব আসিয়া শরীরের একটা অস্বাভাবিক ভাবাবস্থায় মাঠ দিয়া বৃষ্টির জলের ভিতর দিয়াই আপনা ভাবে একটু দ্রুত চলিতে লাগিলাম। তখন ভোলানাথ গিয়া ধরিয়া আনিল। সেই ভাবের মুখেই বলিতেছিলাম—'তবে আমি যাই।' ভোলানাথ অনেক বলিয়া কহিয়া সান্ত্বনা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী নিয়া গেলেন।" মা যখন ৭ দিন সিদ্ধেশ্বরী ছিলেন তারপর শাহবাগ কিছুদিনের জন্য আসিয়া চাউলের ভোগে সিদ্ধেশ্বরীতে এই ঘটনা হয়।

পরে সিদ্ধেশ্বরীতে মাকে ভোগাদি দেওয়ার পর মা যখন শাহবাগ আসিলেন তখন ভোলানাথ আবার নিজের চাকুরী সম্বন্ধে কি কথা উঠাইয়া মাকে পুনরায় পূর্বের মত বলিতেছিলেন। যেন আবার মার একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হয় এবং ঐ ভাবাবস্থাতেই ভোলানাথকে বলিয়া ফেলিলেন **"এই শরীরটাকে আর ৩।৪ বৎসর দেখিয়া রাখ।"** মা

বলিতেছেন, "৩।৪ বৎসর মধ্যেই তোমরা সব আসিয়া জুটিয়াছ" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজ স্টীমারে ভোলানাথ একটি কথা বলিলেন। বাজিতপুর থাকিতে ভোলানাথ নাকি একদিন মাকে বলিলেন—"আমি ঢাকায় একটি বাড়ী করিব।" মা উত্তর দিলেন ঢাকায় ত তোমার বাড়ী আছে। এই বলিয়া বর্তমান আশ্রমটি বহু বৎসর পূর্বে যাহার বাড়ী ছিল তাহার নাম করিয়া বলিলেন—তাহার বাড়ীই তোমার বাড়ী। পরে আশ্রম হইলে খবরাখবর করিতে করিতে যখন পূর্ব মালিকের নাম বাহির হইল তখন দেখা গেল যে বাজিতপুরে ঐ নামটি করিয়াছিলেন। নামটি কি তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।

চট্টগ্রামে আগমন।

৫ই মাঘ, সোমবার (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৭)। আজ প্রাতে আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। শশীবাবু প্রভৃতি স্টেশনে ছিলেন। আমাদের রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে নিয়া গেলেন। শুনিলাম ইহা অতি পুরাতন মন্দির।

জ্যোতিষদাদার মেয়েটি এখানে খুব অসুস্থ অবস্থায় আছে। এ খবর মা কিছুদিন পূর্বেই পাইয়াছিলেন। আজ মাকে মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়াই শশীবাবু মেয়েটির খবর নিতে চলিয়া গেলেন। দুই দিন যাবৎ তিনি কোন খবর পান নাই। শশীবাবু চলিয়া যাওয়ার পর, আমি ও শশীবাবুর একটি ছেলে, মাকে মুখ ধোয়াইবার জন্য যশোদাবাবুর বাসায় নিয়া যাইতেছি,

শ্রীশ্রীমার জ্যোতিষ-দাদার মেয়ের মৃত্যু দূরে থাকা অবস্থায় দর্শন।

রাস্তায় মা হঠাৎ বলিলেন—"দেখিতেছিলাম একটি স্ত্রীলোক মারা গেল।" আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম—"জ্যোতিষ দাদার মেয়েটির খবর আনিতে গেল তুমি এর মধ্যেই এসব কি বলিতেছ?" মা আর কিছু বলিলেন না। একটু পরেই শশীবাবু ফিরিয়া

আসিয়া খবর দিলেন মেয়েটি কাল রাত্রিতে মারা গিয়াছে। মা তখন বলিলেন, "আমিও কাল রাত্রিতেই ঠিক ঐ সময়েই দেখিতেছিলাম আমি মৃত্যু শয্যার কাছে উপস্থিত হইয়াছি। সব পরিষ্কার দেখিতেছিলাম।" এবার শঙ্করানন্দ স্বামী ঁকাশী হইতে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি মাকে বলিলেন, — "এত কাছে তুমি আসিলে, একটু সময়ের জন্য কি পাপে মেয়েটি তোমাকে দেখিতে পারিল না?" মা বলিলেন, "দেখা হইল না কি করিয়া বল? তবে তোমরা দেখ নাই। তোমাদের ভাষাতেই বলিতেছি। তোমরা বল ঁকাশীযাত্রা করিয়া মরিলেও নাকি ঁকাশী প্রাপ্তির ফল হয়? এও তাই ধরিতে পার। এদিকে আসিবার ত কথা ছিল না। এদিকে আসিবার কথা ছিল না এদিকে আসা হইল বলিয়াই ত মেয়েটির কথা মনে জাগিয়াছে। ওদিকে দিয়া চলিয়া গেলে হয়ত ইহার কথা মনেই হইত না।" এ কথা শুনিয়া আমরা মনে মনে মেয়েটির ভাগ্যের প্রশংসা করিলাম।

যশোদা ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ী মন্দিরের অতি নিকটে। সেই বাসাতেই মার ভোগ হইল। মা এক বাসায় গিয়াছেন, এক ভদ্রলোক প্রণাম করিতেছেন। তাহার দাঁত কয়েকটি পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"কি বাবা বেদন্ত হইতে চলিয়াছ নাকি! প্রথম ও বেদন্ত ছিলে এখনও বেদন্ত হইতে চলিয়াছ; মধ্যে কয়েকদিন দন্ত নিয়া যত মারামারি। আগেও বেদন্ত পরেও বেদন্ত, মধ্যে দন্তের সময়টাই যত গোলমাল।" সকলেই এই কথায় হাসিয়া উঠিলেন। একজন সংস্কারের কথা কি বলিয়াছেন, মা বলিতেছেন, "কিছু একটা দেখিলেই আমাদের একটা ছাপ পড়ে সেই ছাপ উঠাইতে আবার ততটাই সময়ের দরকার হয়।" একটি

সংস্কার কি প্রকারে হয়। স্ত্রীলোকের স্বামী সেবার কর্তব্য বিষয় উপদেশ। 'সমাধি' পদের ব্যাখ্যা।

মেয়েকে বলিতেছেন—"তুই পড়াশুনা করিতেছিস, ভগবানের নাম কর; যদি স্থূলরূপে স্বামীরূপে তিনি আসেন ভালই, নতুবা পরম পতিই পতি।" স্ত্রীলোকদের বলিতেছেন—"তোমরা যদি ঠিক ভাবে স্বামীর সেবা করিতে পারিতে তবে আর 'কি করিব' এই যে অভাব বোধ তাহা থাকিত না। তাহা পার না বলিয়াই—আবার কি করিব জিজ্ঞাসা আসে।" শুনিয়া স্বামীর দল হাসিয়া উঠিলেন। মা, আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "তোমরাও স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী মনে করিবে, সেইভাবে যত্ন করিবে।" বৈকালে মাকে ২।১ বাসায় নিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় মন্দিরের বারান্দায় মা বসিয়াছেন। অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রাজসাহীর প্রফেসর গিরিজা ভট্টাচার্য এখন চট্টগ্রাম আছেন। তিনিও আসিয়াছেন। কথায় কথায় সমাধির কথা উঠিয়াছে। মা বলিলেন, "সমাধান না হইলে সমাধি হইবে কি করিয়া।" এ কথায় একটি পন্ডিত মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'মা এমন সুন্দর কথা কখনও শুনি নাই'।

আবার নানা কথা উঠিয়াছে। পণ্ডিত বড় বড় কথা বলিতেছেন। গিরিজাবাবু বলিলেন দেখুন ও সব কথা বলিয়া লাভ কি? আমরা ত এসব বুঝিনা। মা বলিলেন, "দেখ তোমরা যে অঙ্ক কর সব ঠিক করিয়াও একটু জায়গায়ও যদি ভুল হয়, তবেই মূলে সব ভুল হইয়া যায়। তোমাদের ও তাই। বিশ্বাস সব কর, বিশ্বাস মাত্রই অন্ধ। প্রত্যক্ষ না করিলে সব ঠিক ঠিক বুঝা হয় না।" গিরিজাবাবু পুরান কথা বলিতে বলিতে বলিতেছেন—"একবার ঢাকায় আমি, গোপালবাবু, বাউল, অটল বসিয়া আছি মা হঠাৎ প্রাণগোপালবাবুর হাতে একটু হাত ঠেকাইলেন যেন কিছু দেওয়ার ভাব; প্রাণগোপালবাবু আবার বাউলের হাতে অটলের হাতে আমার হাতে ঐরূপ করিলেন। কি আশ্চর্য, এইরূপ করা মাত্রই

শ্রীশ্রীমার হস্ত স্পর্শে অদ্ভুত ভাবের উদয়।

সকলেরই একটা ভয়ানক কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কি একটা অবস্থা হইল বুঝিলাম না। যেন একটা ইলেকট্রিসিটির ধাক্কা লাগিল। খানিকক্ষণ এভাবে চলিল, শেষে সব ঠাণ্ডা হইল। আবার বলিলেন, "ঢাকায় প্রথম যখন মাকে দেখি, বড় ঘোমটা, কথা প্রায় বলেন না। একদিন সিদ্ধেশ্বরী গিয়া আসনের বেদীতে বসিলেন, তখন আর বউ নাই, আর এক মূর্তি। কিছুক্ষণ মুখ দিয়া স্তোত্রাদি বাহির হইল, পরে আমাকে বলিলেন (বেশ একটু জোরের সহিত) 'আমি দেখিতেছি সব এক।' এ কথাটা যে ভাবে বলিয়াছিলেন এখনও আমার তাহা মনে আছে। আবার একদিন আমার খুব অসুখ ছিল, আমার জন্য যে বার্লি হইয়াছিল তাহা নিজে খাইয়া ফেলিলেন। সেই দিনই এক বাসায় মার ভোগ হইল। প্রসাদ আমাকে নিতে বলিলেন, প্রথমেই পাইলাম ফুল, তাহাই খাইলাম, পরে আরও সব খাইলাম। সেই দিনই জ্বর সারিয়া গেল। এমন আরও কত ঘটনা দেখিয়াছি। আমিই প্রথম প্রাণগোপালবাবুর চিঠি পাইয়া ঢাকায় মাকে দেখিতে যাই; মাকে দেখিয়া অটলকে লিখিলাম। আমার চিঠি পাইয়া অটলও ঢাকা গিয়া মাকে দর্শন করিল।" রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে উঠিলেন। রাত্রিতে মা জ্যোতিষদাদার মেয়ের কথা বলিতেছেন। "এই মেয়ের বিবাহের সময় জ্যোতিষ বলিয়াছিল মেয়েটির বৈধব্য যোগ আছে। একদিন রাত্রিতে জ্যোতিষ ছোট একটি সোনার রেকাবীতে করিয়া একখানি অমৃতি নিয়া আসিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দিল। পরে সেই রেকাবীর সোনা দিয়াই মেয়ের বিবাহের সব গহনা গড়াইয়া দিল। মেয়েটি যে সধবা মরিতে পারিয়াছে ইহাতে ভালই হইয়াছে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

৬ই মাঘ মঙ্গলবার (২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৭)—আজ মা প্রাতে হাত মুখ ধুইয়া বসিয়া আছেন। আজ খাবার দিন নয়। অনেকে বসিয়া কথাবার্তা

বলিতেছেন। কথায় কথায় মা বলিলেনঃ "বিশ্বাস ত অন্ধ, কিন্তু প্রথম প্রথম এই বিশ্বাস ধরিয়াই আমাদের থাকিতে হইবে। পড়া বিদ্যা আর কি? পড়া বিদ্যাও কিছু কিছু সাহায্য করে—যেমন রাস্তায় চলিতে গেলে টাইম টেবিলেও কাজ করে।" গিরিজাবাবু বলিলেন "আমরা প্রশ্ন ও করিতে জানি না।" অমনি মা হাসিয়া বলিলেন—"প্রশ্ন করিবে কাকে? প্রফেসর ছাত্রের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলে। এখানে না ছাত্র না প্রফেসর। এখানে যে প্রশ্ন করে সেই উত্তর দেয়।" গিরিজাবাবু বলিলেন "ভক্তি শাস্ত্রে আছে, মহতের কৃপা না হইলে হয় না। কিন্তু মহৎকে চিনা ত যায় না।" মা বলিলেন—"মহৎকে যে চিনাইয়া দেয় ইহাই ত কৃপা।"

বিশ্বাসই প্রথম অবলম্বন। "মহৎকে যে চিনাইয়া দেয় ইহাই কৃপা।"

এর মধ্যে জটু এবং দিগেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। তাহারা মাকে তাহাদের বাসায় নিয়া গেলেন। মা কালও এ বাসায় আসিয়া বাগানে যে জায়গায় বসিয়াছিলেন আজ আসিয়াও বসিলেন সেই জায়গায়ই। কিছু সময় শুইয়া থাকিলেন। দিগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী তাহাদের বাসার ভিতর নিয়া গেলেন। মাকে উঠানে বসাইয়া মালা ও বস্ত্র দিয়া পরে আরতি করিলেন। মেয়েরা গান করিল। পরে নিকটে একটি আশ্রমে একটি সাধু থাকেন, সেই আশ্রমে মাকে নিয়া গেলেন। সেখান হইতে আসিয়া মা দিগেন্দ্রবাবুদের বাগানের মধ্যে কম্বল পাতিয়া কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বৈকালে ৪ টায় (প্রফেসার) গিরিজাবাবুর বাসায় কীর্তনে যাইবেন স্থির হইয়াছে। ৪ টায় মা সেই বাসায় কীর্তনে গেলেন। বহু লোক হইল। ভোলানাথ কীর্তনে খুব মাতিয়া উঠিলেন। সকলেই তাহাকে নিয়া খুব আনন্দ পাইল। রাত্রি প্রায় ১১॥ টায় আমরা মন্দিরে ফিরিলাম।

দিগেন্দ্রবাবুর বাটীতে কীর্তন।

৭ই মাঘ, বুধবার (২১শে জানুয়ারী)— আজ সুরেন্দ্র ঘোষাল

মহাশয়ের বাসাতে ভোগ। সকালে মার মুখ ধোয়াইবার পর ২।৩ বাসায় মাকে নিয়া গেল। বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা সুরেন্দ্রবাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। ভোগ প্রস্তুত। ভোগ দিবার পূর্বে মেয়েদের একটু কীর্তন হইল। তারপর প্রকাণ্ড উঠানে মার ভোগের বন্দোবস্ত হইল। উঠানে হইবার কারণ মা ঘরে যাইবেন না। সঙ্গীয় সকলেই সেখানে বসিলেন। মা বলিলেন— "শিশুদের একত্র বসাইয়া দাও। যুবতী মেয়েদের একত্র বসাও।" বাবুদের বসাইলেন। পরে মা ভোগ গ্রহণ করিলেন। মা বলিলেন—"কুমারী, বালক, সন্ন্যাসীরা সব ভোজনে বসিয়াছে, তোমরা ধুপ নিয়া নাম করিতে করিতে চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর।" জটু প্রভৃতি তাই করিতে লাগিল। মাও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন এবং পরে আসিয়া ভোগে বসিলেন। সকলে হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন, শঙ্খ ঘন্টা বাজাইলেন। শশীবাবুকে ফটো তুলিবার জন্য নিয়া আসা হইল। ফটো তোলা হইল। মহা আনন্দে সকলে ভোজন শেষ করিলেন। মা বলিলেন—"প্রথম ভজন তার পর ভোজন—ভজন ভোজন দুই চাই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে মা বধূদের একত্রে বসাইলেন। চট্টগ্রামের ঘোষালরা বড় পরিবার ও বেশ অবস্থাপন্ন। সকলেই প্রায় একত্র হইয়াছেন, বধূরাও অনেক। মা বলিলেন—"এখন শক্তিরা সব ভোজনে বসিয়াছে।" একটু পরেই মা গিয়া তাহাদের সহিত খাইতে বসিলেন। চন্দ্রমাধব ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রীর মুখ হইতেও মা নিলেন এবং দিলেন। পরে দিগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী প্রসাদ সকলের গায়ে দিতে মাও সেই খেলায় যোগ দিলেন। প্রসাদ নিয়া মার এবং অন্যান্য সকলেরই সমস্ত শরীর মাখামাখি হইল। আমি পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাকে গরম জল দিয়া স্নান করাইয়া দিলাম। পরে মা

সুরেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে ভোগ কীর্তনে আনন্দ এবং শ্রীশ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমার কথা।

মেয়ে ও পুরুষদের প্রকাণ্ড দল নিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া রাধামাধব কুটিরে গেলেন। তথা হইতে রাজেশ্বরের মন্দিরে আসিলেন। মেয়েদের কীর্তন হইল। আজ বহু লোক আসিয়াছিল। সন্ধ্যার পর কীর্তন আরম্ভ হইল। চমৎকার কীর্তন হইল। কীর্তনের পরেও আজ অনেকেই বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ১২টা। কেহই উঠিতে চায় না। মা হঠাৎ উঠিয়া মন্দিরের দরজায় গিয়া দেখিলেন, নারায়ণের তখনও শয়ন দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ যেমন মানুষকে বলেন সেই ভাবে বলিয়া উঠিলেন —"কি তুমিও এখন পর্যন্ত শোও নাই, বসিয়া আছ?" একথা এমন ভাবে বলিলেন যেন ঘরে একটী লোক বসিয়া আছে মা তাহার সহিত কথা বলিতেছেন। মা পরে একান্তে আমাকে বলিয়াছেন—"আমার খেয়াল ছিল না, তাই হঠাৎ সকলের সামনে ঐভাবে বলিয়া ফেলিয়াছি।" কিন্তু সকলে একথা লক্ষ্য করে নাই।